সুধাকে আমি দেখিনি

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবাদলচন্দ্র পাল ঃ এস্ এম্ প্রিন্টিং ঃ ১৯ডি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সুধাকে আমি দেখিনি

সুধাকে আমি কখনো দেখিনি। চিনিও না। তবু সুধার ঘরবাড়ি সব আমার বুকের মধ্যে। তার যাওয়া-আসা, তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস সব আমার নিশ্বাসের সঙ্গে।

সুধা কথাটা আমি প্রথম শুনেছিলাম কমলকাকার গাওয়া একটা গানে—

"আমার প্রাণের মাঝে আছে সুধা চাওকি,
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।"

মেজদি বলেছিল, গানটা রবীন্দ্রনাথের লেখা। কমলকাকা আমাদের রক্তের সম্পর্কে কেউ না। মনের সম্পর্কে কমলকাকা আমাদের অনেকখানি।

(২)

আমাদের বাড়িটা শহর থেকে দূরে। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। জ্যাঠামশাই, বাবা, ছোটকাকা, জ্যেঠিমা, মা আর ছোটকাকী। তাছাড়া আমরা ছেলেমেয়েরা। বাড়ির ভেতরের উঠোনে বেশ বড় একটা বক্‌ফুল গাছ। সারা বছর ফুল ফোটে তাতে। জ্যাঠামশাই প্রতিদিন কাজ থেকে ফিরে বক্‌ফুল গাছটার নিচে ইজিচেয়ার পেতে বসে থাকেন। আমাদের সংসারের কর্তা তিনি। তাঁর ইচ্ছেই আমাদের সংসারের সকলের কাছেই আইন। এমনকি বাবা কাকাকেও কোনদিন তাঁর কোনো কথার প্রতিবাদ করতে শুনিনি।

তিন ভাইয়ের মধ্যে জ্যাঠামশাই মাথায় একটু খাটো। কিন্তু তাঁর এই উচ্চতার খামতি মিটিয়ে দিয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। জ্যাঠামশাই খুব ফর্সা। এমন কি ছোটকাকীর চেয়েও ফর্সা। বিযের পর ছোটকাকী যখন এখানে প্রথম আসে, তখন সবাই একবাক্যে তাব রূপ এবং রং-এর প্রশংসা করেছিল। এ অঞ্চলে আগে কখনো এমন রূপসী বৌ আসেনি।

ছোটকাকীকে দেখে পছন্দ করেছিলেন আমার বাবা। জ্যাঠামাই বৌভাতের দিন সকলের সামনে বসেছিলেন সুজয়ের পছন্দ আছে মানতেই হবে।

সুজয় আমার বাবাব নাম। এ সংসাবে আমার বাবা সকলের থেকে একটু অন্যরকম। এই অন্যরকমটা ঠিক যে কি, তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। সকালে উঠে ভাতটাত খেয়ে শহবে চাকরি করতে যাওয়া এবং সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরে নিজের ঘবে একখানা বই হাতে বসে থাকা, এই ছিল বাবাব প্রাত্যহিক রুটিন। বাবা এতো কি পডাশোনা কবতেন সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই। নাটক নভেল যে পড়তেন না, তা আমি জানি। মা বলতেন, পল্টু এখন

ঘরে যেওনা, তোমার বাবা বিরক্ত হবেন।

বাবা শুধু শুধু কেন যে বিরক্ত হবেন তা আমি কখনো জিগ্যেস করিনি। নিঃশব্দে ঘরের দরজা থেকে সরে আসতাম। তারপর পেছনের বারান্দায় মেজদির কাছে চলে যেতাম।

মেজদি আমায় দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে বলতো, পল্টু কি হয়েছে তোর?

কিচ্ছু না।

নিশ্চয় কিছু হয়েছে, আমার কাছে লুকোচ্ছিস।

সেই সময় এক একদিন ছোটকাকীর ঘর থেকে ডাক আসতো, গৌরী, ও গৌরী শুনে যা—

মেজদি যেতে যেতে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপতো, খবরদার পালাসনে, আমি আসছি।

ছোটকাকী কেন মেজদিকে ডাকতো তা আমি জানি। তার লুডো খেলার সঙ্গী হবার জন্যে। সারাদিন ধরে এই করতো ছোটকাকী, যাকে সামনে পেত তাকেই সাধাসাধি করতো। যেদিন কাউকে পেত না সেদিন একলাই চাল দিত। একলাই কল্পিত সঙ্গীর ঘুটি কাটতো।

জ্যেঠিমা একদিন জ্যাঠামশাইকে বললেন, ওকে একটা ডাক্তার দেখাও না।

কার কথা বলছো?

সুমিত্রা। ছোটকাকীর নাম সুমিত্রা।

জ্যাঠামশাই কথাটা শোনার পর একটু চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, স্বদেশ ডাক্তারকে বলে দেব, একদিন এসে দেখে যাবে।

আহা, পাঁচ-ছ'বছর হয়ে গেল, এখনো পেটে একটা এলো না। জ্যেঠিমার গলায় দুঃখ, দেখতে পাও না দিনরাত্তির লুডো নিয়ে বসে থাকে।

ও সব আপনিই সেরে যাবে।

জ্যাঠামশাইয়ের কথা মতো স্বদেশ ডাক্তার একদিন বাড়িতে এসেছিলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে ছোটকাকীকে পরীক্ষা করার পর ফিরে যাবার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মা এবং জ্যেঠিমাকে বললেন, আমি তো কোন দোষ খুঁজে পেলাম না। মা জননীর কয়েকটি সন্তান হওয়ার কথা।

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে জ্যেঠিমার মুখে স্বদেশ ডাক্তারের বক্তব্য শুনে জ্যাঠামশাই রেগে গেলেন, ডাক্তার কি আজকাল চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে হস্তবিচারও করছে?

(৩)

একটু পরেই মেজদি, ছোটকাকীর ঘর থেকে ফিরে এসেছিল, চল্ পল্টু ঝিলধার থেকে বেড়িয়ে আসি।

কেন, তুমি ছোটকাকীর সঙ্গে লুডো খেলবে না?

না। লুডো খেলতে আমার ঘেন্না করে। চল্ চল্।

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা জলাভূমি আছে। হাঁটু সমান জল। আবার কোথাও কোথাও কোমর সমান জলে কুশগাছের মাথা ভেসে থাকে। পুঁটি আর খোলসের ঝাঁক বেঁধে ঘোরাফেরা। সকাল দুপুর পাটকিলে ডানায় সাদার ছিটে দেওয়া গাঙ্চিলের শূন্যে সাঁতার দিতে দিতে সহসা সন্তরণশীল বোয়ালের ঝাঁকে ছোঁ দিয়ে দু-পায়ের বাঁকানো নখের মধ্যে শিকারকে গেঁথে নেবার অনবদ্য কৌশল—এ সবই ছিল আমাদের বাড়ির পেছনের ঝিলটাতে।

মেজদির সঙ্গে আমার বয়সের অনেক ফারাক। তাও আমরা দুজনে খুব বন্ধু ছিলাম। মেজদি তার মনের সব কথা আমাকে বলতো।

মন খারাপ হলেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে মেজদি ঝিলের ধারে বেড়াতে যেত। আজও কি তার মন খারাপ?

আমাদের তিন দিদির মধ্যে মেজদিরই গায়ের রং শ্যামলা। মা বলতেন, ও কালো বলেই ওকে কেউ পছন্দ করছে না।

এর আগে দু'বার ছেলের বাড়ির লোকজন এসে দেখে গিয়েছে। মেজদি সেজেগুজে তাদের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে অস্ফুট গলায় পাত্রপক্ষের অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছে।

আড়াল থেকে মেজদিকে দেখে আমার বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বাবা, জ্যাঠামশাই সবাই মিলে বার বার মেজদিকে এতো কষ্ট দিচ্ছেন কেন! মেজদির বিয়ে না হলে সংসার কি এমন রসাতলে যাবে?

একদিন সাহস করে মেজদিকে বলেছিলাম, তুমি আর কক্ষণো অমন করে সেজেগুজে ওদের সামনে যাবে না।

মেজদি হেসে বলেছিল—তাহলে যে কোনদিনই আমার বিয়ে হবে না।

না হোকগে বিয়ে—

মেজদি এবার নিশ্বাস ফেলেছিল, তুই ছেলে বলেই একথা বলতে পারলি পল্টু। মেয়েরা বলতে পারে না।

বিয়ে না হলে কেউ মেয়েদের বাঁচতে দেয় না।

ইস্, তোমায় বলেছে—

বড় হয়ে তুইও ওদের মতই করবি, পল্টু।

কক্ষনো না, তুমি দেখো—

আচ্ছা চল্, পা চালিয়ে চল্। বাবার বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যের পর জ্যাঠামশাই মেজদিকে ডাকলেন—

গৌরী, গৌরী—

পেছনের বারান্দা থেকে মেজদি উত্তর দিল, আসছি—

আজ বাবা অন্যদিনের চেয়ে আগেই বাড়ি ফিরেছেন। যথারীতি তিনি মুখের কাছে বই নিয়ে নিজের ঘরে বসে আছেন। আজকে কি হলো কে জানে, মেজদি ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি ডাকলেন, গৌরী, শোনো—

মেজদি ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল, কি বলছেন কাকা?

কোথায় যাচ্ছ—?

মেজদি চোখ না তুলে বলল, বাবা ডাকছেন—

মা ঠিক তখনি ঘরের বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, শিগগির যা গৌরী, ত্রৈলোক্য ঠাকুর এসেছেন। বাবা ধীরে ধীরে হাতের বইখানা বন্ধ করে বললেন, ও কোথাও যাবে না, তুমি এখানে বসো গৌরী।

বাবার গলার স্বরে এমন একটা তীব্রতা যে, মেজদির দু'চোখের তারা কেঁপে গেল। কিন্তু কিছু বলল না। বাবা উঠে ঘরের বাইরে গেলেন, তারপর বারান্দা থেকে গলা তুলে বললেন, দাদা, গৌরী আসবে না, আমি ওকে বারণ করেছি।

কয়েক মুহূর্ত জ্যাঠামশাই হতবাক্ হয়ে থাকলেন। তারপর ত্রৈলোক্য ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে অসহায় ভাবে মাথা নাড়লেন। তিনি কি বলতে চাইলেন, বোঝা গেল না।

বাবা তখনো দাঁড়িয়েই ছিলেন।

জ্যাঠামশাই সেদিকে তাকিয়ে বললেন, আমিই ত্রৈলোক্যকে আসতে বলেছিলাম। গৌরীর বিয়ে বার বার কেন ভেঙে যাচ্ছে, তা জানতে পারলে—

বাবা বললেন, গৌরীর বিয়ে নিয়ে আমরা খুব বেশী ভাবছি দাদা। গৌরীর কথা কেউ ভাবছিনে। তাছাড়া ত্রৈলোক্য ভাগবান নয় যে, হাত দেখে গৌরীর ভাগ্য বদলে দেবে।

কথা শেষ করে বাবা ঘরে চলে গেলেন। ত্রৈলোক্য উঠে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কাঁপছিলেন। রাগে অপমানে তাঁর মুখ কালো দেখাচ্ছিল। যাবার আগে তিনি বিড় বিড় করে কি যেন বললেন।

রাতে সবাই একসঙ্গে ভেতর দালানে খেতে বসার নিয়ম। আমার বুকের মধ্যে একটা ভয় থমকে ছিল। হয়তো সন্ধ্যের ঘটে যাওয়া ঘটনাটা আরও তীব্র হয়ে এ সংসারের ওপর জ্যাঠামশাইয়ের অধিকারের সীমাকে আর একবার তছনছ করে দেবে।

কিন্তু সে সব কিছুই ঘটলো না।

শুধু ছোটকাকা অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফিরে জানালেন, শহরের অনেক জায়গায় পুলিশ গুলি চালিয়েছে। ট্রাম বাস পুড়েছে। মানুষ মরেছে।

বাবার কানে সে সব কথা গেল কিনা বোঝা গেল না। হাতের বই বন্ধ করে আলো নিভিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লেন। কাকা না ফেরা পর্যন্ত ঘুমোতে পারছিলেন না। কিন্তু বাইরে তার মনের অশান্তির কোনও প্রকাশও ছিল না। বাবা এই রকমই।

ঠাকুমা যতদিন বেঁচেছিলেন বলতেন, আমার এই ছেলেটা বড় হলে সন্ন্যাসী হবে। বাবা সন্ন্যাসী হননি কিন্তু আশ্চর্য এক বৈরাগ্য সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকতো।

আমার ইদানিং কেন যেন মনে হচ্ছিল জ্যাঠামশাই, যাঁকে আমরা সবাই ভয় করি, উনি কিন্তু বাবাকে ভয় করেন। ত্রৈলোক্য ঠাকুরের ঘটনায় তা প্রমাণ হয়ে গেল।

এখন রাত্তির গভীর হলে ঝিলটার পেছন দিক থেকে একটা বাতাস ওঠে। বাতাসটা জলে লুটোপুটি খেতে খেতে দক্ষিণদিকের শিমূল গাছটাকে ছুঁয়ে দিগন্ত বিস্তৃত আইড়ি ক্ষেতের দিকে চলে যায়।

আমার ঘুমে অচেতন চোখে ঠিক তখনি একটা স্বপ্ন এসে উঁকি দেয়—লাল টুকটুকে বেনারসী আর সোনার মুকুট পরে মেজদি ছাদনা তলায় দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠিক সামনে একজন যার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না।

আমার স্বপ্নের কথা শোনার পর মেজদি বলে, দূর বোকা, তুই রোজ একটা স্বপ্নই দেখিস কেন রে—

কি করবো! স্বপ্ন কি আর ইচ্ছে করলেই অন্য রকম দেখা যায় নাকি?

হ্যারে পল্টু, আমি তো রোজ নতুন নতুন স্বপ্ন দেখি। একটার সঙ্গে আর একটা একটুও মিল নেই।

আমি বললাম, তুমিও আমার মতো স্বপ্ন দেখ মেজদি। কই কোনদিন বলোনি তো। কি স্বপ্ন দেখ তুমি?

ভাগ—তোকে বলবো কেন কি স্বপ্ন দেখি? তাছাড়া মেয়েদের দেখা স্বপ্ন ছেলেদের বলতে নেই।

তুমি তো তোমার সব কথাই আমাকে বলো—

বলি বুঝি,—মেজদির দু'ঠোঁটের ভাঁজে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে। এক মুহূর্তে কেমন যেন অচেনা হয়ে যায় মেজদি।

(৪)

সব একইভাবে চলছিল।

শুধু ছোটকাকী একদিন বাপের বাড়ি যাবে বলে সুটকেশে জামা কাপড় গুছিয়েও শেষ অবধি গেল না। কেন যেতে চেয়েছিল আর কেনই বা গেল না তা বোঝা গেল না। শুধু এ ঘটনার পর থেকে ছোটকাকা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে থাকলেন।

পর পর দু'সপ্তাহ ক্লাবেও গেলেন না।

গাজনের সময় আমাদের এখানে মস্ত বড় মেলা হয়।

ঐ সময় ছোটকাকাদের ক্লাবের মেম্বাররা নাটক করে।

সুধীনকাকা, ছোটকাকার বন্ধু বাড়িতে ডাকতে এলেন।

নাটকে সব সময় ছোটকাকা মেয়েদের ভূমিকায় পাট করেন। মেয়ে সাজলে খুব সুন্দর মানায় তাঁকে। দেখে বোঝাই যায় না ছোটকাকা আসলে পুরুষ।

যেবার ছোটকাকার বিয়ে হলো সেবার কঙ্কাবতী নাটকে ছোটকাকা কঙ্কাবতী সেজেছিলেন। দুটো মেডেলও পেয়েছিলেন ভালো অভিনয় করার জন্য।

কিন্তু বাড়িতে এ নিয়ে খুব অশান্তি হয়েছিল। ছোককাকী খুব কান্নাকাটি করেছিল। দুদিন কিছু খায়নি। এমনকি পর পর দুদিন রাত্তিরে জ্যেঠিমার কাছে শুয়েছিল। বহু চেষ্টা করেও মা, জ্যেঠিমা তাকে নিজের ঘরে পাঠাতে পারেননি।

মা আর জ্যেঠিমা ছোটকাকীর আড়ালে হাসাহাসি করেছিলেন। ঢং,—আরে মেয়ে সেজেছে বলেই কি ছোটঠাকুরপো মেয়ে মানুষ হয়ে গেল নাকি? মেয়ে হওয়া অতো সহজ নয়।

ক'দিন পর আবার সব কিছু সহজ স্বাভাবিক হয়ে যাবার পরেও আমার মনে হতো ছোটকাকী আর কোনদিন আগের মতো হতে পারবে না। কাকার ওপর তার ঘেন্নাটা মনের মধ্যে কোথাও না কোথাও থেকেই যাবে।

পরের বছর ঐ থিয়েটার নিয়েই আর এক কাণ্ড ঘটলো। আমাদের বাড়িতে সারা গায়ে কাজ করা দাদুর আমলের একখানা খুব দামী শাল ছিল। একমাত্র জ্যাঠামশাই সেই শালখানা গায়ে দিতেন। তারপর আবার যত্ন করে শালখানা কাঠের আলমারিতে তুলে রাখা হতো।

ঐ শালখানা নিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের খুব গর্ব ছিল।

বলতেন, এমন আর একখানা এ তল্লাটে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দাদুর আমলে শুনেছি এক সাহেব তার মেমসাহেব বৌকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে ঐ শালখানা দেখতে এসেছিলেন। বিলেতে না কোথায় যেন সাহেবের বাড়ি। সারা বছর পৃথিবীর সব দেশ ঘুরে ঘুরে নিজের পছন্দের মহার্ঘ জিনিস কিনে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে মিউজিয়াম গড়ে তুলেছিলেন সেই সাহেব।

দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শালখানা কতো দামে বিক্রি করবেন।

দাদু বলেছিলেন, এটা আমার সখের জিনিস, তবে আপনার যখন পছন্দ হয়েছে নিয়ে যান। দাম দিতে হবে না।

সাহেব দাদুর কাছ থেকে দানের জিনিস নিতে রাজি হননি। দাদুর শাল নিয়ে এই কাহিনী এ অঞ্চলের ছেলে বুড়ো সবাই জানে।

সে বছর কালাদের ক্লাবে কি যেন একটা ঐতিহাসিক নাটক হবার কথা। নাটকের দিন সন্ধ্যে থেকেই মাঠে জমজমাট ভিড়। আমরা আগেই পৌঁছে গিয়েছি। গ্রীনরুমে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছি কাকা রাজকুমারীর পোষাক পরে এক পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন।

জ্যাঠামশাই জামাকাপড় পরে বেরনোর আগে শাল খুঁজতে গিয়ে আলমারির তাকে শাল পেলেন না।

সমস্ত আলমারি তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হলো। শাল কোথাও পাওয়া গেল না।

জ্যাঠামশাই গম্ভীর মুখে শাল ছাড়াই বাবার সঙ্গে নাটক দেখতে গেলেন। তাঁদের আসন আমাদের মত পেছনে নয়, একদম সামনের সারিতে।

যথাসময়ে নাটক শুরু হলো।

তৃতীয় দৃশ্যে রাজকুমারীর বেশে কাকা আর রাজার বেশে মোহিত কাকার একসঙ্গে রাজসভায় প্রবেশ।

আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখলাম রাজার গায়ে দাদুর শালখানা। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখ জ্যাঠামশাই-এর দিকে ঘুরে গেল।

বাবা এবং জ্যাঠামশাই দুজনই একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছেন। রাজাবেশী মোহিতকাকা ডায়লগ বলতে বলতে হোঁচট খেয়ে চুপ করে গেলেন।

আমার বুকের মধ্যেটায় অজানা একটা ভয়ে গুর-গুর করে উঠলো। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। শুধু বাবা আর জ্যাঠামশাই নাটকের আসর ছেড়ে বাড়ি চলে গেলেন। নাটক যখন শেষ হয়েছে, তখন গভীর রাত।

বাড়ি ফিরে দেখি মা সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে ফিসফিস করে বললেন, যাও চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ো।

কি হয়েছে মা?

তোমার জ্যাঠামশাই খুব রাগ করেছেন। ওখান থেকে ফিরে দরজা বন্ধ করেছেন আর দরজা খোলেননি। আমরা কতো ডাকাডাকি করলাম।

তোমাদের খাওয়া হয়ে গেছে?

কি বলছো তুমি, উনি কিছু খাননি, আমরা কি করে খাবো?

ছোটকাকী—

বললাম তো, কেউ খায়নি। কাল সকালে কি যে কাণ্ড হবে জানিনে।

আমার মা সব সময়েই ভয় পান। তাঁর চোখের মণি দু'টোতে একটা ভয় পাওয়া লুকিয়ে থাকে।

কোনো একটা ঘটনা ঘটতে না ঘটতে বাইরে আসার জন্য ছটফট করতে থাকে। তাপর সারাদিনটা সেই ভয় পাওয়াব কষ্টে বিষণ্ণ কেটে যায়।

বাবা এক একদিন খুব রেগে যান—তুমি একটা born ভীতু, আমি যখন থাকবো না তখন বাঁচবে কি করে?

বাবার না থাকা,—ওহ্ কী ভীষণ সেই অন্ধকারারচ্ছন্ন সময়,—মা বাবার কথায় আরও গভীর ভয়ের মধ্যে তলিয়ে যান।

নাটক শেষ হবার পরে মেকআপ্-টাপ তুলে ছোটকাকা যখন বাড়ি ফিরেছেন তখন সারা বাড়ি ঘুমে অচেতন।

পরদিন সকালে বাইরে এসে বাবা প্রথম দেখতে পেলেন দৃশ্যটা। ছোটকাকা

দু'-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে জ্যাঠামশাই-এর ঘরের বাইরে বসে আছেন। সেই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারারাত ঘরে ঢোকেননি ছোটকাকা।

কিছুক্ষণ পর জ্যেঠিমার গলার আওয়াজে আমাদের ঘুম ভাঙলো—আমি বলে দিচ্ছি একজনার সর্বনাশা রাগের জন্য এই সংসার একদিন টুকরো টুকরো হবে। একখানা ভারি তো পুরণো শাল, ভায়ের চেয়ে তাই তেনার কাছে বড় হলো। তাও যদি হিরে জহরৎ হতো বুঝতাম—

যাঁর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা তাঁর দিক থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। কিন্তু বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং যথারীতি খুব ধীর কণ্ঠে বললেন, বৌদি ঘরে যান।

ছেলেমেয়েরা এখুনি সব উঠে পড়বে। এসব কথা তাদের শোনা উচিৎ নয়—

জ্যোঠিমা নিরুত্তরে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

(৫)

ছোটকাকা খুব বেশী সময় বাড়িতে থাকেন না। বাড়ির কোনো ব্যাপার নিয়ে খুব বেশী মাথাও ঘামান না। অফিসের পর তাঁর ধ্যানজ্ঞান ক্লাব আর নাটক নিয়ে।

অনেক রাতে যখন বাড়ি ফেরেন তখন আমাদের বাচ্চাদের অর্দ্ধেক রাত। ছোটকাকী একা সারাদিন লুডো নিয়ে বসে থাকে। আর যাকেই পায় সামনে তার খেলার সঙ্গী হবার জন্যে সাধাসাধি করে।

মাসখানেক বাদে একদিন জ্যাঠামশাই শহরে গেলেন মামলা করতে। সন্ধ্যেবেলা যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে একজন নতুন মানুষ—যাকে আমরা আগে কখনো দেখিনি।

উঠোনে দাঁড়িয়ে জ্যাঠামশাই চেঁচিয়ে জ্যোঠিমার উদ্দেশ্যে বললেন, কই কোথায় গেলে, একবার বাইরে আসতে হবে। জ্যোঠিমা রান্নাঘরে মাছ ভাজছিলেন। হাতে হলুদ, কাপড়ে হলুদের দাগ। বাইরে এসে জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে নতুন মানুষ দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

জ্যাঠামশাই তাঁর অস্বস্তি ভ্রুক্ষেপ না করেই বললেন, এ হচ্ছে কমল। এখন থেকে কমল এখানেই থাকবে। কমল নামের মানুষটি এগিয়ে গিয়ে জ্যোঠিমাকে প্রণাম করতে যাবার আগেই তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন,

থাক্—থাক্।

ওকে চা দাও—জ্যাঠামশাই বললেন, দুপুরে বোধহয় কিছু খাওয়া হয়নি, ঘরে কিছু থাকলে চায়ের সঙ্গে দিও—।

আমরা দূর থেকে কমলকাকার আগমন লক্ষ্য করছিলাম। বড়দি দুদিন হলো শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। তার কোলে তিন মাসের ছেলে। মেজদি পেছনের

বারান্দা থেকে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সুবলদা আর টুকলি বকফুল গাছের তলায়।

মেজদি আমার দিকে চোখ তুলে ইশারায় জানতে চাইল লোকটা কে রে পল্টু?

আমি ঘাড় নাড়লাম, জানিনে।

না জানলেও আমাদের একটা আন্দাজ ছিল। আমাদের বাড়ির বাইরে টানা বারান্দার নিচে সারা বছর ধরে একটা পুরনো গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। ওটাও পুরনো জার্মেয়ার শালখানার মতো ঠাকুরদাদার আমলের। গাড়িখানার ওপরের ক্যাম্বিসের হুড এখন শতছিন্ন।

মাঝে মাঝে শহর থেকে মেকানিক এনে গাড়িখানা সারানোর চেষ্টা করেন জ্যাঠামশাই। দিন সাতেক ধরে একনাগাড়ে খুটখাট শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গে ইঞ্জিনটার ক্রুদ্ধ গর্জন। তারপরেই আবার চুপচাপ।

শহরের মেকানিক একদিন সকলের অজান্তে শহরে ফিরে যায়। গাড়িখানার চামড়া বাধানো সিটের ঘর সংসারে আবার গোসাপরা সপরিবারে ফিরে আসে।

এই পুরনো ফোর্ডখানা চেপেই ছোটকাকা বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। শহর থেকে লোক এসে ফুলপাতা দিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকোর মতন করে গাড়িখানা সাজিয়ে দিয়েছিল। গাড়ির সাজ দেখার জন্যে রাস্তার দুপাশে ভিড় জমেছিল।

বাবা আপত্তি করে বলেছিলেন, অনর্থক এসব করছেন কেন দাদা। একটা গাড়ি ভাড়া করলেই তো মিটে যেত।

এ তুমি বুঝবে না সুজয়। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, অজয় একবারই বিয়ে করবে। তাছাড়া ও নাটক-টাটক করে, সৌখিন ছেলে। ভাড়া গাড়ি করে বিয়ে করতে গেলে ওকে শ্বশুর বাড়িতে সারাজীবন কথা শুনতে হবে। বাবা আর কিছু বলেননি।

গাড়িতে ছোটকাকা ছাড়াও আমরা দু-তিনজন আর জ্যাঠামশাই ছিলেন। তিনিই বরকর্তা। গরদের ধুতি পাঞ্জাবীর সঙ্গে জার্মেয়ার শালখানা পাট করে কাঁধে রেখে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিলেন তিনি। কাকার সঙ্গে আমরা পেছনে।

ফেরার সময় গাড়িতে জ্যাঠামশাই-এর বদলে সদ্য বিয়ে হওয়া ছোটকাকী।

গাড়িতে ওঠার পর থেকে কাকী একটি কথাও বলেনি। বিয়ে করতে যাবার সময় যা হয়নি ফেরার সময় তাই হলো। ফোর্ড হঠাৎ বিনা নোটিশে রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

ছোটকাকা ড্রাইভারের সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। ছোটকাকী চোখের ইশারায় আমাকে নিজের কাছে ডেকে বলল, পল্টু তুমি আমার কাছে বসো।

কথার পর আমার একখানা হাত নিজেব হাতের মধ্যে তুলে নিল।

ঘামে ভেজা ছোটকাকীর হাত অল্প অল্প কাঁপছে---

আমি বললাম, একি তোমার জ্বর এসেছে নাকি?

ছোটকাকী ঘাড় নাড়লো যাতে হ্যাঁ আর না দুই-ই হয়। তারপর ফিসফিস করে বলল, এখানে চা পাওয়া যাবে, পল্টু?

হ্যাঁ, ঐ তো বাজার।

ওতো অনেকটা দূর। থাক্ তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না।

নিষেধ সত্ত্বেও আমি গাড়ি থেকে নেমে ছোটকাকাকে বললাম, একটা টাকা দিন, ছোটকাকীর জন্যে চা আনবো। ছোটকাকীর জ্বর হয়েছে।

কাকা ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়েছিলেন। সেই ভাবেই পকেটে হাত পুরে একটা টাকা বার করে আমার হাতে দিলেন। জ্বরের কথাটা খেয়ালই করলেন না।

হাতের মুঠোয় টাকাটা নিয়ে আমি দোকান লক্ষ্য করে ছুট লাগালাম। ফিরেও এলাম তক্ষুনি।

চায়ের গেলাসটা ছোটকাকীর হাতে দিয়ে বললাম, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

চা খেতে খেতে ছোটকাকী আমায় দেখছিল। কপালে চন্দনের বাসি ফোটা, মাথায় এলোমেলো হয়ে যাওয়া সোলার মুকুট গলায় শুকিয়ে যাওয়া রজনীগন্ধার মালা এবং নতুন গহনার চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা সব মিলিয়ে ছোটকাকীকে দাদুর আমলের মহার্ঘ শালখানার মতো দুর্লভ বস্তু বলে মনে হচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল আমাদের সাদামাটা সংসারে ছোটকাকীকে ঠিক মানাবে না এবং তার ফলে তাকেও শালখানার মতো কাঠের আলমারিতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

গাড়ির ইঞ্জিন আবার সচল হবার পর ছোটকাকা মুখ তুলে আমাকে ছোটকাকীর পাশে বসে থাকতে দেখলেন। তাঁর দু'চোখ সামান্য কুঁচকে গেল।

বললেন, তুই ওখানে কি করছিস? যা সামনে গিয়ে বোস।

ছোটকাকীর যে হাতখানা আমার হাত ধরেছিল সেটা নিঃশব্দে পাশে সরে গেল। আমি ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলাম।

দুদিন অবধি আমরা জানতাম কমল নামের মানুষটা পুরনো ফোর্ডখানা নিয়ে কদিন ব্যস্ত থাকবে তারপর একদিন নিঃশব্দে চলে যাবে।

কিন্তু আমাদেব ধারণা ভুল।

জ্যাঠামশাই সুবলদাকে ডেকে বললেন, সুবল কমলকে নিয়ে ঝিল পাড়ের ঘরখানায় যাও। ও ওখানেই থাকতে চাচ্ছে।

আমাদের বাড়ির পেছনের জলাভূমিটার গা ঘেঁষে একখানা শন ছাওয়া মাটির ঘর ছিল। সারা বছর ধরে ঘরখানা খালিই পড়ে থাকে।

কখনো ছোটকাকার অফিসেব বন্ধুরা এখানে বেড়াতে এলে তখন ঐ ঘরখানা পরিস্কার করে বসবাসেব যোগ্য করে তোলা হয়। আমরা হ্যারিকেনেব আলোয়

রহস্যময় হয়ে ওঠা ওই ঘরখানা থেকে অনেক রাত অবধি ছোটকাকার শহুরে বন্ধুদের হাসি তামাসার ছিটকে আসা টুকরো টুকরো সংলাপ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন সকালে উঠে লক্ষ্য করি অন্যদিনের চেয়ে আজ জ্যাঠামশাই অনেক বেশী গম্ভীর।

মা কেন যেন আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেন,

আজ বাচ্চারা কেউ ঝিল পাড়ে যাবে না কিন্তু—

কেন, ঝিল পাড়ে আজকে কি?

মা বলেন, ওখানে আজ ভুতের নেত্য হবে। যাও পড়তে বসো গে—

প্রায় মাস ছয়েক ঝিল পাড়ের ঘরখানার দরজা খোলা হয়নি। শনের ছাউনি রোদে জলে বিবর্ণ। তবু সেই ঘরখানাই কমল নামের মানুষটার পছন্দ হয়েছে।

সুবলদার সঙ্গে ঘর দেখে ফিবে আসার পর জ্যাঠামশাই বললেন, কি কমল ঘর কেমন দেখলে? ওখানে থাকতে পারবে?

দারুণ, কমল বললেন, আমি ওখানেই থাকবো বড়দা। জল আমার খুব ভালোলাগে।

বর্ষায় কিন্তু জল ঘরের দরজা অবধি উঠে আসে। সাপের উপদ্রব হয় তখন।

আপনি আপত্তি করবেন না বড়দা। কমলের গলায় দীনের প্রার্থনা, আমি ওখানে খুব ভালো থাকবো।

পরদিন সকালে নন্দ ঘরামিকে ধরে আনলো সুবলদা। ঝিল পাড়ের ঘরের চালে নতুন করে ছাউনি দেওয়া হবে। চারপাশের আগাছার জঙ্গল কেটে সব সাফ সুতরো করার হুকুম হলো।

এরই মধ্যে একদিন কমল নামের মানুষটা হাত তুলে আমাকে ডাকলেন, এই খোকা শোনো।

আমি কাছে যাবার পর বললেন, তোমার নাম তো পল্টু?

আপনি আমার নাম জানেন?

কেন জানবো না। তুমি এ বছর ক্লাস নাইনে উঠেছ তাও জানি। তোমাদের কি কবিতা পড়ানো হয়?

আমি বললাম, অনেক কবিতা। তার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালোলাগে—

"অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে,
সুন্দর করো, নির্মল করো,
উজ্জ্বল করো হে—

উনি বিড় বিড় করে বললেন, উজ্জ্বল কর হে—

কার কবিতা জানো?

জানি। রবীন্দ্রনাথের।

good, তোমাদের ইংরিজি কবিতা পড়নো হয়না?

শেলি, বায়রণ, কীটস্—টেনিশন...উনি কথা বলা থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন, এরা সব ভগবান, জানো। ভগবান ছাড়া মানুষে কবিতা লিখতে পারে না।

সময়টা দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা দুজনা ঝিলের পাড়ে চলে এসেছি। ওনার দুচোখ এখন অপলক হয়ে জলাভূমিটার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন এমন একটা দৃশ্য দেখছেন যা একমাত্র ঈশ্বরের বাসভূমিতেই দেখা যায়।

সেদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে হঠাৎ উনি বললেন, জানো পল্টু, এই জলাভূমিটারও একটা মা আছে।

ধ্যাৎ। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বললাম, এটা তো পাতালের তলা থেকে উঠে এসেছে। সবাই জানে।

আমার কথা শুনে উনি মাথা নাডলেন, না পল্টু। সবাই ঠিক জানে না। বড় হলে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে। এই বিশ্ব সংসারে কোনো কিছুই আপনা আপনি হয না। সব হওয়ার পেছনেই আর একটা হওয়া থাকে।

এ রকম অদ্ভুত কথা আমি আগে কখনো শুনিনি! আমি কেন আমাদের বাড়ির কেউ, মেজদি, বড়দি, ছোটকাকীও শোনেনি।

আমি আর কিছু বলি কিনা তা শোনার জন্যে উনি দাঁড়ালেন না। ঝিলটার পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে পেলাম উনি আপন মনে ইংরিজি কবিতা আবৃত্তি করছেন—

"So long thy power hath blest me.
sure it still will bad me on,
O'er moon and fer, O'er crag and
tornent, till
the might is gone,
And with morn, those angel faces smile
which I have loved long since,
And lose a while"

হঠাৎ আবৃত্তি থামিয়ে উনি বললেন, এটা কার লেখা বলতো পল্টু, বলো—বলো—

জানিনে—

উনি আমার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, কার্ডিন্যাল নিউম্যান।

খুব বড় কবি বুঝি?

এবার আমার কথায় হেসে ফেললেন উনি, কবি বড়ও হয় না ছোটও হয় না—। দ্যাখো পল্টু এদিকে দ্যাখো—ওটা কি পাখি বলতো—

আমি বললাম শামকোল। ওই বড় গাছটায় বাসা আছে। সারা বছর এখানেই থাকে। কোথাও যায় না।

বাঃ। কমল হাঁটতে থাকলেন। না থেমেই বললেন, আমাকে তুমি কমলকাকা বলে ডাকবে।

আচ্ছা, আপনি বুঝি অনেকদিন এখানে থাকবেন?

কমলকাকা বললেন, জানিনে কতদিন থাকা হবে। তোমার জ্যাঠামশাই চান আমি সারাজীবন এখানেই থেকে যাই।

মেজদি বলছিল, আপনি মোটরটা সারানো হলেই চলে যাবেন।

তাই বলছিল বুঝি তোমার মেজদি—? না পল্টু আমি মোটর সারাতে জানিনে।

আমি বললাম, আমাদের বাড়িতে যারা মোটরখানা সারাতে আসে তারাই ঝিলপাড়ের ঘরটাতে থাকে।

তুমি জানো এই ঘরখানা প্রথম কে তৈরী করেছিলেন?

না।

তোমার ঠাকুরদা, কমলকাকা বললেন, আসলে এই জলাটারতো কোনো সঙ্গী নেই। সারাদিন একা একা কাটে। তার সঙ্গে কথা বলারও কেউ নেই। সারাদিন ধরে সে একা আর কতো নিজের সঙ্গে কথা বলবে। তাই তোমার ঠাকুরদাদা ঝিলটার বন্ধু হবার জন্য এই ঘরখানা এখানে তৈরী করেছিলেন।

আবার একটা দুর্বোধ্য কথা বললেন কমলকাকা।

জলাভূমির বন্ধু কখনো ঘর হয় নাকি? শ্যাওলা, মাছ, জলপাখিরা আর ঢেউ তোলা বাতাস এরাইতো জলাভূমির বন্ধু।

না কমলকাকা, আমি বললাম, ও ঘরটা ঠাকুরদাদা তৈরী করেছিলেন নিজের জন্যে। রোজ সন্ধ্যেবেলা ওই ঘরটাতে বসে উনি ভগবানের সঙ্গে কথা বলতেন।

কি বললে, কি বললে তুমি পল্টু?

কমলকাকা দৌড়ে আমার কাছে চলে এলেন, এ কথা তোমাকে কে বলেছিলেন?

আমার মা।

সেজবৌদি—

আমার মাকে সবাই সেজবৌদি বলে ডাকে আর বাবাকে সেজদা।

ও, কমলকাকা বাড়ির দিকে যেতে যেতে বললেন, রোজ তুমি আমার কাছে ইংরিজি পড়বে পল্টু।

আপনি বুঝি আমাদের পড়াবার জন্য এখানে এসেছেন?

না পল্টু আমি এখানে কেন এসেছি আমি নিজেই তা জানিনে। তোমার জ্যাঠামশাই বললেন চলুন আমার সঙ্গে, আমি চলে এলাম।

আপনি কাউকে জিজ্ঞাসাও করলেন না?

হ্যাঁ করেছি। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছি।

কেন আপনার বাবা মা?

হ্যাঁ তারা আছেন, আবার নেই—

আপনি বড্ড কেমন করে কথা বলেন, কিচ্ছু বোঝা যায় না।

আচ্ছা, এখন বাড়ি চলো, আমি পরে এক সময় তোমাতে আমার সব কথার মানে বুঝিয়ে দেব।

বাড়ি আসার পর মেজদি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, এ্যাই পল্টু, তোরা এতক্ষণ কোথায ছিলিরে?

আমি বললাম, ভগবানের কাছে।

মেজদি বলল, যাঃ।

ঘরামিদের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর একদিন জ্যাঠামশাই ঝিল পাড়ের ঘরখানা দেখে এসে বললেন, এবার তুমি ঐ ঘরটাতে থাকতে পারবে কমল।

কমলকাকা বললেন, আমি যেদিন এখানে এসেছি সেদিন থেকেই ওই ঘরে থাকতে শুরু করেছি বড়দা।

সেকি, তুমি তো এ কদিন এই বাড়িতে রয়েছ?

কমলকাকা হাসলেন, আমার মনটা কবে থেকে ঐ ঘরে বসবাস শুরু করে দিয়েছে।

জ্যাঠামশাই কমলকাকার কথা শুনে এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছু বললেন না।

ক'দিন পর স্কুল থেকে ফিরলে মেজদি বলল, হ্যারে, তোর সঙ্গে তো কমলকাকার খুব ভাব হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম, কমলকাকা আমাকে ইংরিজি পড়াবেন বলেছেন। মেজদি আমার কথা শুনে ঠোঁট বাঁকালো, দু'লাইন ইংরিজি কবিতা বললেই ইংরিজি জানা হয না।

কমলকাকা মোটেই দু'লাইন ইংরিজি কবিতা বলেন না।

মেজদি আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, তুই কমলকাকাব চামচে হয়ে গিয়েছিস, পল্টু—। ভাগ্—

এর মধ্যেই কমলকাকা আবার একটা কাজ করে বসলেন। যার ফলে প্রমাণ হয়ে গেল উনি সকলের চেয়ে আলাদা।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি রান্নাঘরের বারান্দায় মা জেঠিমা সবাই হাজিব। একটা বড় উনুনেব সামনে বসে আছেন কমলকাকা। মহা ব্যস্ত হয়ে কিছু একটা করছেন।

মা, ও মা এখানে কি হচ্ছে?

মা বললেন, কমল ঠাকুরপো তোমার জ্যাঠিমাকে জিলিপি ভাজা শেখাচ্ছেন।

আমাদের বাড়িতে জিলিপির ভক্ত দু'জন। জ্যাঠামশাই আর ছোটকাকী। সন্ধ্যেবেলা ফেরার সময় প্রায় দিনই জ্যাঠামশাই সদাশিব ময়রার দোকান থেকে শালপাতার ঠোঙা ভর্তি জিলিপি কিনে হাতে করে বাড়ি ফিরবেন।

তাই দেখে কমলকাকা বলেছিলেন, ওগুলোকে আপনারা জিলিপি বলেন বড় বৌদি, যত্তসব ভেজাল জিনিষ দিয়ে তৈরি। আমি আপনাকে জিলিপি ভাজা শিখিয়ে দেব। দেখবেন তারপর থেকে আর কোনদিন ময়রার দোকানের জিলিপি খেতে ইচ্ছে করবে না।

বাবা, জ্যাঠামশাই সবাই বাড়িতে। কেন যেন ছোটকাকা অন্যদিনের চেয়ে আজ আগে ফিরেছেন।

ছোটকাকী বিকেলে গা ধুয়ে পাটভাঙা শাড়ি পরে সবে লুডো নিয়ে বসার কথা ভাবছেন, এমন সময় ছোটকাকার আগমন।

বারান্দায় জিলিপি ভাজা দেখার অনেক দর্শক জুটে গেল। সত্যিই জাদু আছে কমলকাকার হাতে। দেখতে দেখতে গরম আর রসে টইটম্বুর জিলিপি বড় একখানা গামলা ভর্তি হয়ে গেল।

নিপুণ শিল্পীর মতন কমলকাকার হাত দু'খানা গরম ঘিয়ে একের পর এক যে বস্তুটির সৃষ্টি করছিলেন তা যে সদাশিব ময়রার জিলিপির তুলনায় উৎকৃষ্ট তা বার বার বলেও জ্যাঠামশাইয়ের মনে হচ্ছিল কমলকাকার গুণের কথা ঠিক মতো বলা হলো না। তিনিই এক সময় বললেন, এবার তুমি থামো কমল, এতো জিলিপি কে খাবে?

কমলকাকা বললেন, পাড়ায় বিলিয়ে দিতে বলুন বড়দা। রাত্তিরে বাবা মাকে বলছিলেন, বড়দা ওকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন কিন্তু—

কার কথা বলছো তুমি, কমল ঠাকুরপো?

হ্যাঁ—

মানুষটা কিন্তু খাঁটি। কতো কিছু জানে।

জিলিপি ভাজতে জানাটা এমন কিছু নোবেল প্রাইজ পাবার মতন গুণ নয়।

বাবার কথার জবাবে মা কি বললেন শুনতে পেলাম না। কিন্তু বোঝা গেল কমলকাকাকে বাবা পছন্দ করছেন না।

(৬)

পরদিন কিছু জিগোস করার আগে আমিই বললাম, জানেন কমলকাকা কালকে কিন্তু ছোটকাকী আপনার ভাজা জিলিপি খায়নি।

আমার কথা শুনে উনি বোধহয় একটু অবাক হলেন। বললেন, ছোটবৌদি বুঝি জিলিপি পছন্দ করেন না?

ধ্যাৎ, ছোটকাকী তো জিলিপি পেলে আর কিছু চায় না।

ঠিক আছে পল্টু, তুমি এখন যাও—কমলকাকা বললেন, মানুষ একটা জিনিষ অনেকদিন ধরে ভালবাসতে পারে না।

পরদিন স্কুলের ছুটি ছিল।

দুপুরে ঝিলটার মতই আমাদের বাড়িটাও সুনশান্ হয়ে যায়। উঠোনটাতে রোদ্দুর একা একা আলপনা আঁকার খেলা খেলে। বকফুল গাছটা পাতা নাড়িয়ে নাড়িয়ে রোদ্দুরে ডাকে—আয় আমার শরীরে আয়। কালো ঢেউ পিঁপড়েরা মিছিল করে একটা কাঁচাপোকার দেহকে টেনে নিয়ে কোথায় যেন যায়।

স্কুলের হোমটাস্ক শেষ করে বাইরের উঠোনে এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ছোটকাকীর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কমলকাকা।

কমলকাকা ডাকলেন, ছোট বৌদি, ছোট বৌদি—

বলুন—।

শুনলাম কাল আপনি জিলিপি ছোঁননি?

কে বলল?

আমি শুনেছি। কেন ছোট বৌদি, আমার ভাজা বলে আপনার পছন্দ হয়নি?

ছোটকাকী কি বললেন শোনা গেল না। সামান্য নীরবতা। তারপর ছোটকাকী বলল, আপনি এখন এখানে এসেছেন কেন?

ওই যে বললাম—

আমি জিলিপি খাই না খাই, তাতে আপনার কি। আপনি তো বড়দিকে শেখানোর জন্যে জিলিপি ভেজেছেন।

আপনাকেও শিখিয়ে দেব।

থাক্, আমার ওপর আপনার অতো দয়া করতে হবে না।

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ।

কমলকাকা বললেন, একটা কথা বলবো, বলুন শুনে রাগ করবেন না?

কি কথা?

আপনি সারাদিন লুডো নিয়ে বসে থাকেন, আমার একটুও ভালো লাগে না।

কমলকাকার কথার উত্তরে ছোটকাকী ঝিরঝিরিয়ে হেসে উঠলো। তার আনুচ্চ টুকরো টুকরো হাসির ঢেউ উঠোনে রোদের আলপনা ছুঁয়ে মাটির ওপরে থমকে থাকলো।

এখন যান, যান বলছি—

আমাকে আপনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ, যান।

আপনি বললে আপনার সঙ্গে লুডো খেলতে পারি।

ছেলেরা আবার লুডো খেলে নাকি—

কমলকাকা ভারী গলায় বললেন, আপনি ঘুটি সাজিয়ে একলা বসে আছেন তাই বললাম।

রোজই আমি এই রকম করে ঘুটি সাজিয়ে একলাই বসে থাকি, তাই বলে আপনি রোজ আমার সঙ্গে লুডো খেলতে আসবেন নাকি। ছিঃ—

আবার সামান্য সময়ের নীরবতা।

কমলকাকা বললেন, যাচ্ছি—

আর কক্ষণো দুপুরে বাড়ির ভেতরে আসবেন না।

আসবো। আর একদিন আসবো। যেদিন আপনার লুডোটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে এমন জায়গায় ফেলে দেব, কোনদিন আর খুঁজে পাবেন না।

উঠোনে নেবে কমলকাকা পেছন ফিবে তাকালেন, তারপর মাথা নিচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন হেরে যাওয়া আর দুঃখী মানুষের মতন দেখাচ্ছিল তাঁকে।

সেদিন বিকেল সন্ধ্যে এমন কি রাতেও বাড়ির ভেতরে এলেন না।

সন্ধ্যের ঠিক আগে আমি একবার জলাভূমিটার ধারে গিয়েছিলাম। কারোর খোঁজে নয়, এমনিই গিয়েছিলাম।

তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছে। ছায়া রং-এর একটা আলো ঘন হয়ে আছে ঝিলটার ওপর। জলের মধ্যে কুশ গাছের মাথা ছুঁয়ে একঝাক ভুরুল একটানা পিক্ পিক্ করে ডেকে চলেছে। জলাটা স্থির হয়ে আছে। ধ্যানমগ্ন নিশ্চলতায়।

চলে আসছি আমি। দূরে ঝিলের দক্ষিণ পাড়ে ছায়ার মতন একটা মানুষের ওপর চোখ আটকে গেল। কমলকাকা। কমলকাকার গায়ে কিছু নেই। পরনের ধুতিখানা এলোমেলোভাবে কোমরে জড়ানো। গান গাইছেন উনি—

"আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাওকি
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।"

একি, কমলকাকা গান গাইতেও জানেন। হঠাৎ গান থামিয়ে ছুটতে শুরু করলেন উনি—সুধা—সুধা—সুধা—

তাঁর গলার চিৎকারে বাতাসের ঘুম ভেঙে গেল। ঝরঝরিয়ে গাছের পাতা কাঁপা শুরু হলো। কুশ গাছের মাথা নড়লো—ঝিলটা হঠাৎ ঘুম ভেঙে বলে উঠলো—পালা—পালা—পালা—

আমি এক ছুটে বাড়িতে পৌঁছে দু'হাতে বুক ধরে হাঁফাচ্ছি। হঠাৎ পেছন থেকে ছোটকাকী এসে আমার মাথায় হাত রাখলো, কিরে পল্টু ভয় পেয়েছিস?

মাথা নেড়ে কাকীর হাত ছাড়িয়ে আমি আবার এক দৌড়ে বারান্দায়। মেজদির কোলে মুখ রেখে নিশ্বাস নিতে নিতে বললাম, সুধা, সুধা কে গো মেজদি—

মেজদি খুব আস্তে করে আমার মাথার চুলে তার ডান হাতের পাঁচটা আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে বলল, জানিনে। সুধা কারুর নাম হয় না।

(৭)

দিন সাতেক পরে একদিন জ্যাঠামশাই যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন তাঁকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। কমলকাকা তখন তার ঝিলপাড়ের ঘরে। সেদিনের পর থেকে জ্যাঠামশাই ফেরার পর তবে বাড়ির ভেতরে আসেন উনি।

বাবার নাম ধরে জ্যাঠামশাই—সুজয় শোনো।

ছোটকাকা নিজে থেকেই এসে দাঁড়ালেন, কি ব্যাপার বড়দা, কোনো বিশেষ খবর আছে নাকি?

আছে বলেই তো তোমাদের ডাকলাম, ছোট বৌমা কই? এই তো তুমিও আছো। আসছে সপ্তায় গৌরীকে দেখতে আসবে।

কারা দেখতে আসবে বড়দা?

সুজয় জানে, জ্যাঠামশাই বললেন, চিঠিপত্র ওই লেখালেখি করেছে। কলকাতায় বড় ব্যবসা আছে। ছেলেটি ভালো।

ছোটকাকা এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে কাউকে খুঁজলেন, গৌরী, গৌরী কই?

এই তো এক্ষুনি এখানেই ছিল।

আমি জানি মেজদি কোথায়, বললাম, ডেকে আনবো?

ছোটকাকা বললেন, থাক্, আমি যাচ্ছি।

আমাদের বাড়িতে ছোটকাকাই মেজদিকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। এর আগে দু'বার পাত্রপক্ষ মেজদিকে পছন্দ করেনি। তাতে ছোটকাকাই সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। কমলকাকা তাঁর ঘর থেকে এসে জ্যাঠামশাইয়ের পাশে দাঁড়ালেন, কি হয়েছে, বড়দা!

মা বললেন, গৌরীকে দেখতে আসবে।

কমলকাকা কথাটা শুনেই উচ্ছ্বসিত হলেন। বললেন, পাত্রপক্ষ দেখতে আসার আগে এবার আমি গৌরীকে সাজিয়ে দেব। জ্যেঠিমা বললেন, ওটা আর করতে যাবেন না কমল ঠাকুরপো। এবারও যদি গৌরীকে পছন্দ না করে তাহলে হতভাগীর আর বিয়েই হবে না।

সেই জন্যেই তো বলছি আমি নিজে গৌরীকে সাজিয়ে দেব। দেখবো ছেলের বাড়ির লোকরা কেমন পছন্দ না করে ফিরে যায়।

ছোটকাকী মা'র গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। থমথমে মুখে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। পেছন থেকে কমলকাকা ডেকে বললেন, ওকি, ছোট বৌদি, আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? আমি গৌরীকে সাজিয়ে দেবার পর আপনি ওকে শাড়ি পরিয়ে দেবেন। কেমন করে পরাবেন, আমি বলে দেব।

ছোটকাকী কোন উত্তর দিল না। আমার মনে হলো তার এই রাগ দেখানোর কোনো মানে হয় না। এর আগে দু'বার মেজদিকে ছোটকাকী সাজিয়ে দিয়েছিল। তার ফল কি হয়েছিল সকলেই জানে।

রাত্তিরে খেতে বসে মেজদি জ্যেঠিমাকে বলল, মা আমি কিন্তু এবার কমলকাকার কাছে সাজবো।

জ্যোঠিমা বললেন, ও মেয়েদের সাজের কি বোঝে?

যাই বুঝুক, আমি ছোটকাকীর কাছে কিছুতেই সাজবো না।

চুপ-চুপ, জ্যোঠিমা মেজদির মুখ চেপে ধরলেন, এ কথা বলতে নেই, শুনলে তোর ছোটকাকীর কষ্ট হবে।

আমার ইচ্ছে করছিল একছুটে ঝিলপাড়ে গিয়ে কমলকাকাকে খবরটা জানিয়ে আসি। কিন্তু রাত্তিরে জলাভূমিটা একদম একা হয়ে যায়। মনে হয় অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা শবদেহ পড়ে আছে। গা ছমছম করে।

সারাদিন ধরে কতো রকমের পাখি ঝিলটার ওপর চক্কর দেয়। সন্ধ্যে হলেই তারা যে সব কোথায় চলে যায়, কে জানে।

এর মধ্যে কমলকাকা একদিন আমায় ডেকেছিলেন হ্যারে, পল্টু সেদিন তুই পালিয়ে এলি কেন রে?

আমি বললাম, বারে, পড়তে না বসলে আপনিই তো রাগ করতেন।

শোন, আমি গান গাই কাউকে বলিসনি তো?

না।

আর শোন, রাত্তিরে কোনদিন একা একা ঝিলের ধারে যাসনে।

আচ্ছা।

বারণ করলেও আমার ইচ্ছে হয়েছিল, কমলকাকার গান গাওয়ার কথাটা সবাইকে বলে দিই।

ছোটকাকী—ও ছোটকাকী—

অন্যান্যদিনের মতো আজ দুপুর বেলা ছোটকাকী একা বসে বসে লুডোর চাল দিচ্ছিলেন না। বুকে বালিস দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে কিছু একটা পড়ছিলেন।

আমি দু'বার ডাকার পরেও ছোটকাকী কোনো সাড়া দিল না। ঘরে ঢুকে আঁচল ধরে টানতেই ধরমড়িয়ে উঠে বসলো। তার আগে দ্রুত হাতে হাতের কাগজখানা বুকের মধ্যে পুরে বলল, কিরে পল্টু কিছু বলবি?

আমার জিভে এসে কথাটা থমকে ছিল। তাও বললাম না। কেন যেন মনে হলো কমলকাকার গান গাওয়ার কথা ছোটকাকীও জানে।

তাহলে শুধু শুধু কমলকাকা আমাকে বলতে বারণ করেছিলেন কেন?

এক রবিবার সকালে কমলকাকা আমাকে বললেন. আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি পল্টু?

কোথায় যাবো?

হাঁসখালি।

ওখানে কেন যাবেন?

লালপদ্মর বীজ আনতে।

পদ্মফুল, আমি উল্লসিত কণ্ঠে বললাম, আমাদের ঝিলে লাগাবেন বুঝি?

না-রে। আমাদের উঠোনে।

আমাদের বাড়িতে পদ্মফুল ফুটবে, ইস্—

ফুটবে, কমলকাকা অন্যরকম গলায় বললেন, একজনের আমাদের বাড়ির উঠোনে পদ্মফুল ফোটানোর খুব ইচ্ছে।

কার ইচ্ছে কমলকাকা?

সে তোর জানার দরকার নেই। আমাব সঙ্গে যাবি তো চল্।

হাঁসখালি গ্রাম আমাদের বাড়ি থেকে কম করেও তিন মাইল রাস্তা। এর আগে কখনো কমলকাকার সঙ্গে এতদূর কোথাও যাইনি।

কাঁচা রাস্তা। মাঠঘাট পেরিয়ে হাঁটছিলেন কমলকাকা। আর মাঝে মাঝে পেছন ফিরে আমায় তাড়া দিচ্ছিলেন, পা চালা পল্টু। নইলে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে। একবার হেঁট হয়ে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে কমলকাকা বললেন, ঢিলটা কোথায় ছুড়লাম বলতো?

আকাশে।

শূন্যে, কমলকাকা বললেন, আকাশ বলে আসলে কিছু নেই। সবটাই শূন্য। একটু চুপ করে থেকে ভারী গলায় বলে উঠলেন--

হ্যামলেট, বুঝলি পল্টু...। বড় হয়ে সমস্ত হ্যামলেটখানা মুখস্থ করে ফেলবি।

আপনিও বুঝি মুখস্থ করেছেন?

দূর বোকা, পড়াশোনা দিয়ে আমার কি হবে। বললাম যে, আমার সবটাই শূন্য ঠিক আকাশটার মতো।

এবার কমলকাকার গলায় গান উঠে এলো—

"অন্ধকারে রইনু বসে সকল খানি,
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি—"

কেন যেন কমলকাকার মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল তার চোখে এমন একটা কিছু দেখে ফেলবো, যার জন্যে হয়তো আমাকে পস্তাতে হবে।

বাকি রাস্তাটুকু আমরা কেউ আর কোনো কথা বললাম না। চড়া রোদের মধ্যে গাছের ছায়া দেখে আমরা হাঁটছিলাম।

অনেকক্ষণ পর একসময় কমলকাকা নীরবতা ভঙ্গ করলেন। আমরা এসে গিয়েছি পল্টু। তুই এই গাছটার নিচে দাঁড়া, আমি আসছি।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

পদ্মের বীজ আনতে। এখানে একটা মস্ত বড় পুকুর আছে। সারাবছর পদ্ম ফোটে তাতে। একদিন এসে আমি দেখে গিয়েছি।

আমি বললাম, পুকুরে জল নেই?

আছে, সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি সাঁতার জানি। খবরদার ওদিকে যাবিনে।

কমলকাকা আমাকে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেলেন। উনি এখন কি করবেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। কাপড় জামা খুলে রেখে পুকুরে নামবেন জল থেকে পদ্মের বীজ তুলতে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি।

গাছের ছায়ার একটা মায়া আছে। একটুতেই তার সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে সেই ছায়ায়।

এই পল্টু—কমলকাকা সামনে দাঁড়িয়ে। দু'হাতে পদ্মের বোঝা। গায়ে হাতে কাদা আর পাঁক মাখামাখি। মাথার চুল ছাড়াও সর্বাঙ্গ ভেজা। তাও মুখে হাসি—। বললেন, চল্—কতো দেরী হয়ে গেল। বাড়িতে যাবার পর কপালে আজ দুঃখ আছে।

আমি বললাম, আপনাকে কিচ্ছু বলবে না। আমাকেই বকবে, বাড়িতে কিছু না বলে কোথাও গেলে ছোটকাকী ভীষণ রেগে যায়।

আজ তো তোর স্কুল ছুটি—

আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললাম, মাথা দিয়ে জল পড়ছে, মাথাটা মুছে নিন।

ও আপনিই শুকিয়ে যাবে,—চল্ দৌড়োই।

কমলকাকা পদ্মের বোঝা দু'হাতে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে সত্যিই দৌড়তে শুরু করলেন।

আমার মন বলল, এবার উনি ঠিক আবার দুর্বোধ্য একটা ইংরিজি কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করবেন। নয়তো গেয়ে উঠবেন—আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি—

সেসব কিছুই করলেন না। আমরা বাড়ি পৌঁছে দেখলাম ছোটকাকী রান্না ঘরের বারান্দায় আমাদের জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। পড়ন্ত বেলার রংহীন রোদ্দুর বকফুল গাছের মাথা ছুঁয়ে শেষ দিনের কোলে ঝাঁপ দেবার মুহূর্ত গুনছে। ছোটকাকী আমাদেব দেখল কিন্তু কিচ্ছু বলল না।

হাতের বোঝা মাটিতে নামিয়ে কমলকাকা বললেন, উফ্ ভীষণ খিদে পেয়েছে, শিগগির খেতে দিন ছোট বৌদি।

যাক্, খাবাব কথা মনে আছে তাহলে, ছোটকাকী বলল, এই সব ছাইভস্ম আনার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?

কমলকাকা বললেন, বারে, এগুলো দিয়েই তো আপনার ইচ্ছের পদ্ম ফুটবে। পদ্মর বীজ না হলে কি পদ্ম হয়, বলুন?

আমি আপনাকে পদ্ম ফোটানোর জন্যে মাথার দিব্যি দিইনি।

ছোটকাকীর কথা শুনে কমলকাকা ভাত মাখা বন্ধ করে একটু সময় চোখ তুলে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, আপনি না বললেও আমি জানি, বাড়ির উঠোনে পদ্ম ফোটানোর শখ আপনার বহু দিনের।

ছোটকাকী অন্য একরকম চোখে কমলকাকার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, আমার শখ মেটানোর জন্যে আপনাকে আমি পুকুরে ডুব দিয়ে পদ্মর বীজ তুলে আনতে বলেছি? বলেছি, না খেয়ে সারাদিন যাযাবরদের মতন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে?

বলুন, বলছি?

আপনিও তো না খেয়ে আছেন—কমলকাকার চোখে সবজান্তার হাসি।

ছোটকাকী দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। তার দু'চোখের পাতা মেঘের ছায়ায় ভারী হয়ে এলো।

হাতের বাটিটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল ছোটকাকী। বলল, গণক ঠাকুর এলেন। কে খেয়েছে, কে খায়নি—তাতে কার কি আসে যায়?

কমলকাকার হাতখানা মাখা ভাতের ওপর থমকে আছে। একই সঙ্গে তাঁকে খুব দুঃখী আবার সুখীও দেখাচ্ছে।

আমরা যতক্ষণ খেলাম ছোটকাকী আর ফিরে এলো না।

(৮)

সন্ধ্যেবেলা আসল কাজ শুরু হলো।

বকফুল গাছটা থেকে কিছু দূরে উঠোনের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তাতে একটা প্রকাণ্ড মাটির নাদা বসানো হলো। তারপর তারমধ্যে মাটির সঙ্গে আমাদের তুলে আনা পুকুরের মাটি আর পদ্মের বীজ বসিয়ে দেওয়া হলো।

জ্যাঠামশাই দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি হচ্ছে কমল?

লালপদ্ম ফুটবে এখানে।

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন না জ্যাঠামশাই। সব কাজ শেষ করে হাত পায়ের কাদা ধুয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কমলকাকা বারান্দায় উঠে এলেন,

এই যে ছোটবৌদি, আর ঠিক পনেরো দিনের মধ্যে এখানে আপনাব ইচ্ছের পদ্ম ফুটবে।

এখন ছোটকাকী একদম আন্য বকম। দুপুরের সঙ্গে কোথাও কোন মিল নেই। স্বপ্ন পূরণের আশায় তার দু'চোখের মণিতে হিরে চমকাচ্ছিল। বলল, যেদিন বাড়িতে প্রথম পদ্ম ফুটবে, সেদিন আমি নিজে হাতে আপনাকে পায়েস রেঁধে খাওয়াবো কমল ঠাকুরপো।

বাবার কি হলো কে জানে।

সেদিন রাত্তিরে বাইরেই এলেন না। জেঠিমা ডাকতে গিয়ে ফিরে এলেন। বাবা বললেন, আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমার খিদে নেই।

রোজ ভেতরের দালানে খাবার সময় বাবা জ্যাঠামশাইয়ের ঠিক পাশে বসেন। আজ জায়গাটা খালি। ছোটকাকা কদাচিৎ রাতের খাবার সময় হাজির থাকেন। ক্লাব থেকে ফিরতে রোজই তাঁর অনেক রাত হয়ে যায়।

আজ খেতে বসে সকলের দৃষ্টি বার বার বাবার জন্যে নির্দিষ্ট আসনের দিকে চলে যাচ্ছিল।

কমলকাকা খেতে খেতে হঠাৎ বলে উঠলেন, পেঁয়াজ দিয়ে মুসুরী ডাল, দারুণ হয়েছে বড় বৌদি। এরসঙ্গে যদি বকফুল ভাজতেন। আহ্, জমে যেত।

জেঠিমা তাঁর কথার কোনো জবাব দিলেন না। গম্ভীর মুখে যেমন পরিবেশন করছিলেন, তেমনি করতে থাকলেন। হাতে তরকারির বাটি।

কমলকাকা বললেন, দাঁড়ান, কাল আমি গাছে উঠে বকফুল পেড়ে দেব। বেসনের সঙ্গে একটা ময়দা মিশিয়ে নেবেন তাহলে খেতে মুচমুচে হবে।

রাতের খাওয়া হলে আমি শুয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ একটা চেনা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের শব্দ আমাদের ঘরের সামনে। তালপাতার চটি পরেন তিনি। তাঁর হাঁটাচলা আমার এতো চেনা যে ভুল হবার নয়।

চাপা গলায় বাবার নাম ধরে জ্যাঠামশাই ডাকলেন, সুজয় ঘুমোলে নাকি?

বাবা দরজার সামনে উঠে গেলেন, কিছু বলবেন বড়দা?

হ্যাঁ, তুমি আজ খেলে না, শরীর খারাপ?

তা ঠিক নয়। বাবা আমতা আমতা করে বললেন।

তুমি কি আমার ওপর আসন্তুষ্ট হয়েছ?

বাবা নিরুত্তর।

বা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর আমার জানা দরকার সুজয়।

আমি আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হইনি, বড়দা।

ঠিক বলছো?

হ্যাঁ।

যাও শুয়ে পড়ো, রাত হয়েছে।

বাবা পেছন ফিরে তাকালেন। তাঁর চেয়ারের ওপর একখানা বই এর পাতা খোলা। অর্থাৎ বইখানা শেষ না হলে শোবেন না।

জ্যাঠামশাই বাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার দাঁড়ালেন, আমি ওকে এনেছি, তোমাদের মতামত আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। তোমাদের আপত্তি থাকলে বলো, ও চলে যাবে।

কার কথা বলছেন আপনি?

কমল।

ও এখানে থাকলে আমার আপত্তি নেই বড়দা।

জ্যাঠামশাইয়ের চটির শব্দ ধীরে ধীরে সরে যাবার পরেই আবার আমার চোখে ঘুম নেমে এলো। ঘুম আসার মুহূর্ত আগে আমার মন বলল, বাবা জ্যাঠামশাইকে সত্যি কথা বললেন না।

পরদিন সকালে বকফুল গাছে উঠে কমলকাকা ফুল পারছিলেন। গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে মেজদি একটা ছোট ঝুড়িতে মাটিতে পড়া ফুলগুলো রাখছিল।

আমার ছোটবোন টুকলি ঘর থেকে বেরিয়ে ফুল পারা দেখতে দেখতে রান্না ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, ও জ্যেঠিমা, জ্যেঠিমা—

কিরে কি বলছিস?

আমার চুল বেঁধে দাও, আজ চুল না বেঁধে আমি ইস্কুলে যাবো না।

তোর মাকে বল, আমার সময় নেই।

মা নয়, তুমি বেঁধে দাও।

আহ্, টুকুল, দেখছিস সমস্ত কাজ পড়ে আছে। তোর বাবার অফিসের ভাত নামেনি এখনো।

টুকুল জেদ ছাড়লো না, আমি জানিনে, তোমাকেই চুল বেঁধে দিতে হবে। নাহলে আজ কিছুতেই আমি ইস্কুলে যাবো না।

কমলকাকা ফুল পারা বন্ধ করে গাছ থেকে নেমে এলেন। কি হয়েছে রে টুকলি?

জ্যেঠিমা আমার চুল বেঁধে দিচ্ছে না।

কমলকাকা বললেন, আয় আমি তোর চুল বেঁধে দিচ্ছি। টুকলি দু'চোখে অবিশ্বাস নিয়ে কমলকাকার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর বলল, যাঃ, ছেলেরা চুল বাঁধে নাকি?

বাঁধে, আয়, আমার কাছে আয়। কমলকাকা রান্নাঘরের বারান্দা বসলেন, তোর ফিতে কটা যা আছে সব নিয়ে আয়।

কমলকাকা আর টুকলিকে ঘিরে ভিড় জমে গেল। মা জ্যেঠিমা ছোটকাকী। বাড়ির কাজের লোকজন। শুধু ভিড়ের মধ্যে মেজদি নেই। জ্যেঠিমার মুখে আঁচল চাপা। মা হাসতে হাসতে বসে পড়েছেন। বাবা একবার ঘরের বাইরে পা দিয়েই আবার ভেতরে চলে গেলন।

কমলকাকার কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। চিরুণী দিয়ে প্রথমে টুকলির চুল আচড়ে নিলেন। তারপর দু'ভাগে ভাগ করলেন চুলের বোঝা—

ছোটকাকী এরমধ্যে এক সময় ঘরে চলে গেল। তার দু'চোখে লজ্জার সঙ্গে মিশে থাকা ঘেন্না। লাল সিল্কের জড়ির ফিতে দিয়ে নিপুণ হাতে চারগুছির বিনুনী

গড়ে তুললেন কমলকাকা। তারপর সামনের চুলগুলোতে চিরুনী দিয়ে টুকলির পিঠে ছোট একটা চাপ মারলেন কমলকাকা, যা আয়নায় দেখে আয়। পছন্দ না হলে আবার বেঁধে দেব।

টুকলি লাফাতে লাফাতে চলে গেল। কমলকাকার এতক্ষণে খেয়াল হলো তাঁর চুল বাঁধা দেখার ভিড়টার মানুষগুলোর অনেকের চোখ বিস্ময়ের সঙ্গে তিরস্কারও মিশে আছে। এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন এ কাজটা তাঁর করা উচিৎ হয়নি।

শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই কমলকাকা আবার আগের মতন হয়ে গেলেন।

বললেন, বড় বৌদি, গৌরীকে কবে দেখতে আসবে তা কিছু জানতে পেরেছেন?

না। জ্যোঠিমা যেতে যেতে দাঁড়ালেন, ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

সেকি, আমি যে ভেবেছি এবার আমিই ওকে সাজিয়ে দেব। দেখবেন, আমি গৌরীকে সাজিয়ে পাত্রপক্ষের পছন্দ হবেই। তাছাড়া গৌরী নিজেও বলেছে এবার আমার কাছে ছাড়া অন্য কারুর কাছে সাজবে না।

গৌরী আপনাকে এ কথা বলেছে?

না না, আমাকে ঠিক বলেনি। আমি জানি ও এই কথাই বলবে।

জ্যোঠিমা কোনও কথার উত্তর না দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। কমলকাকা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর চেঁচিয়ে জানতে চাইলেন, আর বকফুল লাগবে নাকি, তাহলে পেড়ে দেব।

ভেতর থেকে কোনও উত্তর এলো না।

কমলকাকা উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুললেন। তারপর বিড় বিড় করে বললেন,—

"Do you hear,
let them be well used, for
they are the abstract and brief chronicales
of the time,
After your death you were better have a
bad epitaph,
that their report while you live"

এরপরেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো।

বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন, কমলবাবু, একবার শুনে যান।

বাবার ডাকটা এতই অপ্রত্যাশিত যে কমলকাকা নিজেও অবাক হয়ে গেলেন। থমকে দাঁড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, মেজদা, আমায় ডাকছেন?

হ্যাঁ, আসুন একটু।

ববার ঘরের দিকে যেতে যেতে কমলকাকার চকিত দৃষ্টি পাশের জানলায় পড়লো। সেখানে ছোটকাকী দাঁড়িয়েছিল। এইমাত্র সরে গেল।

বসুন কমলবাবু—

কমলকাকা ইতঃস্তত করছিলেন দেখে বাবা আবার বললেন, ওই চেয়ারটাতে বসুন।

চেয়ারে বসার পর কমলকাকা চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন।

বাবা বললেন, আপনি সেক্সপিয়ার কার কাছে পড়েছেন?

বাবার প্রশ্ন শুনে হাসলেন উনি—কারুর কাছেই শিখিনি। নিজে নিজে যেটুকু পেরেছি—

আমাকে আপনি ঠকাতে পারবেন না, বাবা বললেন, হ্যামলেট আমারও খুব প্রিয়। আপনার এই উচ্চারণ, নাহ্ কমলবাবু, অনুশীলন ছাড়া সেক্সপিয়ারকে এভাবে জানা যায় না।

আমি যাই মেজদা, কমলকাকা বললেন, আপনার অফিসের দেরী হয়ে যাবে।

আজ আমি অফিস যাবো না। বসুন আপনি। বাবা নিজের চেয়ারে বসে বললেন. ঝিলের ধারের ওই মাটির ঘরখানায় থাকতে আপনার কষ্ট হয় না?

কষ্ট, না কিসের কষ্ট? বরং ভালই লাগে—

বাবা প্রায় এক মিনিট কমলকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ দুম করে বললেন, আপনি আমাদের বাড়িতে এমন ভিখিরির মতন পড়ে আছেন কেন?

বাবার দু'চোখে একটা ভয়ংকর জিদ ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল, বাবা নখ দিয়ে কমলকাকার জীবনের রহস্যময় আবরণটাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে না পারলে শান্তি পাবেন না।

কমলকাকার মুখের হাসি একেবারে মুছে না গেলেও অনেক ম্লান হয়ে গেল। বললেন, বড়দা আমাকে আসতে বলেছিলেন তাই এসেছি। আপনি বললে চলে যাবো।

না না, বাবা তাড়াতাড়ি বললেন, আমি যা বললাম তা আপনার মনে রাখার দরকার নেই। আমার মনে হচ্ছিল এর চেয়েও বড় একটা জগত, যেখানে সবাই আপনাকে বুঝতে পারবে, সেখানেই আপনার যাওয়া উচিত। মনুষ্যত্বের আপমান আমার সহ্য হয় না।

কমলকাকা বাবার হাত ধরলেন, মেজদা, এতদিন আমি ভাবতাম আপনি আমায় পছন্দ করেন না। তাই এড়িয়ে চলেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি? যতো তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে চলে যাবো।

বাবা বললেন, আমি কিন্তু আপনাকে এখান থেকে যেতে বলিনি।

কমলকাকা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও বাবা অনেকক্ষণ পেছন থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এখন আর বাবাকে রাগী দেখাচ্ছিল না।

তারপর থেকে সারাদিন কমলকাকাকে একবারের জন্যেও বাড়িতে দেখা গেল না। কোথায় কোথায় যেন কাটালেন তিনি।

জ্যাঠামশাই সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে বললেন, আজ কমলকে দেখছিনে, কোথায় গেল সে?

মা ঘোমটায় মুখ ঢেকে বললেন, আজ কমল ঠাকুরপো দুপুরে খেতেও আসেনি।

ওর ঘরে নেই?

পল্টু দু'বার গিয়ে দেখে এসেছে, সেখানেও নেই। চিন্তার রেখা ফুটলো জ্যাঠামশাইয়ের কপালে, তোমরা কেউ ওকে কিছু বলোনি তো?

তোমার দিদিকে আমার শালখানা দিতে বলো, আমি একবার ওর ঘরটা দেখে আসি।

মেজদি বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর কথা শুনে দাঁড়াল। বলল, আপনাকে যেতে হবে না, আমি আর পল্টু যাচ্ছি আপনি বিশ্রাম করুন।

বাইরের জামা কাপড় না ছেড়েই জ্যাঠামশাই বকফুল গাছতলায় পাতা তার ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন।

(৯)

শীত পড়ার আগে থেকেই ঝিলটা কেমন যেন হয়ে যায়। বোয়ালের ঝাঁক ভাঙার ধারে এসে রুপোলী পেট তুলে রোদ খায়। জল পিপরা সাঁতার কাটতে কাটতে থমকে দাঁড়ায়, তারপর মাগুরের পেটের তলা দিয়ে উল্টোদিকে চলে যায়। পথভুলে একটা দুটো অচেনা পাখি উড়ে আসে। তারা দক্ষিণদিকের শিমুল গাছটার ডালে জবুথবু হয়ে বসে থাকে আর মাঝে মাঝে ঠোঁট দিয়ে গা চুলকোয়।

কমলকাকার ঘরের চালে একটা আগাছার ডালে বেগুনি রং-এর ফুল ফুটে থাকে। কেন যেন আমার মনে হয় কমলকাকার খুব কঠিন একটা অসুখ করেছে। মনের অসুখ।

কেন, অসুখের কথা তোর মনে হয় কেন রে?

মেজদি আমার হাত ধরেছিল। সেইভাবেই জিগেস করল।

আমি মাথা নাড়লাম, জানিনে—

সন্ধ্যেব পর জলাভূমিটা আবার আন্যরকম। গোটা আকাশটা তার অগুণতি তারার আঁচল বিছিয়ে ঝিলটার বুকেব মধ্যে শুয়ে আছে। চারিদিক নিথর নিস্তব্ধ তবু একটা শব্দেব নিঃশব্দ বাঙ্‌ময়তা সর্বত্র জেগে আছে।

মেজদি ফিস্ ফিস্ করে বলল, ওই তো কমলকাকার ঘরে আলো জ্বলছে।

আমি বললাম, ঘবে গিয়ে দেখবি আরো একজন কেউ আছে।

কমলকাকা কক্ষনো একা থাকেন না। তাকে গান গেয়ে শোনান।

তুই নিজের কানে শুনেছিস, পল্টু?

হ্যারে মেজদি, কমলকাকা শুধু একটাই গান গান। "আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাওকি—," এই গানটা।

সুধাকে আমি চিনি মেজদি—।

মেজদি আমাকে সজোরে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তুই চিনিস, কে, কে সুধা?

আমি মাথা নাড়লাম, একজন আছে শুধু হাসে সে।

কথা বলে না। কমলকাকা কথা বলেন, গান করেন তার উত্তরে সে শুধু হাসে। জানিস মেজদি হাসিটা আমার খুব চেনা লাগে তাও চিনতে পারিনে।

কমলকাকার ঘরের কাছে পৌঁছনোর আগেই ঝিলের এক পাড়ে আমাদের চোখে পড়লো—হ্যাঁ, কমলকাকাই, দূর থেকে আবছা অন্ধকারে, তাঁকে একটা চলন্ত গাছের মতন দেখাচ্ছে। তাঁর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর আমাদের কানে ভেসে এলো—

"Mother, for love of grace
Lay not that flattering unction to your doul,
that not your trespass but my
madness speaks"

মেজদির হাতের চাপ পড়লো আমার হাতে, আমাব ভয় করছে, পল্টু—

দূর। ভয় করছে কেন তোমার, কমলকাকা তো কবিতা বলেছেন।

মেজদি ধরা গলায় বলল, তুই দেখেছিস পল্টু, কমলকাকা দিনের বেলা কক্ষণো কবিতা বলেন না। শুধু রাত হলেই—

চল্ মেজদি, আমরা চলে যাই—

চলে যাবি, ঘরটা দেখবিনে, যদি সুধা থাকে—।

দূর! তাকে কক্ষণো দেখা যায় না।

হন্ হন্ করে আমরা দুজনা বাড়ির দিকে হাঁটছিলাম। হঠাৎ মেজদি থমকে দাঁড়িয়ে অন্য একরকম গলায় বলল, আমিও সুধাকে চিনি, কিন্তু তোকে বলবো না। সুধাব কথা কক্ষণো তুই আমার কাছে জানতে চাইবিনে।

পেছনের দরজার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল ছোটকাকী। আমাদের দেখেও কিছু বলল না।

রাত্তিরে খেতে বসে জ্যাঠামশাই বললেন, কি কমল, শুনলাম দুপুরে খেতে আসোনি, কোথায় ছিলে সারাদিন?

কমলকাকা বললেন, সম্বন্ধখালির হাটে গিয়েছিলাম। ওই যাঃ, বলতে একদম ভুলে গিয়েছি। তোর জন্যে চুলের ফিতে কিনে এনেছি টুকলি, ঘরে আছে কাল সকালে নিস্।

বাবা বললেন, দাদা একটা কথা বলছিলাম।

বলো।

গাড়িখানা পড়ে পড়ে রোদ জলে নষ্ট হচ্ছে, ওখানা বেচে দিলেই হয়।

বেচে দিতে বলছো, জ্যাঠামশাই একটু চুপ করে থাকলেন, বাবার আমলের স্মৃতি, বিক্রি করলে ক'টা টাকাই বা পাওয়া যাবে?

বাবা বললেন, আমাদের অফিসে একজন আসে সে এইসব পুরনো জিনিসপত্র দাম দিয়ে কেনে। তাছাড়া কলকাতায় আজকাল শীতের সময় প্রতিবছর এই সব পুরনো গাড়ির রেস হয়। পয়সাওয়ালা লোকেরা নিজেদের শখ মেটানোর জন্যে টাকা খরচের কথা ভাবে না।

কমলকাকা বললেন, গাড়িটা বেচবেন না বড়দা, আমি ওটা ঠিক করে দেব।

তুমি গাড়ির কাজ জানো নাকি?

আমি জানিনে। আমার চেনা একজন আছে সে জানে।

বিয়ের পর গৌরী এ গাড়ি করেই শ্বশুর বাড়ি যাবে। কথাটা কমলকাকা স্বপ্ন দেখার মতো করে বললেন। তাঁর কথায় বাবা অসন্তুষ্ট হলেন কিনা বোঝা গেল না। জ্যেঠিমা কিন্তু বললেন,

না, না কারুর কথা শোনার দরকার নেই, ওটাকে দূর করো। যতো সাপখোপের আড্ডা।

কিন্তু বৌদি, গৌরীর শ্বশুর বাড়ি যাওয়াটা—

জ্যোঠিমা বললেন, দরকার হলে গৌরী ভাড়া গাড়িতে করে যাবে।

পরদিন চিঠি এলো রবিবার পাত্রপক্ষ মেজদিতে দেখতে আসছে। চিঠিখানা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে আপনা-আপনি উৎসবের আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ কমলকাকার।

বুঝে উঠতে পাবছেন না কি করবেন।

এর মধ্যে আমাদের বাড়িতে আর একটা ঘটনা ঘটলো। একদিন সকালে দেখা গেল উঠোনে লাগানো পদ্মের গাছে তিনটে কুঁড়ি এসেছে।

ছোটকাকী লুডো ফেলে দৌড়ে এলো। তারপর কি মনে হতে সেখান থেকে সোজা পেছনের বারান্দায়—

গৌরী, গৌরী কোথায় গেলি—। এই মেয়ে এবার দেখবি ঠিক তোর বিয়ে হয়ে যাবে। বাড়িতে পদ্ম ফোটা খুব সুলক্ষণ।

মেজদি চুপ করে থাকলো।

থুতনীতে হাত দিয়ে ছোটকাকী মেজদিকে চুমু খেল, তোর বিয়ে হয়ে গেলে বাড়িটা কিন্তু একদম খালি হয়ে যাবে।

মেজদি হাসছিল না আবার বিষণ্ণও দেখাচ্ছিল না তাকে।

'বলল, তুমি দেখো ছোটকাকী, আমার বিয়ে হবে না। এবারও আমাকে পছন্দ করবে না।

খবরদার এ সব অলক্ষণে কথা বলবিনে তুই,—তোর কমলকাকাতো বলেইছে এবার তোকে সাজিয়ে দেবে—একটু চুপ করে থাকলো ছোটকাকী। বলল, আজ দুপুরে আমার ঘরে আসিস, লুডো খেলবো। তোর বিয়ে হয়ে গেলে তোর সঙ্গে তো আর খেলা হবে না।

বারান্দা থেকে চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো ছোটকাকী, হ্যারে গৌরী, কাউকে কথা দিয়ে কথা না রখলে পাপ হয় নারে?

তুমি কাউকে কথা দিয়েছ বুঝি?

দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি কিছুতেই সে কথা রাখতে পারবো না।

মেজদি বলল, তোমার অনেক কষ্ট, না ছোটকাকী?

ছোটকাকী কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে মেজদির দিকে তাকিয়ে থাকল। কপালে লাল সিঁদুরের টিপটা দপ্ দপ্ করছিল। তবু ঠোঁটের ভাজে একটা নিরুচ্চার কান্না উঠে এলো ছোটকাকীর।

মেজদি বলল, বিয়ের পর আমারও যদি তোমার মতো কষ্ট হয়, তাহলে আমি ঠিক মরে যাবো।

ছোটকাকী দু'হাত বাড়িয়ে মেজদিকে সাপটে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, তাও আমাদের বাবা-মারা আমাদের বিয়ে দেয় গৌরী। আমি তোদের ছোটকাকাকে বিয়ে করতে চাইনি, তাও আমাকে—ছোটকাকীর গলা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল, তুই তো সম্পর্কে আমার মেয়ে! তাই আমার কষ্টের কথাটা তোকে বললাম।

চোখ থেকে গড়িয়ে আসা জল ছোটকাকী হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে ফেলল, সারাদিন আমি লুডো নিয়ে বসে থাকি, নিজের ইচ্ছে মতো চাল দিই, ইচ্ছে মতো ঘুটি দিয়ে ঘুটি কাটি। তোরা সব্বাই আমাকে পাগল ভাবিস।

পেছনের বারান্দা থেকে ঝিলটা দেখা যায়। এখন আকাশে একটুও মেঘ নেই। এইমাত্র যেন স্নান শেষ করে এসে দাঁড়িয়েছে আকাশটা।

ঝিলের অগোছালো জলের ঢেউ-এ কোনো ভাঙা-গড়া নেই। একঝাক ফড়িং জলে ডুব দেবে কিনা ভাবতে ভাবতে কিছুতেই মনস্থির করতে না পেরে অন্যদিকে উড়ে গেল। কলমির নুয়ে পড়া শরীরের গা ঢেকে একটা গোসাপ অবাক হয়ে জলের মধ্যে কিছু একটা দেখছিল।

ছোটকাকী নিশ্বাস ফেলে বলল, ছোটকাকার কথাটা কাউকে বলিসনে গৌরী। শুনলে কষ্ট পাবে।

ছোটকাকী বারান্দা থেকে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে মেজদি সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকিয়ে সটান জিজ্ঞাসা করল, একটা সত্যি কথা বলবে ছোটকাকী?

কি কথা রে?

তুমি সুধাকে চেনো?

ঠিক ঘরে ঢোকার আগের মুহূর্তে যেন একটা পাকা ঘুটি কাটা পড়েছে সেই কষ্টে ছোটকাকীর গলা থেকে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ পাক খেয়ে উঠে এলো। পরক্ষণে ছোটকাকী নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তোর মা বোঝহয় ডাকছে আমাকে। ইস্ বাট্‌ঠাকুরের বেরোবার সময় হয়ে গেল। আমি এতক্ষণ এখানে, ছিঃ।

(১০)

মেজদিকে দেখতে আসার একদিন আগে থেকে কমলকাকা তার ঘরের বাইরে আসা বন্ধ করে দিলেন।

বললেন, গৌরী আজ ভাত খাবে না, বড় বৌদি।

তাহলে কি খাবে?

ফলটল, আর দুধ।

জ্যেঠিমা বললেন, বলো কি, মেয়ে উপোষ করে থাকবে তারপর যদি মাথা ঘুরে—

কিচ্ছু হবে না বড় বৌদি। ওকে একটু হালকা দেখানো দরকার। কথাটা বলে কমলকাকা আর সেখানে দাঁড়ালেন না। তাঁর এখন অনেক কাজ।

ছেলের বাড়ির লোকরা যে ঘরে বসে মেয়ে দেখার কথা, সে ঘরটা একবার দেখেই উনি বাতিল করে দিলেন। বললেন, ছোড়দার ঘরটা সবচেয়ে ভালো। অনেক আলো আসে ঘরটাতে। তাছাড়া শীতকাল, একটু বেলাতেই রোদ মরে যায়। মরা আলোয় মেয়ে দেখাতে নেই।

গৌরী বসবে ওদের ডানদিকে—

বাবা বললেন, মরা আলোর ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, ডানদিকে বাঁদিকে বসার ব্যাপারটা কি কমলবাবু?

কমলকাকা হাসলেন। বাবার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, আর একটা কথা, ওরা আসার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দেখার পর্বটা সেরে ফেলতে হবে। খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব তার পরে।

পরদিন মেজদি তখন সাজগোজ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আমরা সবাই 'থ'। এ কে, মেজদি না অন্য কেউ? হাত ধরে মেজদি আমাকে কাছে টেনে নিল, কিরে পল্টু আমাকে চিনতে পারছিস নে।

জেঠিমা পর্যন্ত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

যে মানুষটা সব কিছুর জন্যে দায়ী তাকেই মেয়ে দেখার সময় আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না।

বাবা বললেন, সেকি, কমলবাবুকে ডাকো এখানে।

ছেলের বাড়ির লোকজন ততক্ষণে এসে পড়েছে। সবসুদ্ধ চারজন। আমবা

পাশের ঘর থেকে উঁকি দিয়ে তাদের দেখছিলাম। টুকলি হেসে ফেলতে বাবা চোখ বড় বড় করে তাকে শাসন করলেন।

মেজদি চুপ করে ঘরের মধ্যে বসেছিল। হাত তুলে ডাকলো আমাকে। কাছে যাবার পর বলল, কোথায় রে?

কে?

কমলকাকা?

এখানে নেই। বোধহয় নিজের ঝিলপাড়ের ঘরে। ডেকে আনবো?

তাড়াতাড়ি যা, বলবি আমি আসতে বলেছি।

পাশের ঘর থেকে জ্যাঠামশাইয়ের ভারি গলা ভেসে এলো, পল্টু, যাও তো কমলকে চট করে ডেকে আনো।

যাচ্ছি জ্যাঠামশাই।

আমি ছুটলাম।

ভরন্ত দুপুর। জলাভূমিটা একদম একা। তার সারা শরীর জুড়ে একটা নির্বেদ ধ্যানময়তা।

ছুটতে ছুটতে কমলকাকার ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার কানে দুজনার কথা বলার আওয়াজ ভেসে এলো। আমি কমলকাকার নাম ধরে কিছুতেই ডাকতে পারলাম না। কমলকাকার গলার শব্দের ঢেউ আশ্চর্য এক স্বপ্ন ছড়িয়ে ইংরিজি কবিতা হয়ে চারপাশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। কবিতার প্রতি ছত্রে শরীরে আর একটি শরীরের আবেদন তা এতই স্পষ্ট যে আমি ইচ্ছে করলেই তাকে ছুঁতে পারতাম।

কমলকাকাকে না ডেকেই আমি ফিরে আসছিলাম। আমার দ্রুত চলার ছন্দে মিলেমিশে সুধা শব্দটা বার বার উঁকি দিয়েই আবার পরক্ষণে মন থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল।

মেজদি...মেজদি...তোর পায়ে পড়ি আমাকে বল্ সুধা কে, তোর গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আমি কাউকে বলবো না এমন কি ছোটকাকীকেও না।

যারা মেজদিকে দেখতে এসেছিল তারা বিকেলের আগেই চলে গেল। রাগ রাগ মুখ করে নিজের ঘরে ঢুকে গেল ছোটকাকী। মেজদির দু'চোখের হিরের কুচির ওপর কালো হয়ে মেঘ জমলো। জ্যাঠামশাই বকফুল গাছের নিচে ইজিচেয়ারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর কোলের ওপর ঠাকুরদার আমলের জামেয়ার শালখানা।

কিছুক্ষণ পর জ্যেঠিমা হঠাৎ রান্নাঘরের বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বললেন, ওই তো কমল ঠাকুরপো এসেছে।

চক্ষের পলকে বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেল। কিন্তু ছোটকাকার ঘরে পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার মনে হলো ঘরের মধ্যে কেউ চাপা স্বরে কাঁদছে।

একদিন দু'দিন করে দশদিন চলে গেল।

মেজদির চোখের হিরের কুচিতে আবার ছায়া জমতে শুরু করেছে। ছোটকাকীর কিছু একটা হয়েছে। আজকাল কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না।

একদিন জ্যেঠিমা বাবাকে বললেন, সেজদা, আপনার অফিসে পুরনো জিনিস কেনার যে লোকটা আসে তাকে একদিন আসতে বলুন।

জ্যেঠিমাও বাবাকে সেজদা বলে ডাকেন।

বাবা বললেন, কেন বৌদি?

ওই ভাঙা গাড়িখানাকে বিদেয় করা দরকার।

রড়দা রাজি হয়েছেন?

আমি তাকে রাজি করাবো। আপনি তাকে আসতে বলুন। ঠিক আছে, বলে দেব। বাবা বললেন, দেখবেন পরে যেন এই নিয়ে অশান্তি হলে আমায় দায়ী করবেন না।

জ্যেঠিমা বললেন, গৌরীব বিয়ের জন্যেও টাকা পয়সা লাগবে।

গৌরীর বিয়ের খরচাপত্তর নিয়ে আপনি ভাববেন না, বাবা জ্যেঠিমার কথায় বিব্রত হলেন।

এ সংসারে অনটন নেই এবং অনটন নিয়ে এভাবে খোলামেলা আলোচনাও কখনো হয় না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে জ্যেঠিমা ওই নিয়ে আর কিছু বললেন না। বললেন আপনার জলখাবার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আজ রবিবার ছুটির দিন।

তাও সকালে উঠেই ছোটকাকা বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, আমার ফিরতে রাত হবে, বৌদি। আণার জন্যে কারুর অপেক্ষা করার দরকার নেই।

শেষ কথাটা ছোটকাকীর উদ্দেশ্যে।

বাড়িতে আজ উৎসবের মতো আবহাওয়া। জেলেদের আগেই খবর দেওয়া হয়েছিল, ঝিল থেকে মাছ ধরা হবে। দুজন জেলে জাল নিয়ে সকালেই হাজির।

বিশেষ দিন এবং অনুষ্ঠান ছাড়া ঝিল থেকে মাছ ধরা হয় না। বড়দির বিয়ের সময় ধরা হয়েছিল।

ছোটকাকা কি কবে যেন আগেই টের পেয়ে যান বাড়ির এই উৎসবের কথা এবং যথারীতি নিজেকে তার থেকে আলাদা করে নেন। ছোটকাকীর লুডো সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকা দীর্ঘায়িত হয়।

জ্যাঠামশাই আমাকে বললেন, পল্টু বাবাকে জিজ্ঞেস করে এসো, ঝিলে মাছ ধরা হচ্ছে, যাবে কিনা।

আমি এক দৌড়ে বাবার সামনে। বাবার হাতে আজ বই নেই। তার বদলে

বাবা বিছানার ওপর ব্যাঙ্কের পাশবই চেকবই আরও সব অন্য কাগজপত্র ছড়িয়ে বসে আছেন। তাঁর কপালে কয়েকটা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাবা, জ্যাঠামশাই ডাকছেন।

বাবা মুখ তুললেন না, কেন?

ঝিলের মাছ ধরা হচ্ছে, তাই বললেন--

আমি ব্যস্ত আছি, ছোটকাকাকে বলো।

ছোটকাকা সকালেই বেরিয়ে গিয়েছেন।

ও—, বাবা আর একটি কথাও বললেন না। চেকবই-এর পাতা উল্টে তারমধ্যে তন্ময় হয়ে থাকলেন।

জ্যাঠামশাই, বাবা যাবেন না শুনে একলাই চলে গেলেন।

মেজদি তার পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল, আমার একটুও ভালো লাগে না।

ঝিল থেকে মাছ ধরার কথা জ্যাঠামশাই বলেছেন, আমি বললাম।

মেজদি বলল, যেই বলুক, দেখবি পাখিগুলো ভয় পেয়ে আর আসবে না। মাছগুলো বাঁচার জন্যে মাটি খুড়ে পাতালের মধ্যে সেধিয়ে যাবে। রোজ রোজ এই করলে ঝিলটাও একদিন ভয় পেয়ে যাবে।

রোজ রোজ কোথায় মেজদি, আমি প্রতিবাদ করলাম, সেই তো কবে বড়দির বিয়ের সময় ঝিলে জাল ফেলা হয়েছিল।

মেজদি আর আগের খথার রেশ টানলো না। বলল, এই পল্টু আমার একটা আঙুল ধরতো। তোর যেটা ইচ্ছে ধর।

এই আঙুল ধরার খেলাটা আমরা সবাই জানি।

মেজদি তার ডানহাত তুলে দু'টো আঙুল এগিয়ে দিল, নে ধর।

আমি একটা আঙুল ধরার পর মেজদি হঠাৎ রেগে গেল। হাতটা টেনে নিয়ে বলল, তুই একটা অপয়া।

কেন, তোমার ইচ্ছেটা মিলল না বুঝি?

মিলল কি মিলল না তা তোকে বলবো কেন, ভাগ।

মেজদি চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিয়েও হতাশাটাকে গোপন করতে পারলো না।

আমি বললাম, ছোটকাকীর ঘরে যাও, তোমাকে লুডো খেলার জন্যে ডাকছেন।

মিথ্যে কথা বললি?

আমি চুপ। মেজদি কখনো চট্ করে রেগে যায় না। কিন্তু তার দু'চোখে ছায়া পড়লে আমি তার দুঃখী হওয়াটা বুঝতে পারি।

মেজদি এখন সারাদিন যে ভাবনার মধ্যে ডুবে থাকে, তা আমি জানি। যে মানুষগুলো তাকে দেখতে এসেছিল তারা ফিরে গিয়েও আজ অবধি কিছু জানায়নি। বাড়ির সকলে ধরেই নিয়েছে এবারও মেজদির ভাগ্যে বিয়ের ফুল ফুটলো না।

একদিন সকলের সামনেই জ্যেঠিমা নিজের ভাগ্যকে শাপ-শাপান্ত করলেন। আমি তখনই জানতাম আমাদের ভাগ্যে কি আছে। ও মেয়ের তাও যদি রংটা থাকতো—দোষ তো আমারই আমি যে গর্ভে ধরেছি—

বাবা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে কঠিন গলায় বললেন, কি হচ্ছে বৌদি—

জ্যেঠিমা চুপ করলেন কিন্তু তাঁর হাঁটাচলা থেকে বোঝা গেল মেজদির ওপর তাঁর বিতৃষ্ণার ধার একটুও কমেনি।

(১১)

মেজদি ছোটকাকীর ঘরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এলো—সর্বনাশ হয়েছে পল্টু, ছোটকাকীর লুডোটা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি ভয়ে কাঠ হতে হতে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, এখন কি হবে মেজদি?

মেজদি বলল, ছোটকাকী বলছে লুডোটা কেউ চুরি করেছে। ধ্যাৎ লুডো কেউ চুরি করে নাকি। ভারি তো দাম।

বুঝলি পল্টু, কে চুরি করেছে, ছোটকাকী জানে।

আমি কতো করে তার নাম জানতে চাইলাম, কিছুতেই বলল না।

আমার মনের মধ্যে একটা অজানা ভয় ঘূর্ণি বাতাসের মতো পাক খেয়ে উঠেছে। ঝিলে মাছ ধরার আনন্দ আর আকর্ষণ মুহূর্তের মধ্যে নিভে গেল।

কেন যেন আমার একজনার কথাই মনে এলো। এই হঠাৎ বিপদ থেকে একজনাই বাঁচাতে পারে ছোটকাকীকে—

সে কমলকাকা।

এই মেজদি, কমলকাকাকে বলবো?

কি বলবি?

ছোটকাকীর লুডো হারানোর কথা।

মেজদি আমার পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল, এক নম্বরের পাকা তুই। তুডো হারাতে তুই নিজেব চোখে দেখেছিস?

তুমি যে বললে?

মেজদি বলল, আমিও শুনেছি। যে বলেছে সেই ইচ্ছে করে হারিয়েছে।

যাঃ, কি বলছো মেজদি?

ঠিকই বলছি। তুই মেয়েদের মনের কি বুঝিস?

দু'ঘন্টা বাদে এক ঝুড়ি মাছ এনে উঠোনের একপাশে ঢেলে দিল মদনদা। পাঁচমিশেলি মাছ। রুই চারা, বোয়াল, ট্যাংরা, বেলে, ভোলা, চিংড়ি—

মাছ দেখতে উঠোনে ছোটখাটো ভিড় জমে গেল।

মা মাছ দেখতে দেখতে বললেন, আচ্ছা, ওই টুক্ টুক্ বাচ্চা গুলোকে ধরলেন কেন, কমলঠাকুরপো—

কমলকাকা বললেন, জালে উঠেছিল।

ছেড়ে দিলেই হতো। এখনো ছটফট করছে, মরেনি।

বড়দা ধরতে বলেছিলেন, ওগুলো আর বাড়বে না।

জলে থাকলেই বাড়তো।

না সেজ বৌদি, জলে ঢেউ না থাকলে মাছ গায়ে বাড়ে না। নদীর মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে কেন জানেন—

মেজদি বলল, উনি সব জানেন। ঝিলে ঢেউ নেই, এই পল্টু এই সেদিনই আমরা দেখলাম না ঝিলের জলে কত বড় বড় ঢেউ উঠছিল।

ক'দিন ধরে মেজদি সব কথাতেই কমলকাকার দোষ ধরছে। ছেলের বাড়ির লোকরা পছন্দ না করলে কমলকাকা কি করবেন? উনি তো মেজদিকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

মেজদি হঠাৎ দুম করে বলল, আজ আমি মাছ খাবো না। তুইও খাবিনে পল্টু।

টুকলি উঠোনে উবু হয়ে বসে মাছ ঘাঁটছিল। তাকে ডেকে মেজদি বলল, শুনে যা টুকলি—

টুকলি তার কথার কোনো উত্তর দিল না দেখে মেজদি উঠোনে নেমে গেল। তার টুকলির কান ধরে দাঁড় করিয়ে বলল,

তোর পড়াশোনা নেই। যা এখান থেকে,—ভিখিরিদের মতোন মাছ ঘাটছিস—

রাগ নয় মেজদির চোখে দুঃখী হওয়ার মেঘ।

সত্যিই দুপুরে মাছ খেল না মেজদি।

মা বললেন, গৌরী আইবুড়ো মেয়েদের মাছ খাবো না বলতে নেই। মার কথা শুনলো না। ডাল তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে পরলো মেজদি। আমি ঘরে যাবার পর বলল,

খবরদার তুই আমার ঘরে ঢুকবিনে।

কেন, আমি কি করেছি?

তোকে মাছ খেতে বারণ করেছিলাম কিনা—

জ্যেঠিমা যে খেতে বলল। আমি খেতে চাইনি তাও জোর করে—

সত্যিই মেজদি সারাদিন আমার সঙ্গে কথা বললো না।

আমি একা একা ঝিলের ধারে ঘুরে বেড়লাম। বাড়ি ফেরার পর বুঝতে পারলাম, এর মধ্যে ছোটকাকীকে নিয়ে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।

লুডো হারানোর শোকে সারাদিন ছোটকাকী দরজা খোলেনি। কিছু খায়ওনি।

সন্ধ্যের পর কমলকাকা আমাকে একলা পেয়ে বলল, বুঝলি পল্টু, আমি এখান থেকে চলে যাব।

যাঃ।

তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

জ্যাঠামশাই আপনাকে যেতেই দেবেন না।

তাও আমি যাবো। আমার কপালটাই খারাপ। যেখানেই যাই সেখানেই এরকম হয়।

কি হয়েছে কমলকাকা?

সে তুই বুঝবিনে। বড়দা বলেছিলেন বলে ঝিল থেকে মাছ ধরলাম। শুনলাম, আমি ধরিয়েছি বলে অনেকে মাছই খায়নি।

আমি মাছ খেয়েছি কমলকাকা—

গৌরী খায়নি, ছোটবৌদি খায়নি, কমলকাকাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম, ছোটকাকী তো ভাতও খায়নি। লুডো হারিয়েছে বলে মন খারাপ। সারাদিন দরজাই খোলেনি। মা জ্যেঠিমা কতো ডাকাডাকি করলেন তাও—

চল পল্টু, কমলকাকা বললেন, আমরা দুজনা খুঁজে দেখি। আমার হাত ধরে টানলেন তিনি।

আমি বললাম, এই রাত্তিরে কেথায় খুঁজবো আমরা। তার চেয়ে কাল সকালে বরং—

কমলকাকা অন্য একরকম ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, লুডোটা খুঁজে না পেলে ছোটবৌদি রাত্তিরেও কিছু খাবেন না। তোর ভাবনা হচ্ছে না পল্টু?

দূর আমি মাথা নাড়লাম, মা ভাববে, জ্যেঠিমা ভাববে।

চল্, ঝিলপাড়ে যাবি—

আপনিতো রাত্তিরে ওখানে যেতে বারণ করেছেন—

কমলকাকা বললেন, আমি সঙ্গে আছি এখন, চল্ আজ তোকে অনেক কবিতা শোনাবো।

আপনার ইংরিজি কবিতা আমি একটাও বুঝতে পারিনে।

বড় হলে বুঝবি. কমলকাকা হাসলেন। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যা পল্টু।

আমি বললাম, ইচ্ছে করলেই বুঝি কেউ বড় হয়ে যেতে পারে?

থাক্ তোকে বড় হতে হবে না, কমলকাকা পদ্মফুলের নাদাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বড় হওয়ার খুব কষ্ট রে, তখন যে সব কিছু জানা হয়ে যায়।

কমলকাকা নিশ্বাস চাপলেন তারপর মুখ তুলে আকাশ দেখলেন। আবছা আলো অন্ধকারে তাঁর চোখ দেখা যাচ্ছিল না। তবু আমি বুঝতে পারলাম কিছু একটা খোঁজার জন্য উনি আকাশে হাতড়াচ্ছেন।

কমলকাকা অনেক তারার নাম জানেন। তাদের চেনেন। কথা বলেন তাদের সঙ্গে। যে ভাষায় কথা বলে তা একমাত্র তিনিই জানেন।

(১২)

এই যে হ্যালো ব্রাদার—

পরদিন সকালে কমলকাকা পাম কাছের গোড়া থেকে আগাছা বেছে পরিস্কার করছিলেন। ছোট কাকার ডাক শুনতে পেলেন না। ব্যাগ নিয়ে ছোটকাকা অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি।

আবার ডাকলেন তিনি, এই যে মিঃ হ্যামলেট—

চমকে মুখ ফেরালেন কমলকাকা, আমাকে ডাকছেন ছোড়দা?

ছোড়দা—যাঃ বাব্‌বা, আমি কোনো দাদাটাদা নই। কমলকাকার কাঁধে হাত রাখলেন ছোটকাকা। আমার নাম ধরে ডাকলেও আমি কিছু মাইণ্ড করবো না। আমার সঙ্গে একটু বাইরে এলে ভালো হয়—

কমলকাকা ছোটকাকার সঙ্গে বাইরে গেলেন।

ছোটকাকা বললেন, আবার কবে জিলিপি ভাজা হচ্ছে?

আপনি বুঝি জিলিপি ভালবাসেন?

না মশাই, আমি কিছু ভালোটালো বাসিনে, নিজেকে ছাড়া। ওই বড কর্তা আছেন উনি এসব বেশ পছন্দ করেন।

আমাকে আপনি কিছু বলবেন?

হ্যাঁ, বলবো বলেইতো বাইরে ডেকে আনলাম।

ছোটকাকা হাতের ব্যাগ খুলে একখানা দশ টাকার নোট বার করলেন। বললেন, এটা রাখুন। সময় করে বাজার থেকে একখানা লুডো কিনে আমার স্ত্রীকে দেবেন। কাল কে যেন ওর লুডোখানা নিয়ে গেছে। আর বলবেন, না, সারারাত এক ফোটা...ওই যাঃ, আমাব দেরী হয়ে যাচ্ছে। যা বললাম বুঝতে পারলেন তো—?

কমলকাকা ঘাড় কাত করলেন।

ছোটকাকা বললেন, সারাদিন ওই লুডো নিয়েই পড়ে থাকে—যার যা কপাল, আমি কি করবো বলুন—। আচ্ছা হ্যামলেটবাবু, মাঝে মধ্যে আপনিও তো ওর লুডো খেলার সঙ্গী হতে পারেন...না মানে, দুপুরে তো আপনার কিছু করার থাকে না—

কথা বলতে বলতে দু'পা এগিয়ে ছোটকাকা আবার দাঁড়ালেন। সেদিন সেজকত্তা আপনাকে ঘরে ডেকেছিল শুনলাম, কি বলছিল? থাক্ আপনাকে কিছু বলতে হবে না। সারা দিনরাত্তির বই মুখে করে একটা মানুষ যে কি করে বাঁচতে পারে! চলি ব্রাদার, একদিন সময় করে আপনার ইংরিজি কবিতা শুনবো—হ্যাঁ, আজ থেকেই তাহলে আপনি ছোট বৌদির লুডোর পার্টনাব হয়ে যাচ্ছেন—

টাকাটা হাতে নিয়ে কমলকাকা অনেকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর বাড়ি ফিরে এলেন। ছোটকাকাকে এতদিন তাঁর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এখন

থেকে ছোটকাকা দুর্বোধ্য হয়ে গেলেন।

আমাদের এখানকার দোকানে লুডো পাওয়া যায় না। বাসে করে শহরে গেলেন কমলকাকা লুডো কিনতে। ফিরতে ফিরতে বেলা পড়ে গেল।

ছোট বৌদি—

কে?

আমি—, দরজার সামনে এসে ছোটকাকী বলল, কেন এসেছেন, আমি যে আপনাকে বলেছিলাম কক্ষণো আসবেন না।

আপনার লুডো—।

ছোটকাকী দু'চোখে অবিশ্বাস নিয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে লুডোখানা কমলকাকার হাত থেকে টেনে নিল, লুডো কে আনতে বলেছে?

আপনি, মানে আপনার আগের লুডোখানা শুনলাম—

কমলকাকাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ছোটকাকী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, এক চোর চুরি করেছে, ছিঃ এ বাড়িতে আগে কোনদিন চোরের উপদ্রব হয়নি—

ছোটকাকীর দু'চোখ ঘেন্নায় কুঁচকে গেল। দু'হাতে লুডোখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কমলকাকাকে লক্ষ্য করে টুকরোগুলো ছুড়ে মারলো। পরমুহূর্তে কমলকাকার মুখের উপরেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নিঃশব্দ পায়ে সরে এলেন কমলকাকা।

রাত্তিরে খেতে বসে বাবা বললেন, দাদা, একটা কথা বলছিলাম।

জ্যাঠামশাই চোখ তুললেন, বলো।

বাবা বললেন, কমলবাবু তো বাড়িতেই থাকতে পারেন। কতো ঘর খালি পড়ে আছে। শীত পড়েছে। ঝিলপাড়ের ঘরে থাকতে কষ্ট হবে।

কমলকাকা মাথা নিচু করে খাচ্ছিলেন। কোন কথা বললেন না।

আমি জানতাম কমলকাকা ঝিলের ঘর ছেড়ে কিছুতেই আসতে চাইবেন না। তার ইংরিজি কবিতা বলতে বলতে ঝিলের চারপাশ দিয়ে ছোটা, তাঁর সুধার সঙ্গে সংলাপ, তাঁর তারাদের সঙ্গে কথা বলা—এ সব একটাও এখানে এলে হবে না।

আমার মনে হলো কমলকাকা ওখানে না থাকলে ঝিলটারও মন খারাপ হয়ে যাবে।

রাত্তিরে শোবার আগে মেজদি বলল, তুই এক নম্বরের পাকা। সব সময় বড়দের কথার মধ্যে থাকিস কেন রে?

আমি বললাম, তুমিও তো বড়দের কথার মধ্যে থাকো।

মেজদি আদর করে আমার মাথার চুল নেড়ে দিয়ে বলল, বোকা কোথাকার। আমি তো কবেই বড় হয়ে গিয়েছি।

যাঃ, মেজদির সহজ সরল কথাটা আমার বুকের অনেকখানি জায়গা অবশ

করে দিল। বড় হয়ে যাওয়ার মানে আমি এখন বুঝতে পারি।

বড়দিও একদিন সকলের মতো করে বড় হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই আমার মনের জগত থেকে চির নির্বাসন ঘটে গিয়েছিল বড়দির।

আমি নিঃশব্দে কাঁদছি বুঝতে পেরে মেজদি নিচু হয়ে আমার কপালে নিজের ঠোঁট রাখলো। তারপর একটিও কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল।

ক'দিন পর একটা লোক এলো বাসে চেপে। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। কেমন যেন ফুলদানির মতোন দেখতে। ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে।

আমি বাস স্টপ থেকে একছুটে সোজা বাড়িতে। তারপর মেজদির ঘরের বারান্দায় সেখান থেকে ছোটকাকীর ঘরে, সেখান থেকে বকফুল গাছের তলায়।

মেজদি চুপ করে একঝাঁক ফুটন্ত পদ্মের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে আমি পাগলের মতোন মেজদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম।

লোকটা বাড়িতে এসে জ্যাঠামশাইকে বলল, আপনাদের মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে। বিয়ের দিন ঠিক করুন।

ছোটকাকী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরতে গিয়ে শাড়ির আঁচল পায়ে বেঁধে হোঁচট খেল। উনুনে উথলে ওঠা ভাতের দিকে তাকিয়ে জ্যেঠিমা কেঁদে ফেললেন।

মা বললেন, শিগগির চোখ মুছুন বড়দি, চোখ মুছল। জ্যাঠামশাই ঘরেব বাইরে এসে চেঁচিয়ে গৌরী গৌরী বলে ডেকে উঠলেন।

লুটানো ধুতির খস্ খস্ শব্দ ছড়িয়ে পড়ার আগেই জ্যাঠামশাইয়ের ডাক অদৃশ্য রামধনু হয়ে বাড়িটার কোণায় কোণায় অনেকক্ষণ জেগে থাকলে।

কমলকাকা পাথরের মূর্তির মতোন চুপ করে ঝিলের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। শিমূলগাছে বাসা বেধে থাকা শামকোল পাখি দু'টো বোধহয় কোথাও গিয়েছে। আজকাল তাদের দেখা যায় না।

জিরাফের গলার মতোন লম্বা বেতগাছের ঝোপে কুটার—র ..র...র..., কুটর—র...র...র... করে একটা নাম না জানা পোকা একনাগারে ডেকে চলেছে।

ঝিলের স্থিব জলে কমলকাকাব ছায়াটা থির থির করছে সোনা খোড়কে মাছের একটা ঝাঁক ঘুরে ঘুরে এসে ছায়াটাকে ছুয়ে যাচ্ছে। দূরের আকাশের নীলচে গা থেকে একটা সমাহিত বাতাসের শূন্যতাব অবয়বে সুধা শব্দটা সমস্ত চরাচবকে আবৃত্ত করে এগিয়ে আসছে—

"If you but Know how you the purpose cherish
whiles this you mock it? how, in stripping it,
you more invest it, Ebbing men indeed,
Most often do so near the bottem run

by their own fear or sloth"

কমলকাকা—

কে, চমকে পেছনে তাকালেন কমলকাকা, ও তুই—

ছোটকাকা আপনাকে খুঁজছেন।

আমাকে, চল যাচ্ছি—

ফোর্ড গাড়িখানার কাছাকাছি আসার আগেই দেখা হয়ে গেল ছোটকাকার সঙ্গে। এই যে হ্যামলেট, হেরে গেলেন তো—

কমলকাকা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন।

আপনি মশাই একটা লায়ার, আমাকে ইংরিজি কবিতা শোনাবেন বলেছিলেন, মনে আছে?

কমলকাকা কিছুই বলছেন না। আসলে ছোটকাকা কি বলতে চান, তা ধরতেই পারছেন না তিনি। চোখের কোণায় একটু লজ্জার মতোন লেগে আছে।

ছোটকাকা বললেন, আসলে বড় কত্তা আর মেজ কত্তা দুজনে মিলে আপনার মাথাটি খেয়েছেন।

কথা বলতে বলতে পকেটে হাত পুরে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন ছোটকাকা। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিজে নিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরলেন।

না। চলে না? তাহলে কি চলে জল? আমার সবকিছু চলে দেশী-বিদেশী। ছোটকাকা বললেন, আপনি নাকি গান টানও জানেন? আমাদের নাটকের দলে চলে আসুন। এবার গাজনের সময় নতুন নাটক হচ্ছে।

একটু চুপ করে থাকার পর ছোটকাকা বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো। আপনি বোবা নাকি? আমি এতক্ষণ ধরে কথা বলে যাচ্ছি, আপনি একটাও জবাব দিচ্ছেন না। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ভেতর থেকে জ্যেঠিমার গলা ভেসে এলো, টুকলি, কমলঠাকুরপো কোথায় গেল দ্যাখতো।

যান আপনার ডাক এসে গিয়েছে।

কমলকাকা বললেন, আপনি কিছু বলবেন আমাকে?

বলবো বলেই তো ডেকেছি, সিগারেট দু'বার টান দিয়ে ছোটকাকা বললেন, জানেন, আমাব কিচ্ছু ভাল লাগে না। চাকরি টাকরি ছেড়ে একদিন কোথাও চলে যাবো। কলকাতায় একটা নামকরা যাত্রাদল লোক পাঠিয়েছিল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে দিলেন ছোটকাকা—ধ্যাৎ, আপনার সঙ্গে কথা বলেও কোনও সুখ নেই। যান, ভেতরে ডাকছে আপনাকে—

দু-পা এগিয়ে আবার দাঁড়ালেন ছোটকাকা—আমি মশাই মেয়েদের ঠিক বুঝতে পারিনে। বলছিলাম, আপনি আর একবার চেষ্টা করে দেখবেন নাকি? লুডোর পার্টনার হতে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই—

মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে ঢুকলেন কমলকাকা।

মেজদির শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা সেই ফুলদানির মতোন মানুষটা সন্ধ্যের আগেই চলে গেল।

মেজদি সারাদিন ঘরে বন্ধ ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এক বুক নিশ্বাস নিয়ে বলল, বাঁচলাম বাবা, ইস্ লোকটা কি বাজে, সকালে আসার পর থেকে যেতেই চায় না।

মা বললেন, এই, ও তো ভাসুর হবে তা জানিস।

হোক্‌গে, মেজদি বলল, আগে হোক, তারপর দেখা যাবে।

বিয়ে হওয়ার অনেক আগে থেকেই মেজদি কেমন যেন বিয়ে হওয়া মেয়েদের মতোন হয়ে গেল। আজকাল এমন সব কথাবার্তা বলে, যা আগে কখনো তার মুখে শুনিনি।

ছোটকাকীর ঘরে দুজনা মিলে গুজ গুজ করে। আমি গেলেই দুজনে চুপ। কমলকাকা দিনের বেশীর ভাগ সময়েই নিজের ঝিলপাড়ে ঘরে থাকেন। আমি তাঁর কথা মতো ইংরিজি বইখানা হাতে নিয়ে যাই আর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে আসি। কমলকাকাকে ডাকতে সাহস হয় না।

মেজদির বিয়ের আগে একদিন বাবার সঙ্গে তিনজন লোক এলো। তাদের আসার কথা জ্যাঠামশাই আগে থেকেই জানতেন। বাড়িতে ঢোকার আগে লোকগুলো পুরনো ফোর্ড গাড়িখানাকে কাছ থেকে দেখার জন্যে সেখানে গেল।

কমলকাকা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। খানিকক্ষণ পর জ্যাঠামশাই বললেন, কমল, এঁদের নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসাও।

কমলকাকা বললেন, গাড়িটা সত্যিই বিক্রি করে দেবেন বড়দা?

হ্যাঁ।

রেখে দিলে হতো না। কমলকাকার গলায় প্রার্থনার দীনতা।

জ্যাঠামশাই অন্যমনস্ক গলায় বললেন, শুধু শুধু এটা রেখে লাভ কি বলো। কতোজনকে দেখিয়েছি, কেউ ঠিক করতে পারেনি। তাছাড়া গৌরীর বিয়ের ঠিক হয়েছে, কত টাকা লাগবে কিছুই জানিনে—

কমলকাকা আর কিছু বললেন না।

লোকগুলো ভেতরে যাবার পর আমি আর মেজদি গাড়িখানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। যেন আমাদের কোনও পরমাত্মীয় আমাদের ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে—মেজদি সেইরকম মুখ করে গাড়িখানার গায়ে হাত রাখলো।

বলল, এ রকম জানলে আমি বিয়েতে কিছুতেই রাজি হতাম না।

আমি বললাম, তোমার বিয়ে না হলেও বাবা গাড়িটা বিক্রি করে দিত।

নারে। তুই শুনিসনি পল্টু, সেজকাকাকে মা বলছিল, আমার বিয়ের জন্যেই গাড়িটা বিক্রি করতে হবে।

আমি বললাম, ছোটকাকা কিন্তু গাড়িটা বিক্রি করতে রাজি না।

তোকে কে বলল?

ছোটকাকী কমলকাকাকে বলছিল। আমি শুনেছি।

আর কি বলছিল রে?

মেজদির চোখে কৌতূহল। আমি বললাম, গোসাপগুলোর জন্যে ছোটকাকীর খুব ভাবনা হচ্ছে। ওরা প্রত্যেক বছর ওখানেই ডিম পাড়ে। বাচ্চা ফুটোয়। গাড়িটা না থাকলে ওরা কোথায় যাবে?

মেজদি বলল, ছোটকাকী একটা পাগল।

কেন, ছোটকাকীকে পাগল বলছো কেন?

সে তুই বুঝবিনে, মেজদি গাড়ির ওপর উঠে বসলো, উঠে আয় পল্টু। সাবধানে আসিস।

আমি গাড়ির ওপর উঠে মেজদির পাশে বসার পর সে বলল, জানিস, আমাব সেজকাকার ওপর খুব রাগ হচ্ছে। সেজকাকা না বললে গাড়িটা বাবা কিছুতেই বিক্রি করতেন না।

এই মেজদি, তোর বিয়ের পর তুই আমাদের বাড়িতে আর আসবিনে, নারে?

কে বলল, আসবো না?

বড়দি তো আসে না।

চার বছর বিয়ে হয়েছে বড়দির। তারপর থেকে চারবারের বেশী আসেনি বড়দি। এলেও থেকেছে মাত্র দু'তিন দিন।

বড়দির কথা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মেজদি অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর খাপছাড়া গলায় বলল, কক্ষনো মেয়ে হয়ে জন্মাবিনে পল্টু। মেয়েদের সব্বাই কষ্ট দেয়।

ধ্যাৎ, মার কোনও কষ্ট নেই। জ্যেঠিমারও কোন কষ্ট নেই।

আছে, তুই জানিসনে।

তুই জানিস?

মেজদি ঘাড় নাড়লো। তারপর বলল, তুই বুঝি এখন আর স্বপ্ন দেখিসনে, পল্টু?

দেখি তো।

কি স্বপ্ন দেখিসরে, আগের মতো আমার বিয়ের স্বপ্ন?

না। তাহলে?

আমি বললাম, কমলকাকার স্বপ্ন। ঝিলটার স্বপ্ন আর একদিন স্বপ্নে ছোটকাকীকেও দেখেছি কিন্তু কেন যেন সে কথাটা বলতে পারলাম না।

মেজদি বলল, তুই আজকাল ভারী মিথ্যুক হয়েছিস।

না মেজদি, সত্যি আমি একদিন স্বপ্নে দেখেছি কমলকাকা না ঝিলটার জলে—

মেজদি হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলো। তারপর ভয়ার্ত গলায় বলল,

মনে মনে তিনবার গঙ্গা জল বল্ তাহলে খারাপ স্বপ্নটা আর ফলবে না। বলেছিস?

আমি মাথা ঝাঁকালাম, বলেছি।

চল্ পল্টু, বাড়ি যাই।

আর একটু থাকি মেজদি। গাড়িটা কি ওরা আজই নিয়ে যাবে?

কি জানি—মেজদি অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর ঝিলটার মাথার ওপর আকাশে তাকিয়ে থাকলো। বলল, কমলকাকা একদিন বলেছিলেন, এই গাড়িটা আমাদের বাড়ির লক্ষ্মী।

আমি বললাম, কমলকাকা অনেক কিছু জানেন।

মেজদি গাড়ির ওপর থেকে নেমে এসে বলল, চল্ পল্টু, ছোটকাকীর কাছে যাই।

ছোটকাকী ঘরে নেই।

কে বলল তোকে?

আমি জানি, সব জান্তার মতোন আমি আগে আগে ছোটকাকীর ঘরে ঢুকলাম। সত্যিই ছোটকাকী ঘরে নেই, কি বলেছিলাম আমি—

ঘর বারান্দা রান্নাঘর, ছাদ, জ্যেঠিমার ঘর সব এক ছুটে চক্কর দিয়ে আমি আবার মেজদির কাছে ফিরে এলাম, ছোটকাকী কোথাও নেই। সব জায়গা দেখেছি।

মেজদি আমার কথা শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমি এখন ঘরে যাচ্ছি, তুই পালা পল্টু।

ওই তো ছোটকাকী—

আমার কথা শুনে মেজদি দাঁড়াল। ছোটকাকী উঠোনের পদ্ম গাছের পাশে দাঁড়িয়ে। তার মুখে বিচিত্র এক হাসি। কোথায় গিয়েছিল ছোটকাকী? মেজদি জিজ্ঞাসা করলো।

বাবানে, ছোটকাকী বলল, গোসাপগুলোর থাকার জন্যে একটা জায়গা দেখে এলাম। গাড়িখানা নিয়ে যাবার পর সাপগুলো সেখানে থাকবে।

মেজদি বলল, ওদের থাকার জায়গা ওরাই ঠিক খুঁজে নেবে। তেমাকে অতো ভাবতে হবে না।

মেজদির কথার সুরে রীতিমতো ঝাঁঝ।

ছোটকাকী মেজদির রাগ ভ্রূক্ষেপ করলো না। নিজের ঘরে গেল, বিড় বিড় করে মেজদি নিজেকে শুনিয়ে বলল, তুমি গেসাপের নাম করে কোথায় গিয়েছিলে, তা আমি জানি।

কি বললে মেজদি—?

তুই একটা স্টুপিড—মেজদি তর তর করে হেঁটে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হেঁট হয়ে মাটি থেকে একটা বকফুল তুলে নিয়ে ফুলটাকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল,

এ বাড়ির সবাই স্টুপিড। মা, বাবা, সেজকাকা, সেজকাকীমা সব্বাই। ছোটকাকাও স্টুপিড—

তুমি গুরুজনদের স্টুপিড বললে?

বেশ করেছি বলেছি। আবার বলবো। স্টুপিডদের স্টুপিড বলবো নাতো কি বলবো। আমার বিয়ে হয়ে গেলে আমি আর কক্ষণো তোদের বাড়িতে আসবো না। কে আসবে এই নোংড়া বাড়িতে।

এখন মেজদিকে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তার মুখে এই মুহূর্তে রাগ আর দুঃখ দুই-ই স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে।

আমি জানি এবার মেজদি পেছনের বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণের জন্যে একা হয়ে যাবে। আমি তার চারপাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করলেও ও আমাকে ডাকবে না, কথা বলবে না।

শীত পড়তে না পড়তে এবার ঝিলটার কি হলো কে জানে দিনরাত্তির ছলাৎ ছলাৎ করে জল ডাকতে থাকলো। রাতেও এ ডাকের বিরাম নেই।

জ্যেঠিমা পড়ন্ত বেলায় সংসারের সব কাজ মিটিয়ে নিজের ভাত বাড়তে বাড়তে মাকে শুনিয়ে বললেন, শুনেছিস তুই, ওটার কি হয়েছে বলতো? দিন নেই রাত নেই অষ্টপ্রহর ডেকে চলেছে, আমার বাপু ভয় করছে। সারাদিন ঝিলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আর গভীর রাতে মাতাল বাতাসের সাঁই সাঁই আওয়াজ।

ঝিলটা নিজেই কি ভয় পেয়েছে নাকি? কাকে ভয়, কিসের ভয়?

মেজদি একদিন বলল, দেখিস, আমাদের গাড়িটা শেষ পর্যন্ত বিক্রি হবে না। আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

মাঝে মাঝে মেজদি এইসব মন পছন্দের কথা বলে বলেই তার আঁচল ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

(১৪)

ছোটকাকীর লুডোখানা চুরি গিয়েছে অনেকদিন হলো। এখনো ছোটকাকী নিজের ঘরেই একা একা বসে থাকে। কমলকাকা দু'দিন বাড়িতে নেই। কোথায় যেন গিয়েছেন। উনি আমাদের নিজের কেউ নায়, তাও জ্যেঠিমা বললেন, কমলঠাকুরপো বাড়িতে নেই, বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে নারে সেজ।

ছোটকাকী নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে কথা শোনে তারপর একটিও কথা না বলে ঘরের ভেতরে চলে যায়। ছোট দেওরকে বলো না, মা বললেন, ওকে ক'দিনের জন্যে বাপের বাড়িতে রেখে আসুক। এখানে সারাদিন একা একা মন খারাপ করে থাকে।

জ্যোঠিমা বললেন, ও যাবে না। তুই বলে দেখ যদি রাজি হয়।

সন্ধ্যেবেলা মেজদি জিগ্যেস করল, হ্যারে পল্টু, কমলকাকা কোথায় গিয়েছেন রে?

জানিনে। কাউকে বলে যাননি কোথায় গিয়েছেন।

দূর, তুই কিচ্ছু জানিসনে। মেজদি বলল, আমার মা আর তোর মা দু'জনা মিলে যুক্তি করে কমলকাকাকে এক জায়গায় পাঠিয়েছে। সেখান থেকে কমলকাকা ছোটকাকীর জন্যে একটা জিনিস আনবে।

কি জিনিস মেজদি?

সে তোকে বলা যাবে না।

মেজদির কথা শুনে আমার খুব রাগ হয়ে গেল। মনে হলো বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় মেজদির খুব অহংকার হয়েছে। নিজেকে কি একটা ভাবছে যেন। অথচ আমাকে না হলে একদণ্ডও চলে না তার।

আমি মুখ ভার করে চলে যাচ্ছি দেখে মেজদি খপ্ করে আমার হাত ধরল, এই আণার ওপর রাগ করলি?

কমলকাকা ফিরে এলেই তুই নিজেই সবকিছু জানতে পারবি।

ব্যাস্, একটা কথাতেই আবার আমাদের দু'জনার ভাব হয়ে গেল।

রাত্তিরে বিছানায় শুনে আমি মা বাবার চাপা গলার আলোচনা শুনে ফেললাম।

বাবার গলায় যথারীতি অসন্তোষ, এটা কিন্তু তোমরা ঠিক করোনি। একটা সাধুর মন্ত্রপড়া শেকড় হাতে বাঁধলেই যদি ছেলে হতো তা'হলে কেউ আর ডাক্তারের কাছে যেত না।

মা বললেন, ওই সাধুবাবা খুব সিদ্ধ পুরুষ।

বাবা হেসে উঠেই চুপ করে গেলেন। তোমরা মেয়ে জাতটাই বড় অদ্ভুত। ছোটবৌমা যেমন আছে থাকনা, ওকে নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করলে অন্য কিছুও ঘটতে পারে। তাছাড়া এর মধ্যে কমলবাবুকে জড়ানো ঠিক হয়নি। বাবা বললেন, after all he is an outsider।

মা বললেন, ওই সাধুর খবর কমলঠাকুরপোই দিয়েছে!

কমল জিলিপি ভাজছিল, বাড়িতে পদ্মফুল লাগাচ্ছিল সব ঠিকই ছিল কিন্তু—

বাবার শেষ কথাগুলো শুনতে পেলাম না, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হল না, কমলকাকার সব কাজে বাবার অনুমোদন নেই।

কমলকাকার দু'দিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে থাকার কারণটা অবশ্য আমার জানা হয়ে গেল।

আর সেই সঙ্গে আমি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছিনে বলে নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। এখন সবে আমার ক্লাস নাইন। তারপর ক্লাস টেন। তারপর. . দূর, কলেজে যেতে এখনো আমার বহু দেরী...

হঠাৎ ভগবানের ওপর আমার খুব রাগ হয়ে গেল। কমলকাকা ভগবান মানেন না। ঠিক করেন উনি। আমিও এখন থেকে ভগবান টগবান কিচ্ছু মানবো না।

পরদিনই কমলকাকা ফিলে এলেন। আমি তখন বইখাতা হাতে স্কুলে যাচ্ছি।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসলেন, কিরে পল্টু কেমন আছিস?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। স্কুলে চলে গেলাম।

বিকেলে বাড়ি ফিরে বুঝতে পারলাম ছোটকাকীকে নিয়ে কিছু একটা হচ্ছে। মা, জ্যেঠিমা, মেজদি সবাই উঠোনে হাজির। ছোটকাকী ভিজে কাপড় পরে একটা শিলের ওপর দাঁড়িয়ে। তার সারা গা থেকে, মাথার ভিজে চুল থেকে জল ঝরছে।

এ সময় বাড়ির পুরুষরা কেউ বাড়িতে থাকে না। কমলকাকা তাঁর ঝিল পাড়ের ঘরে।

জ্যেঠিমা লাল টকটকে পাড়ের গরদ পরে আছেন। মার হাতে একটা তামার থালায় ফুলপাতা। আমাকে দেখেই জ্যেঠিমা বললেন, এই হতভাগা ছেলে, সেই কোনকালে ইস্কুলের ছুটি হয়েছে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

ঝিলের ধারে।

মা বললেন, শিগগির যা, জামাকাপড় বদলে কাচা জামা কাপড় পরে আয়। তোর জন্যে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। সব ব্যাপারটাই আমার কাছে বিস্ময়ের মনে হচ্ছিল। কি এমন ঘটলো যাতে আমাকে ছাড়া চলবে না?

আমার পেছন পেছন মেজদিও ঘরের মধ্যে এলো, এই শোন, তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

মেজদির চোখে মুখে উত্তেজনা। বলল, আমার মা তোকে যা করতে বলবে খবরদার করবি নে।

কি বলবে?

ছোটকাকীর পিঠে যা লিখতে বলবে তার চেয়ে কম করে লিখবি।

না লিখলে মা যদি আমায় মারে?

মারুক গে, একবার লেখা হয়ে গেলে কেউ আর কিচ্ছু করতে পারবে না।

মেজদি যেমন এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। আমার একখানা হাত ধরে জ্যেঠিমা ছোটকাকীর পিঠের দিকে নিয়ে গেলেন। বললেন, শোন পল্টু, তোর আঙুল দিয়ে তুই ছোটকাকীর পিঠে দুই লিখে দিবি। খবরদার আর কিছু লিখিসনে যেন।

ছোটকাকীর ভিজে শাড়ির আবরণ ভেদ করে চোখ ধাঁধানো গৌরবর্ণ সর্বাঙ্গে ফুটে বেরচ্ছে। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে আর সেই কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট যন্ত্রের মতোন দুর্বোধ্য একটা বিলাপ ধ্বনি উঠে আসছে। জ্যোঠিমা একটানে ছোটকাকীর পিঠের কাপড় সরিয়ে সম্পূর্ণ পিঠখানা আদুল করে দিতেই আমার সমগ্র চেতনা মুহূর্তের মধ্যে বোবা অন্ধ হয়ে গেল। মনে হল হৃৎপিণ্ডটা ঠিক গলার কাছে উঠে এসেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগিয়ে ফুটতে ফুটতে হঠাৎ জমাট বেঁধে গেল।

কানের পাশে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম, পল্টু লেখ, শিগগির

লেখ...মাঝের আঙুল দিয়ে দুই লিখে দে—

এই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীর আমিই একমাত্র আধীশ্বর। সমস্ত মাঠ, ঘাট, নদী, প্রান্তর নিয়ে সসাগরা ধরণী আমার পৌরুষের অহংকারের পদতলে কৃপাপ্রার্থীর মতোন নতজানু হয়ে আছে।

বিন বিন স্বরে কাঁদছে ছোটকাকী। জ্যোঠিমা আবার তাড়া দিলেন, শিগগির লেখ পল্টু, যা বলছি লিখে দে বাবা—।

আমি ছোটকাকীকে স্পর্শ করলাম। একটা পরিপূর্ণ সুঠাম অর্দ্ধ নগ্ন নারীদেহ হয়ে ছোটকাকী আমার দানের অপেক্ষায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দুই নয়, আমার মধ্যমা দিয়ে ছোটকাকীর পিঠে আমি গোটা গোটা করে পাঁচ লিখলাম, তারপর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে সেই মহামূল্য আঙুলটাকে বুকের মধ্যে করে নিয়ে এক ছুটে ঝিলের ধারে শিমুলগাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর সেই মুহূর্তে জলাভূমিটার এক কোণ থেকে কমলকাকার উন্মত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—সুধা—সুধা—সুধা—

Tell me where is fancy bred
or in the heart, or in the head;
How begot, how nourished ?
It is engender'd in the eyes,
with gazing fed, and fancy dies,
in the evadle where it lies,

আহ, কি আশ্চর্য, আজ কমলকাকাকে আমার একটুও অচেনা লাগছে না। উনি বনবাদাড় মাড়িয়ে মত্ত হাতির মতোন ছুটছেন। আমার কাছে অর্থহীন একটা মাতাল বাতাসের মতোন তাঁর মুখ থেকে নির্গত শব্দগুলো প্রজাপতির ঝাঁক হয়েই তক্ষুণি আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

কমলকাকা—আমি এখানে—এ—এ—এ—

আমি প্রাণপণে চিৎকার করে তাঁকে ডাকলাম, কিন্তু আমার গলা থেকে একটিও শব্দ বেরলো না।

কমলকাকা—আ—আ—, আজ আমিও নিজের জন্যে একটা গোটা পৃথিবীকে আমার আঙুলের ডগায় পেয়ে গেছি। আমার ওই আঙুলটা আমি কক্ষণো কাউকে ছুঁতে দেব না। কেউ যদি জোর করে ছোঁয়, তাহলে পাথর দিয়ে মেরে আঙুলটাকে আমি থেঁতলে দেবো।

একি—। একি করেছিস আঙুলটাকে? ইস্ রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে—, মেজদি রাত্তিরে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওমা—মা, শিগগির—

আমি মেজদির মুখ চেপে ধরলাম।

মেজদি গর গর করতে থাকলো. তুই না বললেও আমি জানি এটা কার

কাজ। ওপরে ভালো মানুষ সেজে থাকে আসলে এক নম্বরের হিংসুটে...আমি বাবাকে বলে কালই ওকে তাড়াবো—

মেজদি রাগ করতে পারে না বলে হঠাৎ কেঁদে ফেলল। বুঝে উঠতে পারছিল না, আমার থেঁতলানো আঙুলটা নিয়ে কি করবে। স্বদেশ ডাক্তারকে এতো রাত্তিরে তার ডিসপেন্সরীতে পাওয়া যাবে না। বাবার দাড়ি কামানোর বাক্সোটা থেকে ডেটলের শিশিটা এনে আমার আঙুলে উপুড় করে ঢেলে দিল। তারপর আমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলো। শোবার আগে বলল, রাত্তিরে তোর ঠিক জ্বর আসবে।

(১৫)

মেজদির বিয়ের বাজার কবা শুরু হয়েছে। গহনা কেনা হবে কলকাতার বড় গহনার দোকান থেকে। বাবা আর জেঠিমা যাবেন গহনা কিনতে।

জ্যাঠামশাই একদিন ছোটকাকাকে ডেকে বললেন, নেমন্তন্নের ফর্দটা তৈরী করে ফেল অজয়। কোনো আত্মীয়-স্বজন যেন বাদ না পড়ে।

ছোটকাকা বললেন, বিয়ের এখনও পাক্কা দু'মাস দেরি, এখনি লিস্ট করে কি হবে বড়দা?

জ্যাঠামশাই বললেন, দূরের আত্মীয়দের আগাম খবর না দিলে অনেকে আসতে পারবে না। তাছাড়া কত কাজ বাকি রয়েছে এখনও। জগন্নাথকে খবর দিও, বাড়ি ঘর যেন রঙ করে দিয়ে যায়। বাবা ঘরের মধ্যে থেকে কাকা আর জ্যাঠামশাইয়ের কথোপকথন শুনে বেরিয়ে এলেন, আপনি শুধু শুধু চিন্তা করবেন না। আমরা আছি, সব কাজ সময় মতো হয়ে যাবে।

মেজদির বিয়ে হয়ে চলে গেলে এ সংসারে সবচেয়ে বেশী মন খারাপ হবে ছোটকাকার। এখন থেকেই মনমরা হয়ে আছেন, দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে যাবে।

ক'দিন পর একদিন সকালে অফিস যাবার আগে ছোটকাকা বাইরের দরজা থেকে কমলকাকাকে ডাকলেন, এইযে কমলবাবু, শুনুন।

বলুন—কমলকাকা সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

না মশাই, আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় আমার চেয়ে কাজের লোক, কিন্তু না ভুল।

কমলকাকা নিরুত্তর।

গানটান কেমন চলছে?

গান আমি জানিনে।

কবিতা, মানে ইংবিজি কবিতাব ভূত আপনার মাথা থেকে নেমেছে, না এখনও...। দূব মশাই, মেয়েদের মতোন চুপ করে থাকেন কেন?

কমলকাকা বললেন, ইংরিজি কবিতাও আমি জানিনে। শুধু দু-এক লাইন—

আরে মশাই বড়বাবু, মেজবাবু আপনার ওই দু'লাইন শুনেই তো কাৎ, ছাড়ুন এ কথা, লুডো খেলা তাহলে বন্ধই হয়ে গেল?

ছোটকাকা ব্যাগ থেকে মশলার কৌটো বার করে তা থেকে মশলা নিয়ে মুখে ফেললেন, থাক্ থাক্ আমার সব কথার উত্তর না দিলেও চলবে।

একটু থেমে ছোটকাকা বললেন, মিঃ হ্যামলেট, আমার একটা কাজ করে দেবেন?

কি কাজ বলুন?

আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি যেতে চাচ্ছে, আপনাকে একটু পৌঁছে দিতে হবে। কি পারবেন না?

কমলকাকা মাথা ঝাঁকালেন।

থ্যাংকু, ছোটকাকা একখানা একশো টাকার নোট হাতে নিয়ে বললেন, এটা রাখুন, রাস্তার খরচা লাগবে।

কবে যাবেন ছোটবৌদি?

জানিনে। অতোশত জিগ্যেস করার সময় নেই আমার, কাল নতুন বইয়ের রিহার্সাল শুরু হবে। আমার মশাই যাকে বলে মরার ফুরসৎ নেই। তাহলে ওই কথাই থাকলো, চলি, আপনি ওকে পৌঁছে দিচ্ছেন।

ছোটকাকা দশ পা গিয়ে দাঁড়ালেন, হ্যাঁ, রাস্তায় কষ্ট করার দরকার নেই। দরকার হলে আরও টাকা নিয়ে নেবেন।

কমলকাকাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

একশো টাকার নোটখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। যতক্ষণ না ছোটকাকী পেছন থেকে ডেকে বলল, শুনছেন, আমি আজই যাবো, আপনি তৈরি হয়ে আসুন।

(১৬)

মেজদি বলল, এই তুই ঠিক শুনেছিস?

হ্যাঁ।

ছোটকাকী কমলকাকার সঙ্গে বাপের বাড়ি যাবে?

ছোটকাকা একশো টাকা কমলকাকাকে খরচের জন্যেও দিয়েছেন।

আমার কথাটা শোনার পর মেজদির মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলো না। তারপর হিস হিস করে বলল, বাসটার ঠিক অ্যাকসিডেন্ট হবে, হবে, হবে।

ছোটকাকী আর কমলকাকা চলে যাবার পর মেজদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। আমি বাস স্ট্যান্ড অবধি সঙ্গে গিয়েছিলাম।

ছোটকাকীর জামা কাপড় ভর্তি সুটকেশটা কমলকাকার হাতে।

আগে আগে হাঁটছিলেন। সারা রাস্তা একটা কথাও বলেননি।

যাবার আগে জ্যাঠামশাই ছোটকাকীর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি চলে এসো। এ বাড়িতেই তোমার সব কিছু পড়ে থাকলো। আমার বয়স হয়েছে, আমি কতদিক আগলাবো বলো। জ্যাঠামশাইকে প্রমাণ করে ওঠার পর দেখলাম ছোটকাকীর দু'চোখ চিক্ চিক্ করছে।

ঝিলটাকে একপাশে রেখে, গাজন তলার মাঠ ছাড়িয়ে পিচ রাস্তার মোড়ে এসে বাসের জন্যে দাঁড়ালাম আমরা। একটু পরে বাস এলো। বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়। ছেলেরা শুধু দাঁড়িয়ে। মেয়েদের অনেক সিট খালি। বাস না ছেড়ে যাওয়া অবধি বাসের জানলা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো ছোটকাকী।

মেয়েদের সিটে অনেক জায়গা খালি থাকা সত্ত্বেও কমলকাকা সুটকেশটা নিজের পায়ের কাছে রেখে দিয়েই থাকলেন। একহাতে বাসের রড ধরা। আনন্দ-বেদনা কিছুই নেই তাঁর মুখে। আমার মনে হচ্ছিল কোনো কারণে কমলকাকা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছেন। কিসের ভয় কে জানে।

দুপুরে খাবার পর মেজদি বলল, আজ কি বার রে পল্টু?

বুধবার।

বুধবার কিছু বললে ফলে না, তাই না?

কি বলেছ তুমি?

ওই যে তখন বললাম বাসের অ্যাকসিডেন্ট হবে। তুই একটা হাঁদা, কিছুই মনে রাখতে পারিস নে।

তুমি তো মনে মনে বলেছিলে, আমি শুনিনি।

যা করেই বলি, মেজদি বলল, শনি মঙ্গলবার হলে ঠিক ফলে যেত। আয়,আমার সঙ্গে আয় পল্টু।

আজ ঝিলপাড়টা একদম অন্যরকম। প্রাণশূন্য।

এই জলাভূমিটারও একটা মা আছে। বলেছিলেন কমলকাকা। তাহলে এর জন্ম মৃত্যুও আছে। আনন্দ বেদনাবোধও আছে।

মেজদি আর আমি ঝিলটার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গান গাইছিলাম। হঠাৎ গান থামিয়ে মেজদি বলল, ছোটকাকী ঠিক বলেরে, গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলে গোসাপগুলো কোথায় থাকবে?

তুমি বুঝি এখন ছোটকাকীর কথা ভাবছো?

হ্যাঁ, ছোটকাকীকে আমাদের বাড়ির কেউ ভালবাসে না।

মানুষের মন কখন যে কাকে টানে তা নিজেও বুঝতে পারে না। মেজদি নিজেও আগে জানতো না তার মনে ছোটকাকীর জন্যে একটা টানের জায়গা আছে।

(১৭)

বাসখানা চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। যাত্রীরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, কি হলো ড্রাইভার, বাস এখানে থামলে কেন?

চারপাশে বড় বড় অজস্র গাছপালা। খানিকটা সমতল ভূমি। কাছেই কোথাও বোধহয় একটা নদী আছে। তার কল কল চলার শব্দ। এক ঝাঁক টিয়া আকাশে পাক খাচ্ছে।

ড্রাইভার বাস থেকে নেমে গেল। তারপর কিছুক্ষণ ধরে ইঞ্জিন ঘাটাঘাটি করার পর বলল, বাসের ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে। এক ঘণ্টার আগে বাস যাবে না। তার কথা শেষ হতে না হতে সমস্ত যাত্রী হুড়মুড়িয়ে বাস থেকে নেমে পড়লো। সকলের শেষে নামলেন কমলকাকা।

এপাশ ওপাশ তাকিয়ে একটা ছাতার মতোন গাছের ছায়ায় সুমিত্রাকে বসে থাকতে দেখলেন।

কমল...কমল—কমল—

আঃ কি আশ্চর্য, সমিত্রা হাত তুলে তাকেই ডাকছে। তাড়াতাড়ি পা চলিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কমলকাকা। সুমিত্রা বলল, এইখানে বসো কমল। আঃ কী সুন্দর ছায়া, কী মিষ্টি বাতাস।

কমলকাকা তার মুখোমুখি ঘাসের গালিচায় বসতে বসতে বললেন, এ জায়গাটা তোমার ভালো লাগছে সুমিত্রা? জানো, কাছাকাছি নিশ্চয় একটা নদী আছে তা না হলে বাতাস এতো মিষ্টি হতো না।

এই তুমি আমায় সুমিত্রা বললে কেন?

তুমি তো সুমিত্রাই।

না, আমি তোমার ছোট বৌদি।

বেশ, তাহলে তাই বলবো।

অমনি রাগ হয়ে গেল, ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে তাই বলো।

কথার পর ঘাসের ওপর হাত বুলোতে থাকলো সুমিত্রা।

তার মাথায় তখন আর ঘোমটা নেই। চুল খুলে পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। পাতার ফাঁক দিয়ে কপালে গালে রোদ্দুর এসে পড়েছে।

এই—

বলো।

অমন মুখ গোমড়া করে বসে আছো কেন? হাসতে জানো না বুঝি—

কমলকাকা বললেন, তুমি হাসো, আমি দেখি।

কথার পর মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন।

এতটা রাস্তা বাসে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে শরীর ক্লান্ত।

আচ্ছা, তুমি না একটা কি—

কমলকাকা ঘুরে তাকালেন, কেন কি করেছি?

বোকার মতোন বাসে দাঁড়িয়েছিলে কেন। আমার পাশে তো অনেক জায়গা খালি পড়েছিল।

খালি পড়েছিল বুঝি, কমলকাকা বললেন, খেয়াল করিনি। কই তুমিও তো আমায় ডাকোনি?

মেয়েরা ডাকে না।

ডাকে না বুঝি, কি জানি—

মেয়েদের ডাকটাও চেয়ে নিতে হয়। সুমিত্রা বলল।

শিখে রাখলাম।

সুমিত্রা তার কাঁধ থেকে খসে পড়া আঁচল সন্তপর্ণে আবার তুলে দিল। বলল, ভাগ্যিস বাসটা খারাপ হয়ে গেল। না হলে এখানে কোনদিন আমাদের বসাই হতো না।

কমলকাকা বললেন, পৃথিবীর কতো জায়গাতেই এরকম হাজার হাজার ছায়া মেলে রাখা গাছ আছে। তার তলাতেও আমাদের কোনদিন বসা হবে না কিন্তু।

এই না, তুমি এখানে এইসব কথা বললে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। সুমিত্রার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে তির্যক হয়ে থাকলো। দৃষ্টিতে কপট তিরস্কার।

সরি—, কমলকাকা দোষ স্বীকার করলেন।

এখন কি ইচ্ছে করছে বলতো? সুমিত্রার প্রশ্ন।

কী?

বলতে পারলে না তো—

তুমিই বলো।

একটা ইংরিজি কবিতার আবৃত্তি শুনতে ইচ্ছে করছে।

হ্যামলেট শুনবে?

কমলকাকা নড়েচড়ে বসলেন।

যা তোমার ইচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন দুঃখ থাকলে চলবে না।

বেশ থাকবে না।

কমলকাকা কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন তারপর বলতে শুরু করলেন—

Give thy thoughts no tougue,
nor any unproportioned thought his act.
Be then familiar, but by no means vulgar,
Those friends thou hast
and them adoption tried,
Grapple their to thy soul with
hopes of steel

আবৃত্তি শেষ করে কমলকাকা বললেন, সুমিত্রা, লুডো খেলবে?

লুডো, সুমিত্রার চেখে ছায়া পড়লো, আমার লুডো তো চুরি হয়ে গিয়েছে।

কমলকাকা বুকের মধ্যে হৃত পুরে জামার ভেতর থেকে একখানা লুডো বার করলেন। তারপর লুডোখানা ঘাসের ওপর পেতে দিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে খেলায় কিন্তু কোন ঘুটি কাটা নেই।

বারে, সুমিত্রার ঠোঁট বেঁকালো, ঘুটি কাটা না থাকল লুডো খেলা হয় নাকি। ভীতু কোথাকার—

আমায় ভীতু বললে?

শুধু ভীতু নয়, চোরও। আমার লুডোটা তুমিই চুরি করেছ।

কমলকাকা হাসছিলেন। সেই ভাবেই বললেন, আমি শুধু শুধু তোমার লুডো চুরি করতে যাবো কেন? তাছাড়া আমি যা চাই, তা চুবি না করেই পেয়ে গেছি।

কি পেয়েছ তুমি?

জানো না আমি কি পেয়েছি?

ব্যস্ত হয়ে সুমিত্রা বলল, পাওয়ার না পাওয়ার হিসেব এখন থাক। বাসটা এখানে মাত্র এক ঘণ্টা থাকবে। তাব মধ্যেই আমাদের খেলা শেষ করতে হবে। দাও, তাড়াতাড়ি চাল দাও কমল।

কমলকাকা হাতে ছক্কার কৌটো নিয়ে নাড়িযে বললেন, ছয়,—

সুমিত্রা হাতে ছক্কাটা চাপা দিয়ে বলল, তোমার দানে শূণ্য উঠেছে কমল, শূন্য—

হঠাৎ বাসখানা চলতে চলতে বাস্তার মধ্যে কিছুতে একটা ধাক্কা খেয়ে একপাশে কাত হয়ে পরক্ষণে সোজা হলো—

* * * *

এতক্ষণে স্বপ্নটা থেকে চমকে জেগে উঠলো ছোটকাকী। এর আগে বাস কোথাও থামেনি। জেগে জেগে নিজের মনের অতলে স্বপ্নের জগতে চাল দিয়েছিল ছোটকাকী। ঘোর কাটার পব চোখ তুলে দেখলো, একটু দূরে গাড়ির ছাদের হ্যান্ডেল ধবে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কমলকাকা। তাঁর দৃষ্টি গভীব এক বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

এই যে, শুনুন এদিকে—

ছোটকাকীর ডাক শুনে কমলকাকা যাত্রীদেব ভিড ঠেলে এগিয়ে এলেন, কিছু বলবেন?

আমি এবার একলাই যেতে পাববো, আপনি ফিরে যেতে পারেন। এত কষ্ট কবে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না।

আমার বাসে দাঁড়িযে যেতে কোনও কষ্ট হচ্ছে না—

কমলকাকা আবার ফিরে গিয়ে আগের জায়গায় দাঁড়ালেন।

* * * *

বাড়ির দরজা খুলে ছোটকাকীর বাবা বললেন, একি তুই?

আয় আয়, জামাই আসেনি?

না, তার সময় কোথায়?

ছোটকাকী বাবার পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। কার সঙ্গে এসেছিল, একলা?

না, কমলবাবুর সঙ্গে।

ছোটকাকীর বাবা দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন কমলকাকাকে। তাঁর হাতে সুটকেশ।

আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আসুন ভেতরে আসুন। আমি তাহলে চলি ছোট বৌদি?

ঘরের ভেতর থেকে ছোটকাকীর সিরাসক্ত কণ্ঠের একটি মাত্র শব্দ ভেসে এলো—আচ্ছা।

না আপনি যাবেন না, ছোটকাকীর বাবা বললেন, এত দূরের রাস্তা এসেছেন, বসুন বিশ্রাম করুন, তারপর যাবেন।

বাইরের ঘরে একটা কাঠের চেয়ারে বসার পর দেয়ালে টাঙানো একখানা ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন কমলকাকা।

ছোটকাকীর বিয়ের আগের কিশোরী বয়সের ছবি। মুখে হাসি। বুকের দু'পাশে লেপটে থাকা বেনুনী। কপালের ওপর উড়ে আসা খুচরো চুল। চোখের দৃষ্টিতে আকাশের অসীমতা।

আপনার চা—

কমলকাকা মুখ ফেরালেন, ছোড়দাকে কিছু বলতে হবে?

বলবেন, ফেরার সময় আমি অন্য কারুর সঙ্গে ফিরবো, আপনাকে আসতে হবে না।

আমি নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসিনি।

ইচ্ছে না থাকলে হাত পেতে টাকাটা নিয়েছিলেন কেন?

কমলকাকা হাতের কাপটা নামিয়ে রাখলেন। কিছু বললেন না।

আমার সব কিছুতেই আপনার মাথা ব্যথা কেন? আপনি চান না আমি আমার মতো করে বাঁচি।

আমি কিন্তু আপনার কোনও ব্যাপারে—

থামুন। সাধুর আশ্রম থেকে মাদুলী আনার জন্যে আমি বলেছিলাম? বলুন বলেছিলাম?

বড়বৌদি আর সেজবৌদি দু'জনা মিলে আমার জোর করে পাঠিয়েছিলেন। কমলকাকা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলেন। ছোটকাকী হিস্ হিস্ করে বললেন,যাবার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নি কেন, আমি কি চাই?

এক মুহূর্ত থতমতো হয়ে বসে থাকলেন কমলকাকা, তারপর বললেন, আমি ভেবেছিলাম ওটা পরলে—

ওই মাদুলিটা পরলে আমার পাঁচটা বাচ্চা হবে আর অমনি আপনার ছোড়দার সুখ উথলে উঠবে। আপনি কতটুকু চেনেন আপনার ছোড়দাকে?

দেয়ালে ফটোয় সুমিত্রা এখন অতলান্ত সমুদ্রের চেয়েও অন্তহীন। তাকে আর বোঝা যাচ্ছে না।

কমলকাকা খুব ধীর গলায় বললেন, আপনি কি চাননা, আমি আর ওই বাড়িতে থাকি—

আপনি বুঝতে পারেন না আমি কি চাই?

কমলকাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দু'জনা মুখোমুখি কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। কমলকাকার ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠলো বিড় বিড় করে কয়েকবার সুধা শব্দটা উচ্চারণ করলেন। কিন্তু কথাটা গলার কাছে এসে থকথকে কান্নার মতোন হয়ে জমে থাকলো।

ছোটকাকী বলল, বসুন, মিষ্টিগুলো খেয়ে নিন।

দুপুরে এখানে খেয়ে তবে যাবেন। আমি রান্না করবো। কথাটা শেষ করে ছোটকাকী ধীর পায়ে বাইরে চলে গেল। কমলকাকার মনে হলো, দেয়ালে সুমিত্রার ছবি আবার আকাশ হয়ে হাসছে।

(১৮)

বাড়ির উঠোনে একসঙ্গে অনেক পদ্ম ফুটে সমস্ত উঠোনটা আলো হয়ে আছে। যার ভালবাসার ফুল সেই নেই। পনেরো দিন হল ছোটকাকী বাপের বাড়ি গিয়েছে। এখনও ফেরেননি। সবাই ভেবেছিল দু'দিন পরেই ফিরে আসবে।

বাবা একদিন মাকে বললেন, ছোটবৌমা তো অনেকদিন হল গিয়েছেন—

মা বললেন, তোমার ভাইকে বলো না গিয়ে নিয়ে আসবে। আচ্ছা বলবো— বাবা আর দ্বিতীয় কথা বললেন না। ছোটকাকী না থাকার জন্যে তার ঘরটা সারাদিন ফাঁকা পড়ে থাকে। আমার খুব মনে পড়ে তার কথা। মা, জ্যেঠিমা কারুর মতোন নয় ছোটকাকী। তার নিজের মতোন। একদম নিজস্ব একটা অহংকার আছে ছোটকাকীর। হেরে যাওয়ার অহংকার।

মেজদি একদিন বলল, পল্টু, একটা জিনিস দেখেছিস?

কি জিনিস?

ছোটকাকা আর আগের মতো নেই।

ছোটকাকার কি হয়েছে মেজদি?

তুই একটা স্টুপিড, কাল রাতে আমি ছোটকাকার মুখে মদের গন্ধ পেয়েছি।

সত্যি বলছিস মেজদি?

যারা মদ খায়, তারা খুব খারাপ লোক, নয় তাদের কোনো দুঃখ থাকে।

ছোটকাকার কিসের দুঃখরে মেজদি?

জানিনে। তুই যা, তোর ইস্কুলের সময় হয়ে গিয়েছে।

বইখাতা হাতে নিয়ে আমি স্কুলে যাবার সময় ঝিলটার পাশে দাঁড়ালাম। কমলকাকা তাঁর ঘরেই আছেন। একটা মাছরাঙা পাখি চালায় বসে ধ্যান করছে। তার চোখ বোজা।

আর কান কমলকাকার গলার স্বর শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকলো। আশ্চর্য এক নিঃশব্দময়তায় বোবা হয়ে আছে শন ছাওয়া ঘরখানা। যেতে যেতে আমি আবার দাঁড়ালাম। শামকোলে পাখি দু'টো তাদের পুরনো বাসায় আবার ফিরে এসেছে। ঢোলকলপির ঝোপে একটা সর সর শব্দ উঠলো। ডালপালাগুলো একবার দুলে উঠেই থেমে গেল। একটা বড় মাগুর ডাঙায় উঠেছিল। এখন কোনও জন্তুর তাড়া খেয়ে জলে লাফিয়ে পড়ার পর ঝপ্ করে একটা শব্দ উঠেই মিলিয়ে গেল।

ছোটকাকা অনেক রাতত্তিরে বাড়ি ফিরলেন। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে গলা তুলে বললেন, রাত্তিরে আমি কিছু খাবো না বৌদি, খেয়ে এসেছি।

আজকাল কেন যেন বেশিরভাগ দিনই ছোটকাকা বাইরে থেকে খেয়ে আসেন।

বকফুল গাছের নিচ থেকে জ্যাঠামশাই ঘরে ঢোকার পর ছোটকাকাকে দরজা বন্ধ করতে দেখলেন। পেছনের বারান্দা থেকে ঠিক সেই সময় মেজদি পল্টু পল্টু বলে আমার নাম ধরে ডেকে উঠলো।

আমার সামনে বই-এর খোলা পাতা। মন অন্য কোথাও। মেজদি বলেছিল ছোটকাকা মদ খান। আজও কি ছোটকাকা মদ খেয়েছেন? বাবার ফেরার সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও ফেরেননি। তাঁর চেয়ারে একখানা পাতা খোলা বই উল্টো করে রাখা আছে।

বাবার নাম সুজয়। ছোটকাকার নাম অজয়। ঠাকুমা তিন ছেলের মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন। কেন যেন জ্যাঠামশাইয়ের ঠাকুমার দেওয়া নামটা এখন নেই।

দরজা বন্ধ করার পর দু'মিনিটে পুরো ছোটকাকা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর অফিসের ব্যাগটা বিছানার ওপর তুলে নিলেন।

পাট পাট নিভাজ বিছনায় একটা শূন্যতার ভয়ংকর আহ্বানের দিক থেকে বোবা চোখ দু'টো সরিয়ে নেবার পর ছোটকাকা ব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে সুদৃশ্য মোড়কওয়ালা একটা বোতল তুলে আনলেন। তারপর গ্লাসের খোজে এপাশ ওপাশ তাকালেন। এ ঘরে আর একজন কেউ থাকতো, তার সঙ্গে তাঁর মনের

সম্পর্ক নিবিড় না হলেও তার উপস্থিতির উত্তাপ এখন না থাকায় তাঁর বুকের মধ্যে একটা ছন্দ পতনের কষ্ট হচ্ছে।

দূর—, গ্লাসে পানীয় ঢেলে তাতে চুমুক দিয়ে আগের কথাটাকেই উচ্চারণ করলেন ছোটকাকা, দূর—

একটু একটু করে ছোটকাকার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে প্রার্থিত আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে ওঠার আগেই ভিজে বাতাসের ছলছলানি সব আগুন নিভিয়ে সমস্ত আয়োজনকেই আকর্ষণহীন করে তুলল।

ছোটকাকা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অফিসের ব্যাগটা আবার খুললেন। তাঁর একখানা হাত একটা লুডো আর ছক সুদ্ধ ঘুটি তুলে আমার আগের মুহূর্তে একটু যেন কেঁপে গেল—এই ঘরেই আর একজন ছিল যে বাচ্চাদের মতোন দিনরাত্তির লুডো নিয়ে বসে থাকতো। কে সে...? কে? আহ্ নামটা কিছুতেই মনে আসছে না। মাথাটা...দূর...শূন্য পড়েছে...।

ছয়...ছয়...ছয়...আবার চাল দিলেন ছোটকাকা.....। আবার ঘুটিটা লুডোর ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে শূন্য হয়ে থেমে গেল।...খ্যাপা পশুর মতোন এক হাতের থাবায় মদের বোতলটা তুলে নিয়ে মুখের ওপর উপুর করে ধরলেন। পরদিন সকালে মেজদি চায়ের কাপ হাতে ছোটকাকার ঘরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল। মেঝের ওপর শাল রেখে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছেন ছোটকাকা। তাঁর চারপাশে লুডোর ছেঁড়া অংশগুলো ছড়িয়ে আছে। মাথার পেছনে হুইস্কির খালি বোতলটা গড়াচ্ছে। মেজদির মনে হল ঘুমোনোর আগে কেঁদেছিলেন ছোটকাকা। চোখের কোলে শুকনো জলের দাগ।

(১৯)

একদিন কি হলো কে জানে পদ্মগুলো সব শুকিয়ে গেল। কমলকাকা নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, গাছে পোকা লেগেছে। ওষুধ দিতে হবে।

ওষুধ, জ্যেঠিমা হেসে ফেললেন, কমল ঠাকুরপো গাছকে ওষুধ খাওয়ানোর সময় নেই এখন। যার গাছ সে বাপের বাড়ি থেকে আসুক, তখন গাছ ওষুধ খাবে।

মেজদির বিয়ের দিন তর তর করে এগিয়ে আসছে। সারা বাড়ি জুড়ে এখন ব্যস্ততা। বক্ ফুল গাছটার ডালপালা দেখা যাচ্ছে না। শুধু ফুল।

বড়দা, কমলকাকা জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

কি কমল?

পদ্ম গাছগুলো শুকিয়ে গিয়েছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, ওষুধ দিলে আবার ফুল—

তোমাকে কি যেন একটা দরকারি কথা বলবো ভাবছিলাম,

জ্যাঠামশাইয়ের কপালে ভাঁজ পড়লো, হ্যাঁ মনে পড়েছে। ছোটবৌমাকে তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

আচ্ছা—

কবে যাবে ভাবছো তুমি?

যেদিন আপনি বলবেন।

ঠিক আছে পরে বলছি—

কমলকাকা সরে এলেন নিঃশব্দে।

আমার বার বার ছোটকাকীর কথা মনে হচ্ছে। আহ্ ছোটকাকী থাকলে পদ্ম গাছগুলোকে মরতে দিত না কিছুতেই। চলে আসছে না কেন ছোটকাকী?

একদিন মেজদি বলল, এই পল্টু শুনেছিস, ছোটকাকা আর কোন দিন নাটক করবে না।

কে বলল?

কে আবার বলবে, ছোটকাকাই বলেছে।

গাজনের মেলায় নাটক হবে অথচ সে নাটকে ছোটকাকা থাকবে না একথা আমি ভাবতেই পারিনে। তাছাড়া ছোটকাকা ছাড়া মেয়েদের মেন রোলে কে পার্ট করবে?

মেজদি বলল, তোর ভাবনা দেখে মনে হচ্ছে নাটকের দলটা তোরই—

আমি বললাম, ছোটকাকা না থাকলে আমি নাটক দেখতে যাবো না।

মেজদি বলল, ক্লাবের ছেলেরা কমলকাকার কাছেও গিয়েছিল।

তাই বুঝি, কমলকাকা কি বলল?

রাজি হয়নি। কমলকাকা বলেছে বাংলা নাটক দেখলে তাঁর হাসি পায়।

ছোটকাকীর এখনো না ফিরে আসা, ছোটকাকার হঠাৎ নাটক ছেড়ে দেওয়া, পদ্ম গাছগুলোর রাতারাতি শুকিয়ে যাওয়া—সব মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছিল আমাদের বাড়িটার কিছু একটা হয়েছে।

তিন-চারদিন পর একদিন সকালে ইস্কুল যাবার সময় বাসস্ট্যান্ডের রাস্তায় একটা দৃশ্য দেখে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বাস থেকে নেমে সুটকেশ হাতে কমলকাকা হনহনিয়ে এগিয়ে আসছিল। তাঁর অনেক পেছনে ছোটকাকী।

* * * *

পরদিন সকালে বাড়ির বাইরে এসে আমার বুকের মধ্যেটা ধ্বক্ করে উঠলো—আমাদের পুরনো গাড়িখানা নেই। তার বদলে ফাঁকা একটা শূন্যতা সমস্ত জায়গাটাকে গ্রাস করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সমস্ত বুক জুড়ে একটা দুর্বোধ্য অভিমান কান্নাব

সমুদ্র হয়ে উথলে ওঠার আগেই জ্যাঠামশাই আমায় ডাকলেন, পল্টু শুনে যাও, আমার কাছে এসো।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর গায়ে ঠাকুরদাদার শালখানা জড়ানো।

কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর পর জ্যাঠামশাই আমার পিঠে হাত রাখলন। গাড়িখানার জন্য তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না? আমিও চেয়েছিলাম গাড়িখানা থাকুক। তারপর ভেবে দেখলাম ওটা পড়ে থাকতে থাকতে একদিন সত্যিই আবর্জনা হয়ে যাবে। তাছাড়া তোমার মেজদির বিয়ের জন্যেও—

জ্যাঠামশাই আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন—। আহ্ আমার বুকের মধ্যে কি রকম যেন কষ্ট হচ্ছিল একটা। আগের কথার রেশ টেনে উনি আবার বললেন, তোমার বাবা বলছিল শহরের ধনী লোকরা অনেক টাকা দিয়ে পুরনো গাড়ি কেনে তাই দিয়ে রেস খেলে। তোমার ঠাকুরদাদা কিন্তু কখনো ভাবেননি, তাঁর এত সখের ফোর্ড গাড়ি দৌড়ে ছুটবে। তোমার ঠাকুরদাদা সব রকম বাজির খেলাকে ঘেন্না করতেন। অথচ আমি তার ছেলে হয়েও—

জ্যাঠামশাই মুখের কথাটা শেষ করতে পারলেন না। ফুল লতাপাতার নক্সা দেওয়া শালখানা তাঁর সর্বাঙ্গ আবৃত করে থাকলেও জ্যাঠামশাই-এর হৃদপিণ্ড থেকে যে রক্ত স্ফরিত হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছিলাম।

এ সংসারের ভাগ্যবিধাতা বলে যে মানুষটাকে আমরা জানতাম তাঁর ভাঙাচোরা মুখে এবং বিষণ্ণ চোখে পরাজয়ের গ্লানি আর লজ্জা। ছোটকাকীর হারেরও যে আহংকারটুকু আছে জ্যাঠামশাই-এর তাও নেই।

মেজদি—মেজদি—মেজদি—শিগগির বাইরে এসো। আমার আকুল ডাক শোনার পরেও মেজদি একচুল নড়লো না। পেছনের বারান্দায় তার নির্দিষ্ট জায়গায় যেমন ছিল, তেমনিই বসে থাকলো।

গাড়িটা নেই মেজদি—

জানি—, মেজদি চোখ তুলল না।

তুমি জানো?

কাল রাত্তিরে তুই যখন ঘুমোচ্ছিলি তখন আর একটা মোটরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেধে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

থুঃ—হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল আমার। তোমার ছোটকাকার মতোন একটা বদমাস লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে—হবে—হবে।

সেখান থেকে আবার ছুটে আমি কমলকাকার ঘরেব বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম—। খুব আস্তে করে কমলকাকা গান গাইছেন—

"আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাওকি"—

কমলকাকার গানের শব্দ ছাপিয়ে একটা শাড়ির খস্ খস্ নিঃশব্দ প্রায় একটা হাঁটাচলা এবং চুড়ির মৃদু ঠুনঠুন আমার কানে ভেসে এলো।

কমলকাকা তন্ময় হয়ে তাঁর সুধাকে গান শোনাচ্ছেন।

সেখান থেকে পা টিপে টিপে সরে এসে পাড়ে বসে ঝিলের জলে পা ডুবিয়ে দিলাম। হাত দুটো দিয়ে জল ছুঁয়ে থাকলাম। অনেকক্ষণ।

আমার পায়ের তলায় জলের সুরসুরি। হাতের স্পর্শে মধ্যে দিয়ে ঝিলটা আমার শরীরে উঠে আসছে। আমার শিরা উপশিরায় এখন রক্তের বদলে ঝিলের জল প্রবাহিত হচ্ছে, আঃ—

সোনাটুসি মাছের ঝাঁক এখন আমার পায়ের ডুবন্ত অংশের সঙ্গে খেলা শুরু করেছে। আমি আর মানুষ নই। মানুষ হতেও চাইনে। এরপরের জন্মে আমি যেন সোনাটুসি মাছ হয়ে জন্মাই।

একপাল বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে একটা গিন্নী গোসাপ একটু দূর থেকে আমাকে দেখছে। তার দুচোখের মণিতে ঘৃণা। তাকে আর তার বাচ্চাদের যারা আশ্রয়চ্যুত করেছে আমি তাদেরই একজন।

নারে ভাই গোসাপ—আমি এখন আর মানুষ নেই। মানুষ থেকে ঝিল হয়ে গেছি। বিশ্বাস না হয় আমার শরীরে দংশন করলেই বুঝতে পারবি রক্তের বদলে আমার শরীরে এখন ঝিলের জল বইছে।

(২০)

খবরদার আমার হাত ছাড়িসনে, পল্টু—

কমলকাকা আমার হাত ধরে মানুষ, গাড়ি আর বাসের ভিড়ে ভর্তি রাস্তা পার করালেন।

আমার লজ্জা করছিল।আমি কি এখন ছোট আছি যে হারিয়ে যাবো? তাছাড়া এই শহরটাতে আমি আগেও এসেছি।

আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি বলতো, পল্টু।

জানিনে।

লাট সাহেবের বাড়ির কাছে। এখন আর ওই বাড়িটকে লাট সাহেবের বাড়ি বলে না। যতদিন ইংরেজ আমাদের শাসন করতো ততদিন লাট সাহেব ছেলেবৌকে নিয়ে ওই বাড়িতেই থাকতেন।

আমরা কিসে করে যাবো?

বাসে।

না, আমরা হাঁটতে খুব ভাল লাগছে।

চল্, তাহলে হেঁটেই যাই।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কমলকাকা বললেন, এই শহরটারও একটা মা ছিল, জানিস।

শহরের মা থাকে নাকি?

হ্যাঁ, দুঃখিনী মা। শহরটা এখন আর তার সেই দুঃখিনী মাকে দেখে না। কেন দেখে না বলতো?

আপনি বলুন।

কেন দেখবে বল্, এর এখন কত ঐশ্বর্য, কত জগৎ জোড়া নাম। অহংকারে ডগমগ করছে। সব শহরই বড্ড স্বার্থপর। নিজের ছাড়া কিছু বোঝে না। বড় শহরগুলো নিজেদের মেদবৃদ্ধির জন্যে ছোট শহরগুলোর রক্ত চুষে খায়। আবার ছোট শহর রক্ত চোষে গ্রামগুলোর, এমনিভাবে যে সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে তাকে কি বলে জানিস?

না, জানিনে। কি বলে?

নগর সভ্যতা।

এটা গল্প কমলকাকা?

নারে। এটাই ইতিহাস।

ইতিহাস।

ইতিহাস না জানলে নিজেকেই জানা হবে না। কথা বলা বন্ধ করে কমলকাকা দাঁড়ালেন, পল্টু, আইসক্রিম খাবি?

হ্যাঁ, আমি ঘাড় কাত করলাম।

আইসক্রিমের দাম মিটিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

কমলকাকা বললেন, চল্ এই রাস্তাটা দিয়ে যাই। তাহলে যেখানে নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল সে জায়গাটা দেখতে পাবি। জায়গাটা অবশ্য এখন আর আগের মতোন নেই। সবচেয়ে বড় পোষ্ট অফিসের বাড়ি উঠেছে সেখানে।

জানিস পল্টু, ইংরেজরা বড় ধূর্ত জাত। ওরা সবচেয়ে আগে যেখানে যায়, সেখানকার মানুষের অতীতটাকে মুছে দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনের একটা কিছ গড়ে তোলে। ষোলো-সতেরো শতাব্দীতে যারা ভাগ্য ফেরানোর জন্যে নিজেদের দেশ ছেড়ে ছিল, তাদের সকলেরই এই এক চরিত্র।

আপনি বুঝি ইতিহাস পড়তে খুব ভালবাসেন?

নারে না, কমলকাকা বললেন, আমি অত পড়াশোনা কিছুই করিনি। এসব এমনিই শুনে শুনে শিখেছি।

বড় পোষ্ট অফিসের কাছাকাছি পৌঁছনোর পর আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের খুব দেরী হয়ে গিয়েছে।

কমলকাকা তাড়া দিলেন, শিগগির পা চালা পল্টু, নইলে রেস দেখতে পারিনে।

আমরা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে সুভাষ বোসের স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে মাঠের একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলাম। দৌড়ানোর জন্যে আমি বুকে হাত দিয়ে হাঁফাতে

থাকলাম।

কমলকাকা বললেন, আমরা ঠিক সময়ে পৌঁচেছি। গাড়ির দৌড় এখনো শুরু হয়নি।

একটু স্বাভাবিক হবার পর আমি সার দিয়ে পর পর দাঁড়িয়ে থাকা বিচিত্র চেহারার গাড়িগুলোকে দেখতে পেলাম। আদ্যিকালের পুরনো গাড়িগুলোর বিচিত্র অবয়বের মতো তাদের আরোহীদের চেহারা ও সাজসজ্জাও বিচিত্র রকমের।

এক দুই তিন চার...গাড়ি গুণতে গুণতে পাঁচ নম্বরে পৌঁছে চোখ আটকে গেল পল্টুর—একি, এটা যে তাদের সেই পুরনো ফোর্ডখানা। ওই তো গাড়ির সামনে ঝোলানো নম্বরখানা তার কণ্ঠস্থ।

তার চেয়েও বড় অবাক হওয়া পল্টুর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাদের পুরনো ফোর্ডের পেছনের সিটে রাজকীয় কায়দায় হেলাম দিয়ে বসে আছেন স্বয়ং জ্যাঠামশাই। তাঁর গায়ে ঠাকুরদাদার শালখানা। তাঁর পাশেই বসে আছেন জেঠিমা। চওড়া লাল পাড় শান্তিপুরি শাড়ি। গলায় বুক অবধি লুটিয়ে থাকা কুড়ি ভরির সীতাহার। সিঁথিতে দগদগে লাল সিঁদুর। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত মনকাড়া দৃশ্য। তাঁদের দুজনার মাঝখানে টুকলি।

গাড়িখানা সামনে পেছনে নানা রং-এর একগাদা গ্যাস বেলুন উড়ছে।

পল্টু হাত তুলে জ্যাঠামশাই আর জ্যেঠিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো কয়েকবার। জ্যাঠামশাি তাকে দেখলেন কিন্তু তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হলো তিনি তাকে চিনতেই পারছেন না। টুকলি দাঁত বার করে হাসছে। তার হাতে মস্ত বড় একটা চটোলেট।

কমলকাকা বললেন, পল্টু, ওদিকে তাকা, ওই গাড়িখানা দেখছিস, ওটার নাম রোলস রয়েস। গাড়ির রাজা বুঝলি—

অনেক দাম তাই না কমলকাকা?

হ্যাঁ, কত দাম তা আমিও জানিনে। তার পেছনের খানা বেন্টলি। ওটার অনেক দাম।

রেস কখন শুরু হবে কমলকাকা?

এক্ষুণি, চারপাশটা দ্যাখ না ভাল করে।

মেজদি আসেনি?

বোধহয় আসেনি।

ছোটকাকী?

কমলকাকা কোন উত্তর দিলেন না।

পল্টু বলল, আচ্ছা জ্যাঠামশাই রেস দেবেন কই আমাকে তো কেউ বলেনি।

একে ভিনটেজ কার র‍্যালি বলে পল্টু। রেস নয়।

কমলকাকা?

বল্।

আমাদেব গাড়িতে তো এখনো জায়গা আছে। ছোটকাকী এলেও বসার জায়গা হয়ে যেত। আপনি জোর করে ধরে আনলে ছোটকাকী ঠিক আসতো।

কমলকাকা বললেন, এদিকে দ্যাখ পল্টু, এক্ষুণি দৌড় শুরু হবে।

দূর, আমার এইসব ভাঙা গাড়ির রেস দেখতে একটুও ভাল লাগছে না। চলুন, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

কমলকাকা একটু অবাক হলেন। বললেন, এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, দৌড় শুরু হোক, তারপর আমরা বাড়ি যাবো।

না, আমি এক্ষুণি যাবো, মেজদি, ছোটকাকী কেউ আসেনি আমি একা রেস দেখবো নাকি।

হাত তুলে কমলকাকা আমাদের ফোর্ডকে দেখিয়ে বললেন, ওই তো তোব বাবা রয়েছেন।

কোথায় বাবা?

দেখতে পাচ্ছিস নে, গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে সামনে বসে আছেন।

সত্যিই বাবা, আমি চিনতে পারিনি। বাবার মাথায় টুপি, তাতে রঙিন পালক গোঁজা। তার সঙ্গে মস্তবড় একটা রোদ চশমায় বাবার চোখ ঢাকা।

বাবা ওরকম সেজেছেন কেন, আমি বুঝতে পারছিলাম না।

কমলকাকা বুঝিয়ে দিলেন, এই খেলায় যে যার ইচ্ছে মতোন সাজতে পারে।

আচ্ছা, একটা কথা বলবো আপনাকে, বলুন রাগ করবেন না?

না। রাগ করব কেন, কি কথা?

আপনি আমাকে, মেজদিকে নাম ধরে ডাকেন। তাহলে ছোটকাকীকে নাম ধরে না ডেকে ছোটবৌদি বলেন কেন?

আমার কথা কমলকাকা শুনলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। কারণ তিনি কোনও জবাব দিলেন না। তার দু'চোখ এখন ভিড়ের ওপর।

আমি বললাম, আপনি ছোটকাকীর নাম জানেন না, তাই না?

আমি জনি। ছোটকাকীর নাম সুমিত্রা।

কমলকাকা আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে কি একটা বলতে গেলেন তার আগেই তীব্র স্বরে হুইসল বেজে উঠলো। আর সেই সঙ্গে একটা দাড়িওয়ালা বয়স্ক মানুষ একটা সবুজ পতাকা তুলে ঘন ঘন নাড়াতে লাগলো।

প্রথম চারখানা গাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাবার পরেই আমাদের গাড়িখানা আমার সমনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করলাম।

পারলাম না।

আমার জামা ধরে কমলকাকা টেনে টানলেন, সরে আয় পল্টু, এক্ষুণি চাপা পড়তিস! হুস্, তাহলে কি হত বলতো!

কমলকাকা কথা শেষ হতে না হতে একটা ঘটনা ঘটলো। চলন্ত ফোর্ড থেকে জ্যাঠামশাইয়ের গায়ের শালখানা কি করে যেন খুলে গিয়ে হাওয়ায় উড়তে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের বহু মানুষ গাড়ির দৌড় দেখা ছেড়ে চাদরখানা ধরার জন্যে উড়ন্ত চাদরের পেছনে পেছনে দৌড়তে শুরু করল। গাড়ি থেকে জ্যাঠামশাইও নেমে পড়েছেন। ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও শালখানা ধরার জন্যে দৌড়তে আরম্ভ করেছেন।

অতবয়সে আর ওই রকম ভারি শরীর নিয়ে জ্যাঠামশাই কি করে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দেবেন। তিনি ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে থাকলেন।

চাদরখানা এখন অনেক উঁচুতে।

আমি কমলকাকার হাত ছাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে শুরু করে বললাম, জ্যাঠামশাই, আপনি ছুটবেন না, আপনি দাঁড়ান, আমি শালটা ধরে আনছি।

সুতো কাটা ঘুড়ির মতোন শালখানা মাটির দিকে গোঁত্তা খেয়ে আবার উপরে উঠে গেল।

এখন আর কেউ পুরনো গাড়ির রেস দেখছে না। তার বদলে উড়ন্ত চাদরের খেয়ালের সঙ্গে এক হয়ে সমস্ত মাঠ ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

মাঠে যত ক্যামেরা হাতে খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার ছিল তাদের বেশীর ভাগই আমার পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছে আর পটাপট শালখানা আর আমার ফটো তুলছে।

একজন রিপোর্টার লেখার প্যাড হাতে আমার পাশে পাশে দৌড়তে দৌড়তে জিজ্ঞাসা করল, খোকা শালখানার কত বয়স বলতে পারো?

আমিও চেঁচিয়ে তার কথার উত্তর দিলাম, আড়াইশো-তিনশো বছর। সেই যেবার কলকাতায় নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল, সেইবার আমার ঠাকুরদাদার বাবাকে নবাব নিজের হাতে—

ব্যাস্ ব্যাস্ আর বলতে হবে না, রিপোর্টার বলল, সব বুঝে গিয়েছি, বাকিটা আমরা লিখে নেব।

আমি দৌড়নো বন্ধ না করে ফটোগ্রাফারদের লক্ষ্য করে বললাম, ওই দিকে আমাদের গাড়িটা আছে তার ফটো তুলুন। ফোর্ড গাড়ি পাঁচ নম্বরে দৌড়চ্ছে —, ওই গাড়িখানা বিলেতের মহারানী নিজে আমার ঠাকুরদাদার—

পল্টু—পল্টু....এই পল্টু—

কে যেন আমার নাম ধরে জোরে জোরে ডাকছে। তিন-চারবার ডাকার পর যে ডাকছিল তার গলাটা আমার খুব চেনা মনে হলো কিন্তু আমি সাড়া দেবার

প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরলো না।

একটু পরে আমার মনে হলো গলার আওয়াজটা ঠিক ছোটকাকীর গলার আওয়াজের মতোন।

ঠিক তাই।

ছোটকাকী আমার হাত ধরে টেনে তুলল, পল্টু শিগগির ওঠো। বাইরে গিয়ে দ্যাখো কারা সব এসেছে।

তখনো আমার হাত ছোটকাকীর হাতের মধ্যে ধরা।

আমি বিভ্রান্ত স্বরে জিগ্যেস করলাম, জ্যাঠামশাই জ্যোঠিমা কোথায়, আর টুকলি—

সব্বাই বাইরে—।

কারা এসেছে ছোটকাকী?

সে আমি বলবো না, নিজে উঠে গিয়ে দ্যাখো।

যাচ্ছি, আমি ছোটকাকীর হাত ছাড়লাম না, বললাম, জানো ছোটকাকী, একজনকে আমি তোমার আসল নামটা বলে দিয়েছি।

একখানা জড়ির কাজ করা তুঁতে রং-এর বেনারসী পড়েছে ছোটকাকী। ফর্সা বলে শাড়ির রং খানায় খুব মানিয়েছে তাকে। নাকের পাটায় হিরের নথ থেকে আলো ঠিকরে বেরচ্ছে।

ছোটকাকী বলল, বেশ করেছ আমার নাম বলে দিয়েছ? এখন তাড়াতাড়ি চলো—

বাইরে গিয়ে আমি থমকে দাঁড়ালাম। একখানা লাল রং-এর ঝকঝকে নতুন গাড়ি আমাদের বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে করেমেজদির গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসেছে।

বাবা নিজে দাঁড়িয়ে তত্ত্বগুলো কোথায় রাখা হবে বলে দিচ্ছেন।

জ্যাঠামশাই ধারে কাছে কোথাও নেই।

আগে যেখানে পুরনো গাড়িখানা দাঁড়িয়ে থাকতো সেই জায়গাটা তেলকালি পড়ে কুষ্ঠের ক্ষতের মতোন দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর ছোটকাকী একখানা কাঁসার ডিসে লুচি বেগুনভাজা আর মিষ্টি সাজিয়ে আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, কি পল্টু গৌরীতো বিয়ের পর কালই শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে। দু'মাস তুমি ওর সঙ্গে কথা বলোনি। চলো আমি তোমাদের ভাব করিয়ে দিই।

আমি মাথা নিচু করে লুচি বেগুনভাজা সব খেলাম।

ছোটকাকী তখনো আমার সামনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জিগ্যেস করল, তখন যে বললে আমার আসল নামটা বলে দিয়েছ, কাকে বলেছ তাতো বললে না।

আমি বললাম, স্বপ্নের মধ্যে কাকে বলেছি মনে নেই।

আমার কথা ছোটকাকী বিশ্বাস করল কিনা বুঝতে পারলাম না। অনেকক্ষণ অন্য একরকম চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

(২১)

আমাদের বাড়িতে এখন আত্মীয় স্বজনের গিজগিজে ভিড়। তাদের অনেককে আমি চিনিইনে। আগে কখনো দেখিনি। আমার চেনা জগতটার পরিধি এতই ছোট যে, এক দৌড়ে তার সীমানা শেষ হয়ে যায়।

মেজদি শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে সেই সীমানা আরও কমে যাবে।

বকফুল গাছতলায় এখন জ্যাঠামশাইয়ের ইজিচেয়ারটা নেই সমস্ত উঠোন জুড়ে প্যাণ্ডেল খাটানো হয়েছে। প্যাণ্ডেলের এক পাশে ছাদনাতলা। সন্ধ্যে বেলা সেখানে মেজদির বিয়ে হবে। আমাদের বাড়ির সব কাজ এখানেই হয়। ঠাকুমার শ্রাদ্ধও এখানেই হয়েছিল। এই উঠোনেই আমি আঙুল দিয়ে ছোটকাকীর পিঠে পাঁচ লিখেছিলাম। কেন জ্যেঠিমা আমাকে ছোটকাকীর পিঠে আঙুল দিয়ে লিখতে বলেছিলেন এখন তা আমি জানি।

ওটা একটা মেয়েলি তুক্।

এ বাড়িতে আমার মতো আর একজনও একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কমলকাকা।

ক'দিন থেকে জ্যাঠামশাই খুব একটা কথাবার্তা বলছেন না। গাড়িখানা বিক্রির পর থেকেই মনমরা হয়ে আছেন।

জ্যেঠিমা একদিন বাবাকে বলছিলেন, সেজদা, আপনার দাদার কি হয়েছে বলুন তো? মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বাবা বললেন, গৌরীর বিয়েটা মিটে যাক তারপর একদিন শহরে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখিয়ে আনবো।

ওঁরা ডাক্তারের কথা বললেও আমি জানি জ্যাঠামশাইয়ের এ রোগ কোনও ডাক্তার সারাতে পারবে না।

শরীরে নয়, জ্যাঠামশাইয়ের আসল রোগ মনে। তিনি এক অদ্ভুত অপরাধবোধে ভুগছেন।

ঠাকুরদাদার আমলের ঐতিহ্যকে তিনি ধরে রাখতে পারেননি।

অবশ্য সে আমলের কিছু কিছু জিনিস এখনো টিকে আছে। মেজদির বিয়ের দু'দিন আগে থেকেই বাড়িতে ভিয়েন বসেছে। ময়রার দোকান থেকে মিষ্টি এনে আমাদের বাড়িতে কখনো কোন কাজ হয়নি।

আমার দু'চোখ মেজদিকে খুঁজছিল।

টুকলি বলল, ওইতো ওই ঘরে মেজদি।

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে মেয়েদের ভিড়ের ফাঁক দিয়ে মেজদির শরীরের একটুখানি

দেখতে পেলাম আমি।

মেজদি দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে।

আমি চলে আসছিলাম। পেছন থেকে একজনা ডেকে বললেন, কি খোকা, চলে যাচ্ছো কেন, নতুন বৌ দেখতে এসেছিলে?

অপর একজন মহিলা বললেন, কে রে ছেলেটি, মুখখানা কী মিষ্টি।

আর একজনা বললেন, বরের ভাইটাই হবে বোধহয়।

আমার বুকের মধ্যে নতুন একটা ভয় ঢুকে পড়লো। আমার নিজের বাড়িতেই কেউ আমাকে চিনতে পারছে না। মেজদি নিজেও বলল না, ও তো আমাদের পল্টু। মেজদি আমাকে দেখতে পায়নি কিন্তু আমার পায়ের শব্দ, নিশ্বাসের ওঠাপড়া এমনকি আমার ছায়াটাও তো মেজদির চেনা।

আসলে মেয়েরা ভীষণ স্বার্থপর। মেজদিও বিয়ের আগেই মনে মনে এ বাড়ির শেকড় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে।

একটা চেনা খস্ খস্ শব্দ আর চুড়িব ঠুনঠুনের সঙ্গে আমি ধাক্কা খেলাম। ছোটকাকী খপ্ করে আমার একখানা হাত ধরে ফেলে বলল, এই পল্টু, শিগগির চলো তো আমার সঙ্গে।

ছোটকাকীর এক হাতে একটা কাপড়ের ঢাকা দেওয়া থালায় কি সব যেন।

আমার হাত ধরে ঝিলের ধারে নিয়ে এলো ছোটকাকী। বলল, এইখানে চুপ করে দাঁড়াও। আমি কাজটা সেরে নিই।

পায়ের পাতা ডোবা জলে নেমে ছোটকাকী থালায় করে আনা জিনিসগুলো জলে ফেলে হাতের ঢেউ তুলে সেগুলোকে দূরের জলে পাঠাতে পাঠাতে কমলকাকার ঘরখানার দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস গোপন করলো।

তারপর বলল, হ্যারে পল্টু, তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

কার ছোটকাকী?

তোর কমলকাকার, এখানে নেই নাকি—?

আছে তো।

কে বলল, কালরাত্তিরে তো খেতেই আসেনি।

ঘরে গিয়ে দেখে আসবো ছোটকাকী?

যাবি? না থাক্‌গে। হয়তো নেশাটেশা করে পড়ে আছে।

না না, কমলকাকা কক্ষণো মদ খান্‌না আমি জানি।

ছোটকাকী জল থেকে উঠে এসে বলল, মদ না খেলেও নেশা হয়, তুই বুঝবিনে। চল্ আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম না কমলকাকা যখন রাত্তিরে ঝিলটার চারপাশে সুধা সুধা বলে চিৎকার করতে করতে দৌড়তে থাকেন, তখন আমারও মনে হয় উনি নেশা করেছেন।

ছোটকাকী—

বলো—গলার স্বরে বোঝা গেল এই মুহূর্তে ছোটকাকী নিজের মধ্যে নেই।

আমি বললাম, তুমি যে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে এলে, ঝিলের ধারে একা আসতে তোমার বুঝি ভয় করে?

হ্যাঁ—

রাত্তিরেও একা আসতে ভয় করে?

ছোটকাকীর ভিজে পায়ের পাতায় কুটি কুটি জল ঘাসের পাতা লেগেছিল। মনে হচ্ছিল, সবুজ রং-এর আঁকা একটা সুচারু ছবি আলপনা।

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ছোটকাকী বললেন, তাড়াতাড়ি এসো। গৌরীর গায়ে হলুদের সময় হয়ে গিয়েছে।

(২২)

বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল মেজদি।

ফুল দিয়ে সাজানো ঝকঝকে গাড়িতে সদ্য বৌ হওয়া মেজদিকে রাজরানীর মতোন দেখাচ্ছিল।

নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েদের মতোন কাঁদলো না সে।

গাড়িতে ওঠার আগের মুহূর্তে মেজদি আমার হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এলো। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, কিরে পল্টু। আমার ওপর এখনো রাগ করে আছিস? আমি চলে যাবার পর দেখবি খুব খারাপ লাগবে তোর। তোকে এখানে কেন ধরে আনলাম বলতো। জানি তুই বলতে পারবি নে।

এই নে, যেমন করে ছোটকাকীর পিঠে লিখেছিলি, ঠিক তেমনি করে আমার পিঠেও।

কথা বলতে বলতে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল মেজদি, লেখ পল্টু, তোর যা ইচ্ছে—।

না মেজদি, আমাকে তোমার পিঠে কিছু লিখতে বলো না, আমি অপয়া।

ভাগ, যা বলছি তাই কর, লক্ষ্মী সোনা ভাই আমার।

আমি জানি, তুই খুব পয়া, যা লিখবি তাই হবে।

আমি আরষ্ট হাতে মেজদির পিঠে আমার মাঝের আঙুলটা দিয়ে দুই লিখে দেবার পর মেজদি টপ্ করে আমাকে চুমু খেয়ে বলল, যাবার আগে তোকে একটা কথা বলে যাচ্ছি, খবরদার কাউকে বলবি নে।

না বলবো না।

যদি বলিস, তাহলে আমি কিন্তু মরে যাবো।

আমি বললাম, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলবো না আমি।

মেজদি আমার দিকে পেছন ফিরে জামার হুক লাগাচ্ছিল। আমি এতো কাছে যে মেজদির গায়ের সেন্টের গন্ধ আর বাসি মালার গন্ধ তীব্র হয়ে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

কাজ শেষ হলে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল মেজদি, তুই সেই যে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলি সুধা কে, কে জানিস?

তার কথা শেষ হবার আগেই দম দম করে ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা পড়লো। তার সঙ্গে ছোটকাকীর গলা—

এই গৌরী, শিগগির দরজা খোলো। যাত্রার লগ্ন চলে যাচ্ছে। সবাই ব্যস্ত হচ্ছেন।

দরজার ছিটকিনিতে হাত রেখে মেজদি আমার দিকে তাকাল, আমি ফিরে এসে নামটা তোকে বলবো পল্টু, চলি।

ঘরের বাইরে পা দিয়ে দাঁড়াল সে, কমলকাকাকে বলিস, আমার বাড়ির উঠোনেরও পদ্ম লাগিয়ে দিতে হবে। মনে করে কথাটা বলিস কিন্তু।

মেজদির যাত্রার সময় কমলকাকা সকলের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখে জল। বাবা আর জ্যাঠামশাই পাশাপাশি। ছোটকাকা মেজদির হাত ধরে গাড়িতে তুলে দিলেন। তারপর গাড়ি চলতে শুরু করার পর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে যেতে থাকলেন।

ঝিল পেরিয়ে গাড়িখানা বাস রাস্তায় ওঠার পর চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল মেজদি।

(২৩)

এর ঠিক তিনদিন পর আমাদের বাড়িতে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যা আগে কখনো ঘটেনি।

রোজকার মতো ছোটকাকা শেষ লোকালে বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় না ছেড়েই ছোটকাকীকে ঘরে ডাকলেন। ছোটকাকী যাবার পর নিজে হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও আমরা বাইরে থেকে শুনতে পেলাম কাকা ছোটকাকীকে মারছেন।

জ্যাঠামশাই বকফুল গাছের নিচে তাঁর জায়গায় বসেছিলেন। নীরবে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। জেঠিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, এখানে কি করছিস তোরা, যা বাইরে যা।

তিনদিন হলো কমলকাকা আর বাড়ির ভেতরে আসেন না। খাবার সময় তাঁর জায়গাটা ফাঁকা পড়ে থাকে। ইংরিজি বইখানা হাতে নিয়ে আমি রোজ কমলকাকার ঘরখানার চারপাশে ঘুরে বেড়াই।

এই তিনদিন একবারের জন্যেও কমলকাকা বাইরে আসেননি। তাঁর গর্তে ঢোকা

দু'টো চোখের দৃষ্টি সব সময় একটা গভীর বিষণ্ণতা দিয়ে ঢাকা থাকে। তাঁর গলায় একটিই গান অবসন্ন ক্লান্ত আক্ষেপের মতো হাহাকার হয়ে ধ্বনিত হতে থাকে—"আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাওকি—"

আমার খুব কষ্ট হয়। রাগ হয়।

দু'দিন পর কমলকাকার শনছাওয়া ঘরে আবার অদৃশ্য শাড়ির সেই খস্ খস্, চুড়ির ঠুন ঠুন আর গায়ের চেনা-অচেনা গন্ধের সঙ্গে কিছু না বলা শুনতে পাই।

আমি বুঝতে পারি—সে আর কেউ নয়, কমলকাকার সুধা।

(২৪)

পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই পোষ্ট অফিসে পঞ্চানন কাকা জ্যাঠামশাইয়ের নাম ধরে ডেকে চিৎকার করে বলে যান, শিগগির ঝিলের ধারে যান, শিগগির। এক লহমায় ঠাসাঠাসি ভিড় জমে ওঠে জলাভূমিটার ঘাস ছাওয়া কিনারে। মাত্র তিন হাত দূরে জলের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে কমলকাকা।

তাঁর সারা গায়ে কোথাও এতটুকু আবরণ নেই। পায়ের কাছে ভাসছে একটা ছেঁড়া লুডোর কয়েকটা টুকরো।

ছিঃ, কমলকাকা স্ত্রীও না পুরুষও না।

জ্যাঠামশাই নিজের গা থেকে ঠাকুরদাদার আমলের শালখানি খুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, সুকু এটা দিয়ে ওকে ঢেকে দে।

তারপর নিঃশব্দে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকেন তিনি।

সন্ন্যাস

শীতের সকালে দোতলার ঝুল বারান্দায় বসেছিলেন পঙ্কজ। গায়ে একখানা কাজ করা শাল। পাঞ্জাবীর নীচে উলিকট। এখনো সামনের রাস্তায় ভালো করে মানুষজনের চলাচল শুরু হয়নি।

একটু আগে যে সরকারী বাসখানা যেতে দেখলেন তাতেও হাতে গোনা যাত্রী। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা পাল্টাবে। ভিড় উপচানো বাসগুলোকে তখন দেখলে পঙ্কজের মনে কেমন এক ধরনের কষ্ট হয়।

শহরের যে অংশে তাঁর এই বাড়িটা তার একটা আলাদা কৌলিন্য আছে। ছিমছাম সম্ভ্রান্ত আর পয়সাওলা মানুষদের বাস এখানে।

চিরকাল এরকমটা ছিল না। অন্ততঃ পঙ্কজ নিজে যখন এখানে জমি কিনেছিলেন তার পেছনে কোনো দূরদৃষ্টি ছিল না, ছিল খেয়াল।

তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি এখানে বাড়ি করে পৈত্রিক পাড়া ছেড়ে একদিন উঠে আসবেন।

শীত লাগছে না তবু গায়ের শালটা পিঠের দিকে টানতে টানতে নিজের দুখানা পায়ের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর পাশে। এতক্ষণ তাঁর দুখানা পা বারান্দার জাফরি দিয়ে আসা রোদ্দুরের সঙ্গে খেলা করছিল। রোদ্দুরটা পাশে সরে গিয়েছে।

বিষণ্ণ চোখে পঙ্কজ মেঝের ওপর রোদ্দুরের আসা যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

রোদ্দুরটা সরতে সরতে একসময় বাগানের স্বর্ণ চাপা গাছটার মাথা ছুঁয়ে একলাফে রাস্তার ওপাশে চলে যাবে। তার অনেক আগেই এখান থেকে উঠে পড়বেন পঙ্কজ। একটা চলে যাওয়া প্রভাতের মায়া তখনো তাঁর মনটাকে আঁকড়ে থাকবে। চলে যাওয়া সকালটা, তার পবিত্র অনুভূতি এবং ব্যস্ত দিনের পদার্পণ সব কিছু মনের মধ্যে নিয়েই নিজের ঘরে এলেন পঙ্কজ। এখানকার দৃশ্যে কোনো নতুনত্ব নেই। কোনো রোমাঞ্চকর পরিবর্তন নেই। শুধু ঘরের এযাবকুলার দুটো এখন চালানো হয়না—এইটুকু যা ব্যতিক্রম।

মেঘনা এখন ঘরে থাকবে না এটা তাঁর জানা। ঘরের মধ্যে টেবিলে দুখানা ইংরিজি আর একখানা বাংলা দৈনিক পরিপাটি সাজানো। ইদানীং তিনি আর কাগজে হাত দেন না। অন্ততঃ গত দু সপ্তাহ তিনি কাগজ উল্টেও দেখেন নি রাজনীতি অর্থনীতি অথবা কোন বঞ্চনার খবর যতো গুরুত্ব দিয়েই ছাপা হোক না কেন—

পঙ্কজকে আর টানে না। পঁয়ষট্টি বছরের অনেকখানি সময় ঐ সব পড়ে নষ্ট করেছেন। এখন মনে হয় ঐ নষ্ট হওয়া সময়গুলো ফেরৎ পেলে রোদের সঙ্গে খেলা করতেন। অথবা রাতের আকাশে তারাদের দিকে তাকিয়ে তাদের সঙ্গে পরিচয় দেওয়া নেওয়ার খেলা খেলতে খেলতে নিজে তারা হতে চাইতেন।

তাঁর মনের এই ইচ্ছের কথাগুলো কাউকে বলতে পারেন না পঙ্কজ। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না অথবা তাঁকে পাগলা ভাববে। অথবা যদি তাঁকে কেউ পাগল নাও ভাবে তাহলেও ভাববে বিলাসী বলে মনে মনে উপহাস করবে। অবশ্য পঙ্কজ কারুর কথাতেই নিজের মনের এই বিলাসকে ছাড়তে রাজি নন। কজের মানুষদের, অন্ততঃ যারা জীবন বলতে কাজকেই শুধু বোঝে তাদের তিনি ঘেন্না করেন।

চাদরখানা গা থেকে খুলে সোফার ওপর রাখলেন পঙ্কজ তারপর দেয়াল ঘড়িতে চোখ রাখলেন, ছটা পঁয়ত্রিশ। মনে পড়ে গেল কালও ঠিক ছটা পঁয়ত্রিশের সময় তাঁর একটা নদীর কথা মনে পড়েছিল যে নদীটা এই পৃথিবীরই কোথাও আছে অথচ এখনও তিনি দেখেননি। দুকুল প্লাবিত বর্ষার ভরা নদীর অন্তঃর্বাহী হুম হুম শব্দের মধ্যে পাড়ভাঙ্গার গানের কথাও জানেন অথচ নিজের কানে শোনেন নি তিনি।

বাবা—

পুত্রবধূ। চোখ তুললেন পঙ্কজ। বললেন, টেবিলে রাখো। রূপোর ট্রের ওপর সুদৃশ্য বোন চায়নার কাপ, টিপট, মিল্ক পট। সুগারপট নেই। চিনি ছেড়েছেন দশ বছরেরও বেশী। ডিসে চারখানা বিস্কুট।

সুমিতা হাতের ট্রে নিঃশব্দে টেবিলে রেখে ততোধিক নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এবাড়িতে ঝি চাকরের একটা বড় দল আছে। পঙ্কজ তাদের হাতে চা খাওয়া পছন্দ করেন না। সুমিতা ঘর থেকে চলে যাবার পর তাঁর মনে হলো, কাল রাত থেকে তিনি ভেবে রেখেছিলেন সুমিতাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবেন। সেই কথাটা আজও জিজ্ঞাসা করা হলো না তাঁর।

বোধহয় তিনি উত্তরটা শুনতে ভয় পান বলেই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা হয় না।

সকালের এই প্রথম চা। দ্বিতীয় কাপ খাবেন ব্রেক ফাস্টের টেবিলে সকলের সঙ্গে বসে।

চায়ের সরঞ্জামের দিকে তাকিয়ে থেকে পঙ্কজ একটু আগের স্বপ্নটা, অর্থাৎ দুকূল ছাপানো নদীটা, তার ভাঙ্গা পাড়টার গায়ে অসংখ্য গাং শালিকের বাসা, উদ্দাম স্রোতে ভাসতে ভাসতে নাচতে নাচতে যাওয়া একটা ছোট্ট জেলে ডিঙ্গি—দেখতে চাইলেন কিন্তু তার কৃপন মন তাকে স্বপ্নটা ফিরিয়ে দিল না বলে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপে টিপট থেকে চা ঢাললেন তিনি। গলানো সোনা রং চায়ের

সঙ্গে দুধ মেশালেন তারপর তাতে চুমুক দেবার আগে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন।

কাল থেকে সুমিতাকে নিষেধ করে দিতে হবে তাঁকে যেন রূপোর টি-পটে করে চা না দেয়—ওটা বাহুল্য।

টি-পটের কৌলিন্যে চায়ের স্বাদে কোন তারতম্য ঘটে না। অবনী মাষ্টার মশাই এর বাড়িতে তিনি মোটা রংচটা কাপে চা খেতেন সে চায়ে অমৃতের স্বাদ পেতেন পঙ্কজ।

বাবা—

অনিরুদ্ধর গলা। তার ভারী পৌরুষ স্বর একটু ক্লান্ত শোনাল পঙ্কজের কানে। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মুখ ফেরালেন তিনি। এসো— এসো—।

অনিরুদ্ধ তার চেয়েও মাথায় লম্বা বেশী। হ্যাণ্ডসাম। তার হাঁটাচলা এবং কথা বলা এতই অভিজাত্য পূর্ণ যে সে সামনে থেকে সরে যাবার পরও তার কথার আকর্ষণীয় সৌরভ অনেকক্ষণ অবধি ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে থাকে।

না, তাঁর নিজের মত নয়, অনিরুদ্ধ মেঘনার মত হয়েছে। ছেলেমেয়ে বাবা অথবা মা যার মতই হোক বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিজের মত হয়ে যায়।

ছোটবেলায় পঙ্কজকেও সবাই বলতো তিনি নাকি তার বাবা শশাংকর মতো হয়েছেন কিন্তু পঙ্কজ নিজে জানতেন তিনি কারুর মত নয় তাঁর নিজের মতই হয়েছেন।

মানুষের অন্য স্বভাবের মতো এটাও একটা সে একজনার মধ্যে তার চেনা একজনকে পেতে চায়।

অনিরুদ্ধ হাল্কা পায়ে সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো ঘর্মাক্ত মুখ, পরিশ্রান্ত দেহ।

এইমাত্র দুকিলোমিটার রাস্তা জগিং করে এসেছে অনিরুদ্ধ। পরিশ্রম করলে পুরুষের চেহারায় একটা জেল্লা ফোটে সেটাই তার আভিজাত্য। অহংকার।

এই মুহূর্তে অনিরুদ্ধর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে সেই অহংকারই সোচ্চার হয়ে আছে।

বসো—। কবে ফিরেছ?

পরশু—।

পরশু—। কেমন হলো?

আনএক্সপেকটেড্লি গুড—। নভেম্বরে ইউরোপের পাঁচটা দেশের জয়েন্ট ট্রেড ডেলিগেট আসবে এখানে। দিল্লী মুম্বাই হয়ে কলকাতায়—তখন আমাদের কলাবোরেশন ফাইন্যাল করবো—।

কথাটা বলতে বলতে থেমে গেল অনিরুদ্ধ। তার কথা শুনছেন না পঙ্কজ। হাতে চায়ের কাপ মন অন্যত্র কোথাও। কি বলছিলে যেন?

অনিরুদ্ধ চুপ করার এক মিনিট পর তার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন পঙ্কজ।

আমার ট্যুরের কথা জানতে চাইছিলেন আপনি।

হ্যাঁ হ্যাঁ। পঙ্কজ বললেন, একটা জার্নালে পড়ছিলাম জার্মানীতে প্রজাপতির চাষ নিয়ে ওদেশের সরকার থেকে বড় প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। পাখি টাখি দেখলে?

অনিরুদ্ধ দুপাশে মাথা দোলালো, সময় পেলাম কোথায়? একদিন জুতে যাবার কথা ছিল শেষ অবধি আর—মেঘনা হলে কিছুতেই এটা কতো না—পঙ্কজ মনে মনে ভাবলেন, অনিরুদ্ধ তার সময়ের দাস। তার কাছে পাখী প্রজাপতির প্রসঙ্গ শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অবান্তর। অশ্লীল।

অনিরুদ্ধ মুখোমুখি বসেছে। গায়ে এখন শুধু একটা হাতাওলা গেঞ্জি পরণে শর্টস। দুটোই বিদেশী। আরামদায়ক। পঙ্কজ বুঝতে পারলেন, অনিরুদ্ধর আরো কিছু বলার আছে।

যাই বলার থাক তাঁর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ, এবাড়িতে কখনো নিজের স্বার্থের বিষয় নিয়ে কেউ কথা বলে না। কখনো মতান্তর হয় না। আপনার জন্যে সিগারেট আর তিনটে পুল ওভার এনেছি ওখান থেকে। মা দিয়ে যাবেন আপনাকে। না এটাও অনিরুদ্ধর বলতে চাওয়া কথা নয়। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পঙ্কজ বললেন, অফিস, অথবা কারবারের কথা কিছু বলার থাকলে তোমার মার সঙ্গে আলোচনা করে নিও।

এ ব্যাপারটা আপনারও জানা দরকার—ওপাশের ফুটপাতে একটা ঝুপড়ি কদম গাছ আছে। এই ক'বছরে গাছটা শিশু থেকে পরিপূর্ণ যুবতী হয়েছে। তার শরীরের এই বাড় পঙ্কজের চোখের সামনেই ঘটেছে। তিনি তাঁর ঘরের জানলা থেকে কতদিন গাছটাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—বাহবা—তোমার নতুন ডালপালাগুলো আমি দেখেছি—, তোমাকে আরো বড় হতে হবে। আরো শক্ত সমর্থ হতে হবে। বড় ঝড়টর এলে যাতে তুমি তাকেও অগ্রাহ্য করতে পারো। ওই কদম গাছটায় এই সময়টায় কিছু পাখী আসে প্রতি বছর। পঙ্কজ খেয়াল করে দেখেছেন। তাদের সঙ্গে কী মমতাভরা হৃদয় নিয়ে পাতাগুলো খেলা করতে চায়।

বাবা,—

ওঃ তুমি, চা খাবে? খাওনা এককাপ—

আমি নিচ্ছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না—অনিরুদ্ধ কাপে শুধু লিকার ঢেলে নিয়ে তাতে চুমুক দিল। তারপর কাপ থেকে ঠোঁট সরিয়ে বলল, আমার মনে হয় আমাদেব ব্যবসাটাকে ঢেলে সাজানোব সময় এসেছে। আমরা এক্সপোর্টের কথাও ভাবছি—, এই বাজেটে সরকার থেকে অনেক বাড়তি সুযোগসুবিধে—

তুমি রোজ কতক্ষণ জগিং করো?

আমি, আধ, না একঘণ্টা। রোজ হয় না। মাঝে মাঝে অনেক রাত অবধি অফিসের ফাইল—

আমি, পঙ্কজ বললেন, আমি কখনো অফিসের ফাইল বাড়িতে আনিনি। কাজ যাতোই জরুরী হোক—কোনোদিন—না কথাটা পঙ্কজ মনে মনে বললেন। নিজের কোনো প্রসঙ্গ তুলে কথা বলতে তার রুচিতে আটকায়। কারুর ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া—না, তাও কখনো করেননি তিনি। তেমনি কেউ তাঁর ওপরে জোর করে কিছু চাপাতে চাইলে তাকেও মেনে নেননি।

আপনি কিছু বলছেন না কিন্তু—অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বরে কোন অনুযোগ নেই। থাকলেও গ্রাহ্য করতেন না তিনি। বললেন, কি ব্যাপারে বলছো তুমি?

আমাদের কোম্পানীকে টিকে থাকতে গেলে যেমন আছে তেমনি চললেই হবে, কিন্তু বাড়াতে হলে কিছু কিছু নতুন সিস্টেমকে—তুমি জানো, পঙ্কজ খুব শান্ত গলায় বললেন, এই কাববারটা শুরু করেছিলেন তোমার ঠাকুরদাদা। তাঁর মৃত্যুর পর আমি চালিয়েছি। এখন তুমি। আমার বাবা কোনদিন জানতে চাননি কিভাবে তিনি কোম্পানী চালাবেন। আমার আমলেও আমি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী চালিয়েছি।

অনিরুদ্ধ বুঝতে পারছিল উত্তরটা পঙ্কজের কাছ থেকে এইভাবেই আসবে। সাত বছর আগে যেদিন তিনি কোম্পানীর সব দায়িত্ব ত্যাগ করে অনিরুদ্ধর কাঁধে দায়িত্বভার চাপিয়ে সরে এসেছেন তারপর থেকে একদিনের জন্যেও তিনি ও পথ মাড়াননি। তিন বছর আগে একটানা সাতদিন স্ট্রাইক করেছিল কর্মচারীরা তখনো ভুল করেও কোনো দিন জানতে চাননি কি হচ্ছে অথবা কোনো ভুলত্রুটি হচ্ছে কি না।

ওকি, তুমি যাচ্ছো—

হ্যাঁ।

চাটা খেয়েছ?

হ্যাঁ। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনিরুদ্ধ।

এরপর আটটায় ব্রেকফাস্টের টেবিলে আবার অনিরুদ্ধর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। কিন্তু তখন সে এত ব্যস্ত ভাল করে কথা বলবারই সময় পাবে না। মনে মনে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন পঙ্কজ।

তবু আবার যদি কথাটা চায়ের টেবিলে তোলে অনিরুদ্ধ? টেবিলে মেঘনা থাকবে সুমিতা থাকবে। পঙ্কজ সেখানে সংখ্যালঘু।

সংখ্যালঘু কথাটা মনে আসতেই হেসে ফেললেন পঙ্কজ। এক এক সময়ে এক একটা কথা সময় ও পরিবেশের মধ্যে থেকে উঠে আসে। তারপব কথাটা চলতে চলতে স্থায়ী হয়ে যায়। মানুষ তাকে সঙ্গে নিয়েই চলতে থাকে। পঙ্কজের ছোট বেলায় সংখ্যালঘু কথাটার চল ছিল না। অথচ সংখ্যালঘু বলতে এখন যাদের বোঝায় তারা তখনো ছিল।

অনিরুদ্ধ ঘর থেকে চলে যাবার পর কোনো কারণ ছাড়াই পঙ্কজেব মনটা

চঞ্চল হলো। অনিরুদ্ধর সঙ্গে তাঁর কোনো মতান্তর নেই। কোনো বিরোধ নেই তবু তাঁর মনে হলো অনিরুদ্ধর ব্যবসার ব্যাপারে তাঁর অনীহার কথা জানা সত্ত্বেও কেন তাকে ঐ কথাগুলো বলল।

পঙ্কজ উঠে পড়লেন। চায়ের খালি কাপ। ভাঁজ না খোলা সেদিনের সংবাদপত্রগুলো এবং কালকের ডাকে আসা সন্দীপের চিঠিখানা এই সবের ওপর থেকে তাঁর দৃষ্টি ঘুরে আবার রাস্তার ওপাশে কদম গাছটার দিকে ফিরে গেল।

সন্দীপ এখন বিলাসপুরের ওদিকে কোথায় যেন থাকে। সেখানকার একটা স্কুলের ড্রইং টিচার।

কাল চিঠিখানা আসার পর থেকে সন্দীপকে নিয়ে এই তিনবার ভাবলেন তিনি। রাত্তিরেও বিছানায় ঘুম আসার আগে সন্দীপ চিন্তায় আসা যাওয়া করছিল। আচমকা পঙ্কজের মন বলে উঠলো, এবার তাহলে সন্দীপের কাছেই চলে যাই।

তুমি জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কি করছো, মেঘনার গলা।

কিছু না।

দুবার ডাকলাম, তাও সাড়া দাওনি তুমি।

ডেকেছিলে, কখন?

মেঘনা পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, ওই কদম গাছটায় কি আছে? সব সময় ওটার মধ্যে কি খোঁজো তুমি?

পঙ্কজ সরে আসতে আসতে হাসলেন। গাছের মধ্যে যা যা থাকে তাই আছে। ডাল পাতা।

কথাটা বলতে বলতে নিজেকে মনে মনে শাসন করলেন, খবরদার, সন্দীপের কথা এনে ফেলোনা যেন। .

চলো, সুমিতা টেবিলে খাবার দিয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি—?

তাড়াতাড়ি কোথায়, আটটা বাজে—, মেঘনা যেতে যেতে না থেমে বললেন, সবাই বসে আছে তোমার জন্যে। মেঘনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পঙ্কজ নীরব চোখ তুলে তার চলে যাওয়া দেখলেন।

সাধারণ একখানা শাড়ি পরেছে মেঘনা।

সাদা ব্লাউজ। দুহাতে সোনার বালা ছাড়া অন্য কোনো অলংকার নেই। সকালে চান করার ফলে ভেজা চুল এখনো শুকোয়নি।

কতো বয়স হলো মেঘনার, পঞ্চাশ? না বেশী। পঞ্চান্ন। তিনি নিজে ষাট ছাড়িয়ে একষট্টি। তাহলে সন্দীপও ষাট। দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়েছেন। কলেজের পর ছাড়াছাড়ি হলেও বন্ধুত্ব এবং যোগাযোগ নষ্ট হয়নি। এসব ভাবনা ছাপিয়ে পঙ্কজের মনে নতুন একটা ভাবনার ছায়াপাত ঘটলো—সন্দীপ ষাট হলে তাহলে আর কদ্দিন ড্রইং মাস্টারের চাকরিটা করতে পারবে সে। এখন কি নতুন

আইন কানুন হয়েছে তার খোঁজ খবর রাখেন না তিনি। মাস্টারী না থাকলে জীবন চালাবে কেমন করে সন্দীপ?

ছবি এঁকে, ছবি বিক্রি করে?

হ্যাঁ, আজকাল নামী আর্টিস্টের আঁকা ছবি নিলেমে লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হয় কিন্তু সন্দীপ এদের দলে পড়ে না। একটা বিষণ্নতা উঠে এলো পঙ্কজের মনে। একটু আগেও তিনি ভেবেছিলেন এবার সন্দীপের কাছে চলে যাবেন। কি করে যাবেন, তারতো চাকরিই থাকবে না।

কলেজের পর বহুদ্দিন সন্দীপের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। ধূমকেতুর মত একদিন সন্দীপ তাঁর অফিসে এসে হাজির হয়েছিল এবং সন্দীপের হাত ধরে মেঘনা।

বোর্ডরুমে জরুবি মিটিং এ ব্যস্ত ছিলেন তিনি। দরজা ঠেলে নিঃশব্দে তার পি. এ. চেয়ারের ঠিক পেছনটাতে এসে দাঁড়িয়েছিল—স্যার।

পঙ্কজ চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। তার দৃষ্টিতে বিরক্তিটা গোপন থাকেনি।

পি. এ. একটা স্লিপ এর কাগজ হাতে দিয়েছিল। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বসতে বলুন, দেরী হবে। কাগজখানা চোখের সামনে তুলে তাতে লেখা নামটাও পড়েননি তিনি। পড়লেও হয়তো সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারতেন না কারণ এর মধ্যে অনেকগুলো অসাক্ষাতের বছর কেটে গেছে তাঁদের কলেজ জীবনের পর। আপনাদের সাহেব কি রোজই এতক্ষণ ধরে মিটিং করেন? হ্যাঁ—পি. এ. বলেছিল। আপনার স্লিপ আমি দিয়ে এসেছি। উনি ডাকবেন আপনাকে।

ঠায় পনেরো মিনিট বসে থাকার পর উঠে পড়েছিল সন্দীপ। আমার স্লিপটা আপনি সত্যিই হাতে দিয়েছেন?

হ্যাঁ। এখনো তো ডাকছে না, কি ব্যাপাব বলুন তো?

পি. এ. তার ব্যস্ততাকে খুব একটা আমল না দিয়ে বলেছিল, মিটিংটা খুব জরুরী।

আমার দেখা করাটাও খুব জরুরী। পর পর তিনটে সিগারেট শেষ করেছিল সন্দীপ। আপনাদের বুঝি খুব বড় কোম্পানী। পি. এ. বলেছিল—এবছব এ্যানুয়াল টার্নওভার চারকোটি ছাড়িয়ে গেছে। কথাটা বলাব সময় গর্বে পি. এ.-র চোখ দুটো চক্ চক্ কবছিল।

চারকোটি—সন্দীপ সত্যি সত্যি অবাক হয়েছিল এবং তার অবাক হওয়াটা গোপন করার চেষ্টা করেনি। চারকোটি বললেন, তার মানে তো বেশ বড় কোম্পানী। টুকিটাকি কথাবার্তা। একবার কফি আরও একটা সিগারেট এই সবে আরো মিনিট পনেরো কাটার পর উঠে পড়েছিল সন্দীপ। নাহ্ মশাই—আপনাদের এম. ডি. সাহেবকে বলে দেবেন আজ আর দেখা করা গেল না—প্যান্টের ওপর বুশ শার্ট।

পায়ে চপ্পল। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ—পি. এ.-র চেম্বারের বাইরে পা রাখার মুহূর্তে পর্দা সরিয়ে সন্দীপকে পেছন থেকে ডেকেছিলেন, পঙ্কজ—কিরে, চলে যাচ্ছিস কেন, আয়, আয়—। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তোকে। ভেরি সরি। ঘরে ঢুকে সন্দীপ একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করেছিল। ভেবে ঠিক করতে পারছিল না পঙ্কজকে সরাসরি তুই বলবে না তুমি। কলেজে তুই তোকারি চলতো।

পঙ্কজের এই অফিসের ঠাট, তার পোষাক পরিচ্ছদের আভিজাত্য সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন আসেনি এই সব মিলিয়ে সন্দীপ ঠিক করেছিল তুমি সম্বোধনটাই নিরাপদ।

বস্, বস্—নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসতে বসতে আগাগোড়া মোটা কাচ ঢাকা টেবিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সন্দীপের ছায়ার দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ সত্যি সত্যি খুশি হয়েছিল। এবং তার খুশিটাকে প্রকাশ করার জন্য বলে ছিল। তুই একটা স্টুপিড।

আমি—?

হ্যাঁ তুই, এতদিন আসিস নি কেন? বল্ কি খাবি, চা না ঠাণ্ডা?

তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই ফোন তুলে সেক্রেটারীকে আদেশ দিয়েছিল, দুকাপ কফি আর কাজু পাঠান তাড়াতাড়ি।

একটু চুপ করে থাকার পর সন্দীপের মুখের ওপর দুচোখ স্থির করেছিল, কি করছিস, চাকরি?

না।

তাহলে? ব্যবসা?

ধ্যুৎ—ব্যবসা আমার blood এ নেই। আমার চোদ্দ পুরুষের কেউ কোনোদিন ব্যবসা করেনি। ছাড় এসব কথা—পঙ্কজ নিজেই প্রসঙ্গ পাল্টেছিল। কলেজের আর সবাই কেমন আছেরে?

আছে। সন্দীপ গা ছাড়া জবাব দিয়েছিল। মাঝে মধ্যে দেখা হয় দুএকজনার সঙ্গে। সবাই যে যার মতন আছে। কথাটা ভেবে চিন্তে বলেনি সন্দীপ। তবু কয়েক সেকেণ্ড তাই নিয়ে ভেবেছিল পঙ্কজ। সত্যিই মানুষের জীবনটা কি তার নিজের ইচ্ছেমত চলে? চলে না। তার পরিবেশ, তার পরিচয় এবং তার পরিশ্রম তাকে তার জীবনকে চালিত করে।

নিজের উত্তরটাকে নিজেই নাকচ করে দিয়েছিলেন পঙ্কজ—না মানুষের ভাগ্যই মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রা।

কফি এলো সঙ্গে প্লেটভর্তি কাজু।

প্লেটটা তার দিকে ঠেলে দিল পঙ্কজ। বল্লি না তো কি করছিস।

তোমায় বলা হয়নি, সন্দীপ দুটো কাজু তুলে নিল, কলেজের পর আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। এখন ছবি আঁকি, ছাত্রছাত্রীদের ছবি আঁকা শেখাই।

চলে যায় মোটামুটি। চেয়ারে একপাক ঘুরে নিল পঙ্কজ—আজকাল ছবি আঁকার লাইএনও দারুণ পয়সা। হোসেনের কথা ভাব, কি করতো ফার্স্ট লাইফে, পোস্টার আঁকতো।

তাদের কথার মধ্যেই পি. এ. ভদ্রলোক ঘরে এলো একবার, স্যার চেম্বারের লাঞ্চ আছে তাজে।

কখন?

একটায়।

হাত তুলে ঘড়ি দেখল সন্দীপ, একটা বাজতে পনেরো। উঠে পড়ার জন্যে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। বলল, আমি একটা দরকারে তোমার কাছে এসেছিলাম। হাত তুলে পি. এ-কে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে পঙ্কজ বলল, বল্ না, don't hesitate সন্দীপ কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, আমাদের গ্রুপ থেকে একাডেমিতে একটা একজিবিশন হচ্ছে।

গুড। কবে?

এমাসের শেষ দিকে। আমাদের ইচ্ছে কাগজের বিজ্ঞাপনটা তোমাদের কোম্পানী স্পনসর করুক।

করবে, কতো টাকা?

আনন্দবাজার হলে একটু বেশী পড়বে।

কতো বল্ না।

দশের মতো।

কথা না বলে ড্রয়ার থেকে চেক বই বার করেছিল পঙ্কজ। কার নামে চেক দেব।

যাঃ চেক এখনই দিতে হবে না। তোমার কনসেন্ট পেলাম, It is enough for us...থ্যাঙ্কস্ মেনি থ্যাঙ্কস্ from our group. .

তোদের এক্সিবিশনে আমায় যেতে বলবিনে?

বাবে তোমাকে inaguration এর সময় ছাড়াও অন্যদিনও যেতে হবে। সন্দীপকে একটু উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। পঙ্কজ এক কথাতেই তাদের বিজ্ঞাপনটা স্পনসর করতে রাজি হয়ে যাবে তা ভাবে নি সে।

আমি এখন চলি। সন্দীপ উঠে দাঁড়াল। কদিন পরে এসে চেকটা নিয়ে যাবো। তার আগে বিজ্ঞাপনটাতে কি লেখা হবে—ওসব আমাকে দেখানোর দরকার নেই। পঙ্কজ একখানা ফাইল টেনে নিয়ে বলল, যখন ইচ্ছে হবে চলে আসিস, মাঝে মাঝে তোদের কথা, কলেজের কথা খুব মনে পড়ে—সত্যি বলছি—কথার পর লাজুক হাসলো পঙ্কজ।

সন্দীপ দরজার কাছ অবধি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল, পেছনে মুখ ঘুরিয়ে ঘাড় ঝাঁকালো তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

(২)

কালু...কালু... No I said no...খবরদার তুমি সিঁড়িতে উঠবে না...naughty boy...বিন্দি এ্যাই বিন্দি ধর ওকে, ধর্ শীগগির—

বাইরে থেকে সুমিতার দীর্ঘ সংলাপ ভেসে এলো। পঙ্কজ এতক্ষণ যে অতীতের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলেন সেই ঘোর থেকে জেগে উঠলেন এবং তাঁর মনে পড়ে গেল অনেকক্ষণ আগে মেঘনা তাঁকে ব্রেকফাস্ট টেবিলে হাজির হবার জন্যে তাগাদা দিয়ে গেছে।

পঙ্কজ উঠে দাঁড়ালেন।

মাস তিনেক আগে এ বাড়িটার একতলার বসার ঘরে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সকালবেলা প্রতিদিনকার মত ঘর পরিষ্কার করতে ঢুকে চাকর হরিহর সোফার এক কোণায় তিনটি অতিক্ষুদ্র প্রাণীকে দেখে চিৎকার করে উঠেছিল।

এক মুহূর্তের মধ্যে সারা বাড়ি তার চিৎকারের ফলে সেই ঘরে হাজির। তিনটি দুইঞ্চি সাইজের বেড়ালের বাচ্চা। তাদের জন্মের পর বোধহয় একঘণ্টাও কাটেনি। তাদের জন্মদাত্রী উধাও। আশে পাশে কোথাও তার চিহ্নও নেই।

ওগুলোকে বাইরে কোথাও ফেলে দাও—মেঘনা হুকুম দিয়েছিলেন। খেয়াল রেখো মা বেড়ালটা যেন ঘরে না ঢোকে। তাদের বিসর্জনের আয়োজনই চলছিল এমন মুহূর্তে সেখানে পঙ্কজের প্রবেশ, এখানে এত চেঁচামেচি কিসের? তিনটে বেড়ালের বাচ্চা—সুমিতা বেশ উত্তেজিত হবে জবাব দিয়েছিল, মা ফেলে দিতে বলেছেন।

চোখ বুলিয়ে অসহায় প্রাণী তিনটিকে দেখে নিয়ে পঙ্কজ বলেছিলেন, থাক্ না, এখুনি ফেলার দরকার কি? তাঁর মুখ থেকে প্রায় অবিশ্বাস্য কথাটা শোনার পরেও সুমিতার বিশ্বাস হয়নি।

পঙ্কজ বলেছিলেন, তোমাদের কষ্ট করে ফেলার দরকার নেই। ওর মা-ই এসে ওদের এখান থেকে নিয়ে যাবে। এ ঘটনা তিন মাস আগের।

সেই থেকে বাচ্চা তিনটে এখানেই থেকে গিয়েছে। সারাদিন আপন মনে ছোটছুটি করে। নিজেদের সঙ্গে হুটোপাটি করে আর খাবার সময় হলে খাবার ঘরে ঢুকে চুপ করে ফ্রিজের সামনে সার দিয়ে বসে থাকে। বাচ্চাগুলোর ইতিমধ্যে নামকরণ হয়েছে—কন্যাকুমারী, মুংকু আর কালু।

কালু যার নাম তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। ওই কালুটা, যাকে এখন তিনি শাসন করতে শুনলেন সে সুযোগ পেলেই দোতলায় তাঁর ঘরে চলে আসে। তারপর সটান তাঁর কোলে মুখ গুঁজে পড়ে।

প্রথমদিন পঙ্কজ অবাক হয়েছিলেন বেড়ালের বাচ্চাটির এই ব্যবহারে। পরে তিনি বুঝেছেন কালু বুঝে ফেলেছে এই সংসারে তিনিই সেই মানুষ যিনি তাদের

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়ণের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

মেঘনা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বসার পর চেয়ার টেনে বসলেন। অনিরুদ্ধর চান সারা। গায়ে বাইরে যাবার পোষাক।

বেশ কয়েকদিন পর আজ অফিস যাবে সে। এ ক'দিন অফিসের কাজকর্ম কে দেখাশোনা করেছে তা জানেন না পঙ্কজ। জানার ইচ্ছেও নেই তাঁর। তাঁর চোখ সুমিতাকে খুঁজছিল। প্রায় তখুনি তিনি দেখলেন সুমিতা রান্নাঘরের দিক থেকে আসছে। তাব হাতে ট্রেতে কিছু একটা।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে সকলে হাজির থাকবে এই প্রথাটা আপনা আপনি চালু হয়ে গিয়েছে। এ বাড়ির চারজন মানুষের সারা দিনের মতো সেই মুখোমুখি বসা, কথা বলা। অর্থাৎ আলাপন।

এ ক'দিন দেশের বাইরে থাকার জন্যে অনিরুদ্ধ হাজির থাকতে পারেনি। কাল থেকে সুমিতা কদিন থাকবে না। তার বাপের বাড়ি যাবার কথা। সুমিতা কেন বাপের বাড়ি যাচ্ছে মেঘনা তাকে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি এখন কারণটা মনে করতে পারলেন না।

নিঃশব্দে খাচ্ছিল অনিরুদ্ধ। পঙ্কজ আসার পর মুখ তুলে তাঁকে দেখে হাসলো। তার দুহাতে ধরা কাঁটা চামচ থেমে থাকলো এক মুহূর্তের জন্যে। সুমিতা মুখ নীচু করে ডিসে খাবার সাজাচ্ছে। মেঘনার সামনে সন্দেশের বাক্স। মেঘনা তা থেকে দুটো সন্দেশ তুলে অনিরুদ্ধর ডিসে দিল।

ছোটবেলায় মিষ্টিব প্রচণ্ড ভক্ত ছিল অনিরুদ্ধ। পঙ্কজ জানেন না সে এখনো তেমনি মিষ্টি ভালবাসে কিনা। সুমিতা হাতের ডিসখানা তার সামনে রেখে পাশের চেয়ারে বসলো। বলল, বাবা, আমি কাল ক'দিনের জন্যে মার কাছে যাচ্ছি।

এই শহরেরই আর এক প্রান্তে সুমিতার বাপের বাড়ি। বাবা নেই তার। মা দাদা আর বৌদি।

বাবা—সুমিতা বলল, আপনি খাচ্ছেন না কিন্তু।

হ্যাঁ, এই যে—হাতে টোস্ট তুললেন তিনি, ডিম দিয়েছ কেন আমাকে?

সুমিতা নয়, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন মেঘনা, ডাঃ সেন তোমাকে ডিম খেতে বলেছেন। খেয়ে নাও। কোন ক্ষতি হবে না।

আশ্চর্য তাঁর খাওযা না খাওয়ার মধ্যে ডাঃ সেন কোথা থেকে আসেন?

হঠাৎ রাগটা তাঁর মন ছুঁয়ে ফেলাব আগেই অন্য ভাবনায় চলে গেলেন তিনি। মেঘনার দিকে চোখ রেখে বললেন, ওগুলো খেয়েছে?

ওগুলো—অর্থাৎ বেড়ালেব বাচ্চা তিনটে।

মেঘনা বললেন, ওদের নিয়ে তোমায ভাবতে হবে না; তুমি খাও।

অনিরুদ্ধ প্রায খাওয়া শেষ করে এনেছে। খাবারের ডিস ঠেলে চায়েব কাপ

টেনে নিয়েছেন এখন।

অফিসটা একটু রিনোভেট করবো ভাবছি—অনিরুদ্ধ চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে চারপাশে তাকালো, রিসেপশন্‌টা কি ধরনের হবে তুমি বলবে,

কথাটা যে মেঘনাকে বলা তা কারুর বুঝতে দেরী হলো না। মেঘনা বললেন, আমি, না না আমাকে আর এসবের মধ্যে টানিসনে।

আমি একটা ইনটিরিয়র ডেকরেটার ফার্মের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা শিগগিরই আসবে।

তাদেরই তোর রিসেপশনের একটা ডিজাইন করে দিতে বলিস—

বলেছি। তাও তুমিও ওটার ডিজাইন করে দেবে। অনিরুদ্ধ উঠে পড়লো। যাচ্ছি বাবা। রাত্তিরে ক্লাব হয়ে ফিরবো। অনিরুদ্ধ চলে যাবার পর পঙ্কজের মনে হলো, তাব শেষ কথাটা সুমিতার উদ্দেশ্যে বলা। এই লুকোচুরির ব্যাপারটা জীবনের একটা সময় সব নবদম্পতিই খেলে থাকে। কিন্তু তাঁরা, তাঁরাও তো একটা সময়ে নবদম্পতি ছিলেন, তারুণ্য তাঁদেরও তো সময়ে অসময়ে বিচলিত করতো— কিন্তু কখনো মেঘনার সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

হাতের টোস্ট নামিয়ে রাখলেন পঙ্কজ—এখন আর কাউকে দোষী ভাবতে ইচ্ছে করেনা। ইচ্ছে করে না নিজেকে বিচারকের আসনে বসাতে।

এখন নটার কাছাকাছি।

ইস্। ডিস ঠেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন পঙ্কজ। বললেন কাল থেকে আমাকে আর টোস্ট দিও না।

শক্ত হয়েছে বুঝি। মেঘনার দুচোখে তিরস্কার ফুটে উঠলো, অপদার্থ সব, ভালো করে রুটিটাও সেঁকতে পারে না, মেঘনাও উঠে পড়লেন। সুমিতা খাবারের ওপর থেকে হাত তুলে নিয়েছে।

টোস্ট ঠিক আছে। পঙ্কজ বললেন, আসলে এ সব এখন আর আমার ভালো লাগে না।

বাইরে কোথাও যাচ্ছো?

পেছন থেকে মেঘনা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

না, যেতে যেতে বললেন পঙ্কজ, নীচে, বাগানে। নতুন গাছগুলো লাগানোর সময় মালি বলেছিল আমাকে থাকতে—সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে আবার ফিরে এলেন তিনি, তারপর মেঘনার চোখে চোখ রেখে বললেন, কাল সন্দীপের চিঠি এসেছে।

কথাটা শেষ হবার পর একমুহূর্ত আর সেখানে দাঁড়ালেন না পঙ্কজ। পেছন ফিরে চলতে চলতে বুঝতে পারলেন মেঘনার সমস্ত চেতনা অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে দগ্ধ পাথরে পরিণত হয়েছে। তার দুচোখে এক মুহূর্ত আগেও যে অহংকার দপ্ দপ্ করছিল এখন তা মৃত মানুষের চোখের মত বিবর্ণ, বর্ণহীন।

(৩)

আপনার সাহেব কি আজও জরুরি মিটিং করছেন? সন্দীপ ঘরে ঢুকে বলার আগেই চেয়ার টেনে বসেছিল, আজ আমি সময় হাতে নিয়ে এসেছি। ডোন্ট ওয়ারি।

পি. এ. ভদ্রলোক চিনতে পেরেছেন সন্দীপকে। বললেন, বসুন। সাবেহ ঘরে নেই।

নেই?

এখুনি এসে পড়বেন।

বাঁচালেন মশাই। সন্দীপ সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত ঢোকালো। আপনার সিগারেট চলে নাকি?

না।

বেঁচে গেছেন মশাই। সন্দীপ আরো কি বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ঘরে ঢুকলো পঙ্কজ তার সঙ্গে দুজন বিদেশিনী। তার দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ পি. এ-কে বললেন, এরা দুজন এখন হোটেলে যাবেন, আপনি পৌঁছে দিন। বিকেলে বেলুড় মঠ আর কেথায় কোথায় যেন যাবার কথা আছে, গাড়ি টাড়ি যা ব্যবস্থা করার করবেন ঠিকমতো। আয় সন্দীপ। ঘরে ঢুকে সন্দীপ বসার আগে বলল, এই গ্রেট গার্বোর মত মেয়েটা কে?

ওই তো, এসেছে ওরা, ব্যাপারটাকে গলার স্বরে অনেকখানি গুরুত্বহীন করে পঙ্কজ বললেন, ছাড়, তোদের এক্সিবিশনের কথা বল্। কতটা এগোলো?

নেক্সট সাতাশে। বিকেল পাঁচটায় ওপেনিং মানে প্রদীপ জ্বালানো, শাখটাখ বাজানো, সব প্রেসকে ডেকেছি—

আমার কোম্পানীকে কি যেন করতে হবে বলেছিলি—

দ্যাখ, আসল কথাটাই তোমাকে বলিনি, আমাদের এ্যাড পরশু বেরিয়ে যাচ্ছে, তোমার কোম্পানীব নাম থাকবে তাতে as sponsorer...

চেক নিবিনে?

বারে, সেইজন্যেই তো এসেছি। দশ নয় আট হলেই হবে। কাগজগুলো এসব ব্যাপারে একটু কনসেসন্ দেয়।

প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে কাকে ম্যানেজ করলি?

বাঃ দারুণ বললে তো, সন্দীপ কাচের টেবিলের ওপর আঙ্গুলের নাচ থামিয়ে বলল, লেডি রাণু, সিইজ অলটাইম গ্রেট ফর আস। শুনেই রাজি হয়েছেন। তোর কোম্পানী হেল্প করছে তাও বলেছি ওনাকে। আমি কিন্তু পাবলিসিটি চাইনি, শুধু তোর বন্ধুত্বের খাতিরে—

সন্দীপ তার মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে বসলো, বলল, ডোন্ট মাইণ্ড,

অতো ভেবে বলিনি কথাটা। যাই হোক, তোমাকে থাকতে হবে কিন্তু। সাতাশে ঠিক পাঁচটায়।

চেষ্টা করবো। চেকে সই করতে করতে মুখ না তুলে পঙ্কজ বললেন, কতগুলো ছবি থাকবে?

চল্লিশখানা। তারমধ্যে বারোখানা তেলরং।

ছবি আমি একদম বুঝিনে, চেকটা সন্দীপের দিকে বাড়িয়ে দিলেন পঙ্কজ। যে ছবিটা আমার চোখ টানে সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে ভালো ছবি।

তার মানে ছবি দেখার চোখ আছে তোমার, সন্দীপ উত্তরের জন্যে তাকিয়ে থাকলো না, চেকখানা ঝোলা ব্যাগে পুরতে পুরতে বলল, অনেকগুলো ভালো ছবি পেয়েছি আমরা। আশা করছি, বেশ কিছু ছবি বিক্রি হবে। কফি আসার আগেই উঠে পড়লো সন্দীপ, তোমাকে কি আবার সাতাশ তারিখের কথাটা মনে করিয়ে দিতে হবে?

No, never. আমার মনে থাকবে।

সন্দীপ চলে যাবার পর পঙ্কজের মনে হলো বোধহয় দুদিন দাড়ি কাটেনি সে। খুব পরিশ্রম হচ্ছে তার দেখলেই বোঝা যায়।

বন্ধুত্বের আনন্দ নয় কেমন একটা মায়ায় পঙ্কজের মনটা কর কর করে উঠেছিল। সন্দীপ কলেজে যেরকম বাউণ্ডুলে ছিল তেমনই রয়ে গেল।

(৪)

কদিন পর।

সকাল থেকেই সারাদিন ধরে একটা ভাবনা পঙ্কজের মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল— কোথায় যেন তাঁকে যেতে হবে। কোনো একজনকে তিনি কথা দিয়েছেন যাবেন বলে কিন্তু কোথায় যেতে হবে তা কিছুতেই মনে আসছে না।

সুশীলবাবু—

পি. এ. ঘরে এলেন, ডাকছেন স্যার—

হ্যাঁ, আমার ডাইরীটা দেখুন তো কোথায় কি প্রোগ্রাম আছে।

সুশীলবাবু এনগেজমেন্ট ডাইরী দেখে পর পর সাতদিনের কোথায় কোথায় তাঁকে যেতে হবে, কেন যেতে হবে সব বিস্তারিত জানিয়ে দিলেন।

নাহ্—মনে মনে নিজেকে বললেন পঙ্কজ, "হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা। অন্য কোনখানে"—

কবিতার লাইনটা ঠিক সময়ে মনে পড়ে যাওয়ায় খুশি হলেন, মনটা নিরস রংহীন একটা হিসেবের খাতার পৃষ্ঠা হয়ে যায়নি এখনো—

কলেজে আবৃত্তি করতেন। কবিতা গল্প নিয়ে মাতামাতিও কম করেন নি। আর পাঁচজন ছাত্রের মতো।

এখন সে সব মনে হয় কোনো এক জন্মের ঘটনা, যাকে পঙ্কজ কোনদিন আর ফিরে পাবেন না। বিকেলে অফিস ছুটির পর বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল তাঁর একাডেমিতে ছবির এক্সিবিশনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু সেতো সাতাশ তারিখে, আজ একত্রিশ। সাতাশ তারিখটা চারদিন আগে অতীত হয়ে গেছে।

সন্দীপও তাকে আর ফোন করেনি। বুঝতে পারলেন অভিমান হয়েছে তার। হওয়াই স্বাভাবিক। সন্দীপ বার বার বলেছিল আবার মনে করিয়ে দেবে কিন্তু তিনিই বলেছিলেন তার দরকার নেই। এতবড় একটা কোম্পানী চালাতে হয়, অতো ভুলো মন নিয়ে চালানো দুঃসাধ্য। কিন্তু তাই ঘটলো।

একাডেমি অপরিচিত জায়গা নয়।

ছুটির পব গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললেন—একাডেমিতে চলো একবার।

গাড়িতে আসতে যেটুকু সময় লাগলো পঙ্কজের তার সবটুকুই সন্দীপের ভাবনা জুড়ে থাকলো। কলেজে সন্দীপ ক্রিকেট খেলতো। নাটক করতো। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দল করে হৈ হৈ করে এক্সকার্সানে যেত, কিন্তু কোন দিন কেউ ভাবতেও পারেনি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করবে সে। সেটাই তার পেশা হবে।

আশ্চর্য-পঙ্কজ কলেজে ঢোকার আগেই অনেক আগে থেকেই নিজের ভবিষ্যতের কথা জানতেন। বাবার অবর্তমানে কারবারের হাল ধরতে হবে তাঁকেই। তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সেদিন থেকে সন্দীপ তাঁর মতো প্যারাসাইট হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। নিজের ভবিষ্যত নিজের ভাগ্য সব কিছুরই নিয়ন্ত্রা সে নিজে।

(৫)

ডানদিকের হল জুড়ে ছবির প্রদর্শণী সাজানো হয়েছে। ঘরটায় ঢুকে পঙ্কজের মনে হলো ভিড় বেশ ভালোই আছে। নিছক ছবি দেখার জন্যে এত মানুষের আগমন ভাবাই যায় না।

এখনকার মানুষ ছবি থেকে এডস্ সব কিছুই জানতে চায়। কোন কিছুতেই তার অনীহা নেই। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে সন্দীপকে কেথাও খুঁজে পেলেন না। পঙ্কজ উল্টে আর একটা সমস্যার মুখোমুখি হলেন তিনি—হলে কারা দর্শক আর কারা আর্টিষ্ট অথবা উদ্যোক্তা তা বুঝতে পারলেন না। সবাই বেশ গম্ভীর গম্ভীর মুখ করে ছবির সামনে দিয়ে পাক দিয়ে যাচ্ছে। দুতিনটে ছোট্ট দল হলের মাঝখানে নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মেতে আছে। তাদেব আলোচনার প্রসঙ্গ ছবিই কিনা কে জানে।

একখানা ছবিব সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ছবিটার বিষয় বস্তু গ্রামের

সকাল। আদিগন্ত আকাশে সূর্যের আভাসে নতুন দিনের সূচনা। চালাঘর, ধানের মাড়াই, কলাগাছের ছায়ায় শালিকের জটলা। ছবির নিচে আর্টিষ্টের নামটা পড়তে চেষ্টা করে বিফল হতে হলো। ছবিখানা যতো সহজ নামটা ততই দুর্বোধ্য। পাশের ছবিখানার দিকে এগিয়ে যাবার আগেই একটি যুবতী তাঁর সামনে এগিয়ে এলো, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

সাহায্য—। সাহায্য কেন?

মেয়েটি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গলায় বলল, ছবি মানে ওপরে যেটুকু আপনি দেখছেন সেটাই আসল ছবি নয়।

তাহলে?

এই যেমন ধরুণ এই ছবিখানা, এতে শিল্পী—আপনি বুঝি নিজেও ছবি-টবি আঁকেন।

শুধু ছবিই আঁকি, টবি আঁকিনে।

তার কথা বলার ধরণে হেসে ফেললেন পঙ্কজ। বললেন, সন্দীপ কোথায় বলতে পারেন?

সন্দীপদা, আপনি সন্দীপদাকে চেনেন বুঝি?

সামান্য। একবার এই রকমই একটা এগজিবিশনে পরিচয় হয়েছিল।

ও, মেয়েটি বোধ হয় তাঁর কথায় আশাহত হলো। সামান্য স্তিমিত গলায় বলল। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি সন্দীপদা কোথায় গিয়েছেন খবর নিয়ে আসছি।

পঙ্কজ ভেবেছিলেন সন্দীপকে সারপ্রাইজ দেবেন। সে নিশ্চয় ধরেই নিয়েছে তিনি আর তাদের এগজিবিশনে আসবেন না। কাল শেষ দিন।

এদিক ওদিক তাকালেন তিনি—"ধূমপান নিষেধ" লেখা কোন বোর্ড চোখে পড়লো না। পকেটে হাত পুরে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেও আবার রেখে দিলেন পঙ্কজ। দেখতে পেলেন মেয়েটি তার দিকেই আসছে।

তাঁতের শাড়ি পরেছে মেয়েটি। তার গায়ের শ্যামলী রং-এর সঙ্গে শাড়ির রংটা অদ্ভুত সুন্দর ম্যাচ করেছে। বেশীর ভাগ মেয়েই জানেনা কোন রং-এ তাকে বেশী মানায়।

মার কথা মনে পড়লো পঙ্কজের। শাদা ছাড়া অন্য কোন রং-এর শাড়ি কখনো পরতে দেখেননি তাঁকে। মেয়েটি কাছে এসে বলল, সন্দীপদা মেঘনাদির সঙ্গে বেরিয়েছে কোথায় গিয়েছে বলে যায়নি। কিছু বলতে হবে সন্দীপদাকে? না পঙ্কজ পা বাড়ালেন, আপনাদের প্রদর্শনী তো কালই শেষ।

হ্যাঁ।

ছবি বিক্রি হয়েছে?

ন'খানা, মেয়েটির মুখ এই মুহূর্তে হিরের কুচির মতো আলোকময়। মেঘনাদির তিনখানা ছবি বিক্রি হয়েছে। আর আপনার?

একখানাও না—। হাসছে মেয়েটি। তার ব্যার্থতার দুঃখটা কোথাও ছায়া ফেলতে পারেনি।

উনি বুঝি খুব ভালো আঁকেন? মেঘনাদির কথা বলছেন? দারুণ। আমাদের গ্রুপে মেঘনাদিই সব চেয়ে ট্যালেন্টেড। রুশিমোদি বলেছেন, মেঘনাদি সোলো এগজিবিশন করলে ওনার কোম্পানী স্পনসর করবে।

বাঃ, এতো খুব বড় খবর। পঙ্কজ বললেন, আপনাদের গ্রুপের পক্ষে inspiring.

মেয়েটি বলল, কিন্তু তা হবে না জানেন।

কেন, হবে না কেন?

সন্দীপদা রাজি নয়। সন্দীপদা বলেন, গগাঁ, সেখাঁন, পলগগ্, কোনদিন স্পনসরের পেছনে দৌড়োননি বলেই কালজয়ী শিল্পী হতে পেরেছিলেন।

সেঁজান, গগাঁ—এরা বুঝি সব

সেকি আপনি সেঁজানের নাম শোনেননি, গগাঁর নাম শোনেন নি—?

না—, অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার করে নিলেন পঙ্কজ। মেয়েটি কি একটা বলতে গিয়েও তা না বলে দরজার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় সন্দীপকে দেখাল।

ঐতো এসে গেছেন।

সন্দীপ ঘরে ঢুকেই পঙ্কজকে দেখেছে। তাদের দিকেই এগিয়ে এলো। তার চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস, তাহলে সত্যিই এলে?

বলেই ছিলাম তো আসবো।

আর তর্কাতর্কিতে না গিয়ে সন্দীপ বলল, কফি খেয়েছ? না।

সুব্রতা। আমাদের একটু কফি খাওয়াবে নাকি?

সন্দীপ পঙ্কজের এতক্ষণের সঙ্গিনী মেয়েটিকে বলল। তার নাম সুব্রতা এই প্রথম জানলেন পঙ্কজ।

—বললেন, কফি পরে খেলেই হবে, আগে ছবি দেখি।

—না, আগে কফি খেয়ে নাও, তারপর ছবি দেখো। ততক্ষনে মেঘনা এসে যাবে।

পঙ্কজ বুঝতে পাবলেন না মেঘনা মেয়েটির আমার সঙ্গে তাঁর ছবি দেখার কি সম্পর্ক।

তাহলে তোর মিশন সাকসেসফুল্ বল?

একখানা ছবির দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বললেন পঙ্কজ, শুনলাম ন'খানা ছবি বিক্রি হয়ে গেছে। আমরা আর একটু বেশী আশা করেছিলাম, সন্দীপ বলল, খানকুড়ি বিক্রি করতে পারলে আমাদের সমস্যাটা মিটতো।

কি সমস্যা তা জানতে চাইলেন না পঙ্কজ। মুখোমুখি ছবিখানার সামনে গিয়ে বললেন, এখানা কি বিক্রি হয়ে গিয়েছে?

না। আমি নিতে পারি এখানা।

বেশ বড় সাইজের তেল রং-এর ছবি। ছবির বিষয় বস্তুও খুব আকর্ষণীয়। অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে বৃত্তের মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথার ওপর প্রখর পূর্ণ সূর্য। মানুষগুলো কিছু একটা বলতে চায়। তাদেব চোখ বা মুখ কি বলতে চায় তারা? নিশ্চয় সেই শাশ্বত বাণী এগিয়ে যাবার কথা।

ছবিখানা পছন্দ হয়েছে তোমার?

সন্দীপের প্রশ্নের জবাবে পঙ্কজ ঘাড় নাড়লেন। কতো দাম ধরেছ ছবিখানার?

পাঁচ হাজার, সন্দীপ বলল, এ ছবি নিয়ে কি করবে। ড্রইংরুমে রাখবে?

না, আমার আফিসে, রিশেপসনে। মানাবে না? আইডিয়াল প্লেস, সন্দীপ আইডিয়াল শব্দটাকে উচ্চারণের আগে দাঁতে চেপে নিল, আমরাও তাই চাই, অবিরাম মানুষের মিছিলের সামনে থাকুক এই ছবিখানা।

এগিয়ে গিয়ে ছবিখানার সামনে দাঁড়ালেন পঙ্কজ। ছবির নীচে গোটা গোটা অক্ষরে শিল্পীর নাম লেখা, মেঘনা।

ছবিখানার আর্টিষ্ট এখানে নেই?

ওর এতক্ষণ এসে যাবার কথা, সন্দীপ বলল বোধহয় সমরের কণ্ডিশন ডিটোরেট করেছে। আপন মনে শেষ কথাগুলো বলার পর সন্দীপ আবার সহজ হলো। বলল, আমাদেরই গ্রুপের একজন হাসপাতালে আছে। মেঘনা আব আমি দুজনই তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, ও বলল একটু পরে আসছে।

কি হয়েছে?

ক্যান্সার—।

পঙ্কজ অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না।

(৬)

একাডেমির বাইরের আকাশে রাতের জমাট অন্ধকার। বিদ্যাসাগর সেতুর মাথায় লাল আলোর বিন্দুগুলো আকাশের ললাটে টিপের মত দেখাচ্ছে। এ অঞ্চলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে ঘিরে একটা ঘন সবুজেব স্নিগ্ধ অস্তিত্ব। অবিরাম গাড়ির মিছিলে শব্দহীন গতির অহঙ্কার। পঙ্কজ গাড়িতে ওঠার আগে সন্দীপ বলল, ছবিখানা পরশুই তোমার অফিসে পৌঁছে যাবে।

পঙ্কজ বললেন, পরশুর আগেই কাউকে পাঠালে তার হাতে দামটা দিয়ে দেব।

তার কথা বলার ধরনে হেসে ফেলল সন্দীপ, কেন আমরা তোমায় বলেছি নাকি আগাম টাকা না পেলে ছবির ডেলিভারী দেওয়া হবে না—।

পঙ্কজ কোনো কথা বললেন না, আস্তে করে তার সন্দীপেব হাত চেপে ধরলেন, তারপর ড্রাইভারকে বললেন, চলো।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে দাঁড়ালেন পঙ্কজ। দেখলেন সিঁড়ির শেষ ধাপে কালু গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। তাঁর পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। কালুর চোখ দুটো নীলচে। সব সময় বিষণ্ণ হয়ে থাকে কালু। কালু কি বুঝতে পারে তার গায়ের রংটার জন্যেই সবাই তাকে ঘেন্না করে, এড়িয়ে চলে। কালুতো জানে না মানুষের এই কুসংস্কারের শিকার একা সেই নয়। মানুষ কালো মানুষকেও ঘৃণা করে। মানুষের সৃষ্টি থেকেই এটা চলে আসছে।

হেঁট হয়ে কালুর মাথা ছুঁয়ে একটু আদর করলেন পঙ্কজ, তুই দুঃখ করিসনে কালু। আমার গায়ের রং ফর্সা হয়নি বলে ছোট বেলায় আমাকেও ঠাকুমা কোলে নিতে চাইতেন না।

স্যার—

বলুন সুশীলবাবু—

একখানা বড় ছবি ডেলিভারী দিয়ে গিয়েছে। ছবিখানা যারা এনেছিল তারা বলতে পারলোনা কে পাঠিয়েছে। অফিস এখনো ভালো করে শুরুই হয়নি। সবে দশটা। গোটা পাঁচতলার পাঁচহাজার স্কোয়ার ফুট জুড়ে তাঁর অফিস। বাবার দূরদৃষ্টি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। চল্লিশ বছর আগে এই অফিসের জায়গাটা কেনার জন্য পাঁচলাখ টাকা খরচা করেছিলেন এখন পাঁচ কোটিতেও যা পাওয়া যাবে না। সেই আমল থেকে যা চলে আসছিল তার সামান্যই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন পঙ্কজ যার ফলে একটা পুরনো আমলের ছাপ এখনো লক্ষ্য করলে দেখা যায়। শুধু অফিসে ঢুকেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে আধুনিক কায়দার রিসেপশন, তাঁর ঘর খানা আর বোর্ডরুমেও নতুনত্বের ছোঁয়া।

সুশীলবাবু অনেক বছর ধরে তাঁর পি. এ-এর পদে বহাল আছেন। মনিবের ইচ্ছে অনিচ্ছে সব কিছু তিনি শুধু ইশারাতেই বুঝে ফেলেন।

কিন্তু আজকের মতো ছবির ঝামেলায় আগে কখনো তাঁকে পড়তে হয়নি।

পঙ্কজ প্রশ্ন করলেন, ছবিখানা দেখেছেন?

না, এখনো প্যাক খোলা হয়নি।

বিশুবাবু এসেছেন?

না।

বিশ্বনাথ দাস এ কোম্পানীর অ্যাড মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কাম পি. আর. ও.। বছর পাঁচেক আগে জয়েন করেছিলেন এখানে। এখানেই থেকে গিয়েছেন। পঙ্কজ জানেন, বিশ্বনাথ তাঁব কোম্পানী চেড়ে গেলে তার কাজের অভাব হবে না। তার কারণ নির্ভর করার মতো কাজের লোকের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। কিন্তু বিশ্বনাথের এ কোম্পানী না ছাড়ার কারণটা অন্য।

বছব তিনেক আগে বিশ্বনাথের স্ত্রীর গলায় হঠাৎ ক্যানসার ধরা পড়েছিল।

বিশ্বনাথের মনে হয়েছিল তার জীবনের অন্তিম সময় উপস্থিত। পব পর তিনদিন অফিসে না আসায় সুশীলবাবুকে তার বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন পঙ্কজ।

সুশীলবাবু ফিরে এসে বলেছিলেন, স্যার, যা দেখে এলাম তা আপনাকে বলতে পারবো না।

আঃ ছেলেমানুষী করছেন কেন, বলুন কি হয়েছে?

একটু সময় নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন সুশীলবাবু। তারপর বলেছিলেন, বিশ্বনাথবাবু, তার স্ত্রী আর ছেলেটা আজই বোধহয় বিষ খেয়ে সুইসাইড কববে।

সেকি, কি হয়েছে তাঁর, ফোন করুন। শীগগির পুলিশকে ফোন করুন।

না স্যার। দয়া করে ফোন করবেন না। ওদের মরে যাওয়াই ভালো। পুলিশ এলেও ওদের বাঁচাতে পারবে না।

পঙ্কজ কিছু না বুঝেই ভয়ংকর চিৎকার করে উঠেছিলেন, you are a stupid fellow—যান আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যান। আমি নিজেই বিশ্বনাথের বাড়ি যাচ্ছি।

ঠিক একঘণ্টা পর বিশ্বনাথের বাড়ি থেকে ফিরে তিনি যখন অফিসে ঢুকছিলেন তখন একদম অন্য মানুষ। ঝড়ে ভাঙ্গা বিভ্রান্ত একটা বোবা প্রাণীর মত।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মনের সব ভয় ও বিভ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পঙ্কজ। বোম্বের ব্রাঞ্চ অফিসে জরুরী মেসেজ পৌঁছে গিয়েছিল বিশ্বানাথের স্ত্রী সেখানে পৌঁছনোর অনেক আগেই। রাতে বাড়িতে ডিনাব টেবিলে বসে বোম্বের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বালা সুব্রাহ্মনিয়ামের পাঠানো ম্যাসেজ পেয়েছিলেন—Biswanath's wife got admitted in Tala hospital এর ঠিক দুমাস পরে একদিন ঠিক অফিস ছুটির আগে সুশীলবাবুকে ডেকে পঙ্কজ বলেছিলেন, আজ রাতে চেম্বারের ডিনার আছে না?

হ্যাঁ স্যার আছে। গ্র্যাণ্ডে।

ওদের ফোন করে জানিয়ে দিন আমি যেতে পারবো না। আর ঐ সঙ্গে আপনার বাড়িতেও খবর দিয়ে দিন আপনার ফিরতে রাত হবে।

সুশীলবাবু নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি।

চারটে থেকে পাঁচটা, পাঁচটা থেকে ছটা, সাতটা--

এর মধ্যে সমস্ত অফিস জনশূন্য। শুধুমাত্র পঙ্কজের ঘরে ফাইলেব স্তূপে মুখ ডুবিয়ে বসে আছেন তিনি। সুশীলবাবু দুবাব দরজার সামনে এসে সেখান থেকে নিঃশব্দে ফিরে গিয়েছেন।

ঠিক সাতটা তিরিশে ফাইল থেকে পঙ্কজ মুখ তুলেছিলেন।

সুশীলবাবু।

স্যার--

এয়ারপোর্টে ফোন করে খবর নিন্ বোম্বের ফ্লাইট লেট আছে কিনা।

আচ্ছা স্যার।

ফ্লাইট রাইট টাইম আছে শুনে পঙ্কজ উঠে পড়েছিলেন, চলুন চলুন তাড়াতাড়ি, আঃ দেরী করছেন কেন। গাড়িতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সুশীলবাবু, গাড়ির সামনের সিটে মস্ত বড় একটা ফুলের তোড়া বেশ যত্ন করে শোয়ানো আছে।

কে আসবে স্যার বোম্বে থেকে, কোনো ফরেনার?

না।

তাহলে?

ছুটন্ত গাড়ির বাইরে চোখ রেখে শান্ত গলায় পঙ্কজ জবাব দিয়েছিলেন, বিশ্বনাথের স্ত্রী, আরতি।

ভাল হয়ে গিয়েছে?

তার কথাটা বোধহয় কানে যায়নি পঙ্কজের। অথবা অন্য কোন দুরহ চিন্তা তাঁর মনকে গ্রাস করেছিল।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে প্লেনটা বিশাল একটা বাজ পাখীর মত ধারালো ডানায় রাতের অন্ধকারকে ছিন্ন ভিন্ন করে রানওয়ের ওপর নেমে এলো।

খানিক পরে সুশীলবাবু দেখতে পেলেন প্লেনে লাগানো সিড়ি বেয়ে বিশ্বনাথ নেমে আসছে। তাদের কাছে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো বিশ্বনাথ।

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তার কান্না দেখলেন পঙ্কজ। তারপর খুব ধীর শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন। কোথায়?

বিশ্বনাথ হাত তুলে একদিকে দেখাল।

সুশীলবাবু দেখলেন চারজন মানুষ একটা কফিন প্লেনটার পেছনের দিক থেকে নামিয়ে একটা গাড়িতে তুলছে।

(৮)

স্যার আমায় খুঁজছিলেন?

বিশ্বনাথ। সাদা সার্ট, ফুলহাতা। আকাশী রং এর টাই। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত করে কামানো।

পঙ্কজ বললেন, একজিবিশন থেকে আমাদের রিসেপশনে টাঙ্গানোর জন্যে একখানা ছবি কিনেছি। ওটা টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করো।

বিশ্বনাথ নিরুত্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় তক্ষুনি ফিরে এলো, দারুণ ছবি স্যার, শুধু ফ্রেমটা পাল্টাতে হবে। একজিবিশনওলারা একটা কমদামী ফ্রেম দিয়ে দিয়েছে।

দুদিন পর অফিসে ঢুকে পঙ্কজ দেখলেন সন্দীপ তাঁর ঘরে বসে আছে তার সঙ্গে একটি যুবতী।

আমরা এলাম ছবিটা কোথায় টাঙ্গিয়েছ দেখতে, সন্দীপ বলল, তাছাড়া যার ছবি কিনেছ সেই আর্টিস্টকেও সঙ্গে এনেছি তোমার সঙ্গে আলাপ করাবো বলে।

অর্থাৎ এই মেয়েটিই মেঘনা।

পঙ্কজের দৃষ্টি তার মুখের ওপর দিয়ে একটুও না থেমে ঘুরে এলো। দুটো ভ্রুর মাঝখানে ছোট্ট কালো একটা টিপ। মুখের আদলে চাপা একটা অহংকারের মতো কিছু, কিন্তু সেটা এতই ক্ষীণ গ্রাহ্য যে না করলেও চলে।

ফর্সা। হ্যাঁ ফর্সাই—। পরনের হলুদ রং এর শাড়ির জন্যেই রংটা আরো উজ্জ্বল দেখোচ্ছে। কাচের টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখা নিশ্চল হাত দুখানা ভীষণ বাঙময় মহুয়া—পঙ্কজ হাসলেন।

সন্দীপ বলল, ও আর সমর আমাদের গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে ট্যালেণ্টেড। তুমি তো সেদিন ওর আরো ছবি দেখেছ?

পঙ্কজ উত্তরে ঘাড় নাড়লেন।

ওর তুলিতে শুধু ছন্দ নয় একটা সাহসও আছে। সন্দীপের গলায় উচ্ছ্বাস, আমরা যারা ছবি আঁকি তারা সবাই কিন্তু সাহসী হতে পারি৺ গতানুগতিক ধারাকে—

পঙ্কজ বলে উঠলেন, দোহাই সন্দীপ, ছবির ব্যকরণ আমি একদম বুঝিনে। প্রোডাকশনের কথা বল, অথবা ডলারের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান কারেন্সির—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মেঘনা বলে উঠলো, ছবি বোঝেন না তাও অত টাকা দিয়ে ছবি কিনে আনলেন?

আপনার ছবিখানা খুব ভালো গেলে গেল তাই কিনে ফেললাম। আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার বিশ্বনাথেরও ছবিখানা খুব পছন্দ হয়েছে। মেঘনা বলল, সেদিন আমি ওখানে উপস্থিত থাকলে কিছুতেই আপনাকে আমার ছবি বিক্রি করতাম না।

ভাগ্যি আপনি ওখানে ছিলেন না। থ্যাংক গড্, নিন্ কফি খান। মেঘনার গলায় যেটুকু বেসুর বাজলো তাকে আমল দিল না পঙ্কজ।

সন্দীপ বলল, এই মেঘনা, খবরদার ঝগড়া করবে না। তুমি আসতে চেয়েছিলে বলেই এসেছি কিন্তু। পঙ্কজ, ছবিখানা কোথায় লাগিয়েছে চলো দেখে আসি আগে।

পঙ্কজ বললেন, দাঁড়া, আগে দেনা শোধ করি। কার নামে চেক হবে?

মেঘনা, সন্দীপ বলল, মেঘনা চৌধুরী। তোমার চারখানা ছবি বিক্রি হয়েছে আমাদের একদিন খাওয়াবে না?

মেঘনা বলল, কবে খাবেন বলুন, আমি রাজি আছি। পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা করো, ও ব্যস্ত লোক। ওর কবে সময় হবে। ব্যাপারটা যে সন্দীপ সরাসরি তার ওপর

চাপিয়ে দেবে তা ভাবেনি মেঘনা। সামান্য বিব্রত দেখাল তাকে। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে বেশী সময় নিল না।

তার আগেই পঙ্কজ বলে উঠল, বারে, আমি আবার কেন? আমি হচ্ছি ছবির খদ্দের। না ব্রাদার আমাকে বাদ দাও।

সন্দীপ আড় চোখে মেঘনাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, তুমি আসলে আমাদের ভয় পাচ্চো পঙ্কজ। ভাবছো, এই সব বাউণ্ডুলে ছবি আঁকিয়েদের পাল্লায় পড়লে তোমার ব্যবসা লাটে উটে যাবে। তোমার ভয় নেই, রং টং নিয়ে আমরা পাগলামি করলেও তোমার জগতটা তোমার কাছে কতটা important তা আমরা বুঝি।

আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে যাচ্ছে দেখে পঙ্কজ প্রস্তাব দিলেন, আর এককাপ করে কফি হোক।

আমরা এখন উঠছি, তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে মেঘনা। তার মুখে কোনো ভালো না লাগার চিহ্ন নেই তবু পঙ্কজের মনে হলো, তাঁর অফিস এবং তাঁকে মেঘনার পছন্দ হয়নি। সম্ভবত তাঁর ঐশ্বর্য এবং উদারতাই এই অপছন্দের কারণ। এর আগেও অনেককে দেখেছেন পঙ্কজ যারা কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পছন্দ করেনি। সব মানুষ বোধহয় ভালো জিনিসটাকে সহ্য করতে পারে না।

সন্দীপ আর মেঘনা চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ কাজে মন দিতে পারলেন না পঙ্কজ। একসময় তাঁর মনে হলো, মেঘনার মধ্যে এইটুকু বিরোধের উত্তাপ না থাকলেই সে খুব সাধারণ হয়ে যেত এবং সেই অতি সাধারণ নারীটিকে নিয়ে তিনি কিছুতেই দ্বিতীয়বাব ভাবতে পারতেন না।

(৯)

মাটিতে ছায়া পড়তে পেছনে মুখ ফিরিয়ে পঙ্কজ দেখলেন মেঘনা দাঁড়িয়ে আছেন। ওপর থেকে কখন বাগানে নেমে এসেছেন মেঘনা তা তিনি জানতেই পারেন নি।

এক জায়গায় অনেকগুলো টিউলিপ ফুটেছে। তার পাশে ডায়াস্থাসের নতুন পাতাব আড়ালে কুঁড়ির আভাস।

পঙ্কজ হাত বাড়িয়ে মাটি থেকে একটা ঘাস তুললেন। তারপর বললেন, তুমি কিছু বলবে?

হ্যাঁ। বৌমা বাপের বাড়ি যাচ্ছে।

সেতো শুনেছি।

কেন যাচ্ছে জানতে চাওনি কিন্তু।

বারে, সে তো তুমি জানবে।

না, এটা তোমাবও জানা দরকার।

কি হয়েছে বলো, anything wrong?

ওরা ঠিক করেছে বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলবে।

মাটির ওপর একসার লাল পিঁপড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ পঙ্কজের মনে হলো ক্ষুদ্র পিঁপড়েগুলো বড় দাঁড়াওলা মাকড়সাকে নিয়ে যাচ্ছে! এবং পরস্পরের রক্ত খাবার জন্যে দাঁড়াগুলো তীক্ষ্ণ করে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এক মুহূর্ত সময়। তারমধ্যেই নিজেকে আবার ঠিক করে নিলেন পঙ্কজ। বললেন, তুমি কি চাও মেঘনা?

মেঘনা—কতদিন পর স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন পঙ্কজ। বোধহয় এক যুগেরও বেশি।

অনভ্যস্ত ডাক শুনে একটুও চমকালেন না মেঘনা। খুব শান্ত গলায় বললেন, সুমিতা বোধহয় ভয় পাচ্ছে, তুমি একবার তার সঙ্গে কথা বলো।

ভয়, কিসের ভয়?

জানিনে—জানিনে—ফিসফিস করে বললেন মেঘনা, তোমাকে বোধহয় তোমাকে

আমাকে, আমাকে ভয় পাচ্ছে সুমিতা—কি বলছো তুমি? কিছু একটা বলার চেষ্টা করেও কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারছিলেন না মেঘনা। তার ঠোঁট দুটো কথাটা বলতে না পারার যন্ত্রণায় থর থর করে কাঁপছিল। সেদিকে অনেকক্ষম একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে পঙ্কজ বিষণ্ণ গলায় বললেন, তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝতে পেরেছি, বৌমার কিসের ভয় তাও বোধহয় বুঝতে পেরেছি—

বুঝতে পেরেও তুমি অন্য রকম হতে পারো না?

মেঘনা কখনো কাঁদেন না। কিন্তু এখন তাঁর কথাগুলো কান্না ভেজা শোনালো।

পঙ্কজ আবার একটা ঘাস ছেঁড়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে বললেন, এটাই আমার নিয়তি, চেষ্টা করলেও আমি এর হাত থেকে নিস্তার পাবোনা। নিজেকে শান্ত করো।

মেঘনা ফিরে যাচ্ছেন। পেছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ মনে মনে বললেন, মাঝে মাঝেই আমি বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে যাই এটা আমার পাগলামি নয়, আমার বুকের মধ্যে একটা দুঃসহ যন্ত্রণা আমাকে স্থির হয়ে থাকতে দেয়না। তুমি তো জানো মেঘনা সে যন্ত্রণাব কারণ তুমি। তুমি। তুমি।

(১০)

স্যাব। আপনি কি বেরচ্ছেন?

হ্যাঁ। গাড়িটা আনতে বলুন।

সুশীলবাবু বললেন, এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা কবার জন্যে বসে আছেন।

কে? কি দরকার?

বললেন, আপনাকেই বলবেন।

ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন। দেখবেন যেন বেশী সময় নষ্ট না করে।

এক মিনিট পরে ঘরের পর্দা সরিয়ে যে ভেতরে এসে দাঁড়াল এত তাড়াতাড়ি তাকে আবার দেখবেন পঙ্কজ আশা করেন নি সেই দুই ভ্রুর মাঝখানে ছোট্ট কালো টিপ ঠিক একমাস আগে সন্দীপের সঙ্গে প্রথম তাঁর ঘরে এসেছিল মেঘনা। আসুন, আসুন—

চিনতে পেরেছেন আমাকে?

বারে, চিনতে পারবো না কেন? স্মৃতি শক্তি এত দূর্ব্বল হলে কি ভালো ব্যবসাদার হওয়া যায়? তারপর বলুন, হঠাৎ এই কাঠ খোট্টা লোকটাকে মনে পড়লো কেন? আপনার ছবির সোলো একজিবিশন হচ্ছে বুঝি?

হলে আপনি যাবেন?

কেন যাবো না? ছবি না বুঝলেও ওখানকার পরিবেশটা আমার দারুণ ভালো লেগেছে। আর হলের বাইরে ভাঁড়ের চা। really some thing different...দাঁড়ান আপনার জন্য কফি বলি।

কফি থাক, মেঘনা বলল। আমি একটা জরুরী দরকারে আপনার কাছে এসেছি।

বলুন না।

আমার দশহাজার টাকার খুব দরকার। এক্ষুনি দরকার।

আমার কাছে টাকার জন্য এসেছেন, পঙ্কজ বললেন। কিন্তু আমার কোম্পানীতো টাকা ধার দেবার ব্যবসা করে না।

Please বিশ্বাস করুন টাকাটা আমার খুবই দরকার। মেঘনার দুচোখে আর্তি, আপনি ধার যদি না দেন, তাহলে ওর বদলে আমার কখনা ছবি নিন্।

ছবি আমার একখানাই দরকার ছিল। পঙ্কজের কণ্ঠস্বর বেশ তীক্ষ্ণ আর রুক্ষ শোনাল। সেটা আমি already কিনেছি। তার দামও দিয়ে দিয়েছি। আর ছবি নিয়ে আমি কি করবো? ছবি বিক্রির ব্যবসা? Sorry–

মেঘনার হাত দুখানা সেদিনের মতই আজও টেবিলের ওপরে পাতা কাচের ওপর নিশ্চল হয়ে আছে।

পঙ্কজ সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, সন্দীপ কেমন আছে?

সন্দীপদা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে বাইরে গিয়েছেন।

চাকরি, ও কিসের চাকরি করবে?

স্কুলে, ড্রইং টিচার।

ড্রইং টিচার। একটু আহত বোধ করলে পঙ্কজ কিন্তু বাইরে তার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করলেন না। বললেন, সন্দীপ এলে আব একদিন আসবেন। অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে। ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট।

দুকান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো মেঘনার। দাঁত দিয়ে শক্ত করে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। কি আশ্চর্য, টাকাটার জন্যে এই মানুষটার কাছেই কেন আসার কথাই তার মনে হয়েছিল?

তার ছবি একবার দেখেই যে মানুষটা পাঁচহাজার টাকায় কিনে ফেলতে পারে তাকে কি নির্বোধ মনে করেছিল মেঘনা?

ওকি, উঠে পড়লেন যে—

মেঘনা সরাসরি পঙ্কজের কথার জবাব দিতে পাবে নি। এক মুহূর্ত আগে তার সমগ্র অনুভূতি জুড়ে যে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিটি ফোকরে কোথা থেকে যেন অতলান্ত জলের স্রোত চারপাশের বাধা চুরমার করে বেরিয়ে পড়ার জন্যে মাথা কুটতে শুরু করেছে—মেঘনা চায়না, তাকে এই রূপে দেখুক পঙ্কজ।

সত্যিই যাচ্ছেন?—

মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেঘনা। যাবার আগে ফিরেও তাকালো না।

ঠিক পরদিনই সন্দীপ তাঁর বাড়িতে এসে হাজির।

নাহ্ হলো না।

কথাটা যেমন ভাবে বলল যেন চাকরিটা হলেই তার বিপদ হতো।

ক'জন ইন্টারভিউ দিয়েছিল?

সাতজন।

তার মধ্যে নিশ্চয় সেক্রেটারির ভাগ্নে ছিল।

না, ভাইপো।

দুজনাই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

হাসি থামলে সন্দীপ বলল, তারও চাকরিটা হয়নি।

তাহলে কার হয়েছে?

আমার—। সন্দীপের মুখে চোখে শোকের চিহ্ন।

পঙ্কজ লাফিয়ে উঠলো, এ্যাই, খবরদার মিথ্যে বলবি না। না, সত্যিই চাকরিটা আমার হয়েছে। কি করবো বলো যে ছবি দুটো বোর্ডে আঁকতে দিয়েছিল সেদুটো—

কি ছবি আঁকতে দিয়েছিল?

চালাঘব আর গোরু। কি ভাগ্য দ্যাখো গরুর ল্যাজটা আঁকতেই ভুলে গিয়েছিলাম তাও সেক্রেটারীর দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। তাঁরও নাকি অবিকল ঐ রকম একটা গোরু আছে যার জন্মের পরেই লেজটা একটা এক্সিডেন্টে কেটে গিয়েছিল।

চুপ করে পঙ্কজ সন্দীপের কথা শুনছিলেন। খুব খারাপ লাগছিল তাঁর। এই প্রাণবন্ত ছেলেটা দুটো ভাতের জন্য ছবির এক্জিবিশন ছেড়ে, তার গ্রুপের সবাইকে ছেড়ে কোথায় কত দূরে চলে যাবে।

সারাজীবন ধরে তোকে ঐ গরু আর চালাঘর আঁকতে হবে?

ধ্যাৎ, তা কেন। মাঝে মাঝে ফুলটুলও আঁকবো। হাসার চেষ্টা করেও হাসতে পারলো না সন্দীপ, তারপর ওসব পুরনো হয়ে গেলে আকাশে বক উড়ে যাবার ছবি আঁকবো। হ্যাঁ, তোমার কাছে নাকি মেঘনা গিয়েছিল?

এসেছিলেন, দশ হাজার টাকা ধার চাইছিলেন। আমি দিইনি। পঙ্কজ বললেন, মনে হয় ভদ্রমহিলা আমার ওপর খুব রেগে গিয়েছেন।

ভুলটা আমারই। সন্দীপ মুখ কাচুমাচু করে বলল। আমিই ওকে বলেছিলাম, হঠাৎ দরকার পড়লে তোমার কাছে যেতে। সমরের হঠাৎ অপারেশ করতে হলো। Don't Worry, টাকাটা ম্যানেজ হয়ে গেছে।

কে দিল?

একটু চুপ করে থেকে সন্দীপ বলল, আমার ঠাকুর্দা। তোর ঠাকুর্দা, কি বলছিস তিনি তো কবেই মারা গেছেন। পঙ্কজের কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট অবিশ্বাস।

সোফায় বসেছিল সন্দীপ। সেখান থেকে উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঠাকুর্দার একটা পুরনো রোলেক্স ঘড়ি ছিল। একটা লোক সেটা কেনার জন্যে অনেকদিন থেকে আমার পেছনে ঘুরছিল।

কতোয় বেচলি?

দশ দিয়েছে।

মোটে দশ, ইস্। একলাখ দেওয়া উচিত ছিল, পঙ্কজ উত্তেজিত গলায় বললেন। তোকে ঠকিয়েছে লোকটা। তাঁকে একদৃষ্টে দেখছিল সন্দীপ। তার দুচোখের ওপর থেকে একটু আগের ঘন ছায়াটা সরে যাচ্ছে। অন্য একরকম গলায় সে বলে উঠলো, হ্যাঁ, আমরা সবাই ঠকে গিয়েছি—আমি, মেঘনা, সমর সব্বাই। ডাক্তার দত্ত কাল সমরের ডান হাতখানা এম্পুট করে দিয়েছেন। সমরের আর বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। ও আর কখনো ছবি আঁকতে পারবে না। কক্ষনো না।

পঙ্কজের মনে আফশোস হচ্ছিল মেঘনাকে টাকাটা না দেওয়ার জন্যে।

(১১)

আর টাকা লাগবে নাকি?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর পঙ্কজ জিজ্ঞাসা করলেন। উনি কিন্তু আমাকে বলেন নি টাকাটা অপারেশনের জন্যে দরকার।

সন্দীপ তার কথার জবাব দিল না। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, চাকরিটা নিয়েই নিই, কি বলো?

ওইখানেই থাকতে হবে?

হ্যাঁ, বিলাসপুর থেকে দশ পনেরো মাইল ইনটিরিয়ারে। গ্রামও নয়, শহরও নয় জায়গাটা।

আর তোমাদের গ্রুপ, একজিবিশন?

অদ্ভুতভাবে হাসলো সন্দীপ। বলল, বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়াও।

Sorry, এ কথাটা আমারই এতক্ষণ বলা উচিত ছিল, পঙ্কজ লজ্জিত ভাবটা মুখে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। সামান্য পরে ফিরে এলেন যখন তখন তার সঙ্গে একটি চাকর জাতীয় লোকের হাতের ট্রেতে নানারকম খাবার ভর্তি প্লেট।

আজ এখানেই ভাত খেয়ে যা। পঙ্কজ বললেন। তোমার অফিস?

রোববারে অফিস, তোর কি মাথা খারপ হয়ে গেল নাকি?

লুচি ছিড়ে মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে পরম তৃপ্তির গলায় সন্দীপ উত্তর দিল, সত্যিই আমার মাথা খারপ, তা নইলে গোরু আঁকার চাকরিটার জন্যে ইন্টারফিউ দিতে গিয়েছিলাম কেন।

খানিকক্ষণ পর ডিস খালি করে জল খাবার পর সন্দীপকে বেশ সুখী সুখী দেখতে লাগছিল। পঙ্কজের মনে হলো উদর পরিপূরণের সুখ ও তৃপ্তি যেন তৃপ্তির চেয়েও অনেক গভীর অনেক বেশী মানবিক।

অনেকদিন বাদে বেশ জমিয়ে খেলাম। সন্দীপ বলল, তুমি একটা বিয়ে করে ফেল, তাহলে মাঝে মাঝে এসে আজকের মতন করে খাওয়া যাবে।

তার কথায় হেসে উঠতে গিয়েও হাসলেন না পঙ্কজ। পাত্রী কেমন চাই বলো, খুঁজতে শুরু করি। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো সন্দীপ। পঙ্কজ গভীর গলায় বললেন, পাত্রী দেখা আছে, শুধু তার মতটা নেওয়া বাকি। really...ঠিক বলছো, উত্তেজনায় সন্দীপ জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল। দাও, তোমার ব্রাণ্ড দাও একটা। তাহলে আর আমি বিলাসপুর যাচ্ছিনা।

সে কি, তোর চাকরি।

এখানেই কটা টিউশনি ধরে নেব। পরম নিশ্চিন্তে নিজের ভবিষ্যতের ফয়সালা করে ফেলল সন্দীপ। আর একবার চা বলে দাও। বেশ কড়া লিকার। দুপুরের আগেই সন্দীপ চলে গেল। যাবার আগে বলল, একবার হাসপাতালে যাবো সমরকে দেখতে। মেঘনা সকাল থেকেই ওখানে আছে। ওকে একটু রিলিফ দেওয়া দরকার।

(১২)

নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে চুপ করে বসেছিলেন পঙ্কজ। আজ দুপুর থেকেই আবার মনের মধ্যে সেই বাতাসটার আনাগোনা শুরু হয়েছে। লাল মোরাম বিছানো বাগানের রাস্তায় পদচারণা করছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তে তার মনে হলো একটা দুকূল ছাপানো নদী। অনেকদূর অবধি সবুজের গালিচা বিছানো ধানক্ষেত। নদীর ভাঙ্গা পাড়েতে অসংখ্য গাংশালিকের বাসা, আর স্রোতের টানে টলমল করতে করতে ভেসে যাওয়া আরোহীবিহীন একটা ছোট্ট নৌকো --হাঁফতে হাঁফাতে নিজের

ঘরে এসে ঢুকেছিলেন তিনি। তারপর খাটের তলা থেকে কিড ব্যাগটাকে টেনে বার করেছিলেন। দুখানা জামা কাপড়, আরো কিছু টুকিটাকি—পাঁচ মিনিটেই গোছানো শেষ। কিড ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, একটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে আর কি লাগে?

কিচ্ছু না।...

সময় মুখস্থই আছে—প্রথম বাস ডিপো থেকে বেরোয় পাঁচটার আগে। এখান থেকে হাওড়া স্টেশন। আঃ তারপর অনন্ত—অফুরন্ত মুক্তি।

এর আগের বারও ওই কিডব্যাগটাই সঙ্গে নিয়েছিলেন। পকেটে হাত দিয়ে দেখেছিলেন মাত্র বত্রিশ টাকা আছে পকেটে। যথেষ্ট...। এদেশে এখনো এই টাকাতে একশো দেড়শো মাইল চলে যাওয়া যায়।

সামনে কোন স্টেশন আছে ভাই?

ভাগুার টিকুরি হল্ট। যে প্যাসেনজারটি উত্তর দিল সে নামার জন্য উঠে দাঁড়াল। পঙ্কজও উঠে পড়লেন। আপনিও এখানেই নামবেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কার বাড়ি যাবেন?

একটুও চিন্তা না করে পঙ্কজ বললেন, এখানে যে নদীটা আছে—

জলঙ্গী—?

হ্যাঁ হ্যাঁ জলঙ্গী। তার তীরে যেখানে গাংশালিকের ঝাঁক রোদ পোহায়

হলুদ গা আর খয়েরী ঠোঁট—

ঠিক, ঠিক বলেছ তুমি...হলুদ গা আব খয়েরী ঠোঁট

নামুন বাবু। গাড়ি ছেড়ে দেবে এখুনি।

আঃ, এই তো আমার স্বপ্নের দেশ। বুকের মধ্যে কাঁপছে থর থর করছে, তবু সেটা ভয় নয়, অহংকার নয়, ঝড় নয়। আন্য কিছু।

স্টেশনের বাইরে এক সার চা আর খাবারের দোকান। তারই একটাতে বাঁশের পাতার তৈরি বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছিলেন তিনি, এগুলো কি ভাই?

কচুরি।

আর ওগুলো—?

আলুকুমড়োর ঘ্যাঁট।

কি আশ্চর্য, এক হাতে শালপাতার ঠোঙায় কচুবি আর তবকারি—অনাহাতে তাই ছিঁড়ে খেতে এত তৃপ্তি এর আগে কোনদিন জানতে পারেন নি তিনি।

নদীর রাস্তাটা এই দিকে বাবু। সেই ট্রেনের লোকটি।

একি তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছো?

আপনি যে নদীর কাছাকাছি যাবেন বললেন। আমিও তো ঐ দিকেই যাবো।

চলো। চলো। তোমার নামটা কি?

রোশন আলি। নদীর ধারে যে ইস্কুল বাড়িটা আছে তার পাশ কাটিয়ে নাক বরাবর গেলে পুব মুখো আমার ক্ষেত।

কি চাষ করা হয়?

ফুল। শীতে মরসুমী ফুল, বর্ষায় বেলি, রজনীগন্ধা, গরমে সূর্যমুখী আর—

চোখের সামনে ভগবান দেখার মত করে রোশন আলিকে দেখছিলেন পঙ্কজ। আমার বিবি, বুঝলেন বাবু। আমার বিবির নাম যোহানা বেগম। বড্ড অবুঝ আর ছেলেমানুষ। বলে ও মিঞা তোমার কি মন নেই। গাছ থেকে ফুলগুলো কাটো কেন? আমি বলি, ফুল না কাটলে বেচবো কি করে, আর না বেচলে খাবো কি? বুঝলেন কিনা বাবু, আমার কথার জবাব না দিয়ে কাঁদতে শুরু করে। বলে ফুল গাছ থেকে ফুল কাটার আগে আমায় তালাক দিয়ে দাও।

পাশাপাশি মাটির রাস্তায় হাঁটছিলেন দুজনে। একটা মাঠকোঠার সামনে এসে রোশন দাঁড়িয়েছিলেন, একটু দাঁড়ান বাবু।

তারপর চেঁচিয়ে ডেকেছিল, মাষ্টারবাবু, ও মাষ্টারবাবু। রোশনের ডাক শুনে বারান্দার বেরিয়ে এসেছিলেন এক মাঝবয়সী মানুষ—কি খবর রোশন, কানাই এর দেখা পেলে?

পেয়েছি মাষ্টারবাবু। তার তো ভীষণ ব্যামো। সারা গায়ে গুটি বেরিয়েছে।

সর্বনাশ, বলো কি হে—তা তোমার সঙ্গে মানুষটি কে, তোমার কুটুম নাকি?

না মাষ্টারবাবু, ট্রেনে আলাপ। নদীর ধারে গাংশালিকের বাসা পেরিয়ে ওনার চেনা লোকের কাছে যাবেন।

না রোশন আলি। আমি মাষ্টাবমশাই এর কাছেই এসেছি। তাহলে ভেতরে যান বাবু। আমি চলি। দেরী হলে ওই যে তখন বললাম আপনাকে, আমার বিবিটা খুব অবুঝ আর ছেলেমানুষ।

রোশন পা চলিয়ে এগিয়ে গেল। মাষ্টারমশাই মাটির দাওয়া থেকে নেমে এলেন, এখানে নতুন বুঝি?

হ্যাঁ।

বাড়ি কোথায়?

বাড়ি?

হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ি, যেখানে তুমি জন্মেছ, তারপর বড় হয়েছ, তারপর নিজেকে চারপাশে ছড়িয়েছ।

ছড়িয়েছি?

মানে বুঝলে না। সংসার হয়েছে। সন্তানসন্ততি হয়েছে। যে শেকড়টা মাটির ওপর ছি সেটা মাটির গর্তে সেঁধিয়েছে, দাঁড়াও বাপু, গিন্নী ডাকছেন কেন শুনে

আসি।

হন্তদন্ত মাষ্টারমশাই ভেতরে গিয়ে তক্ষুণি আবার ফিরে এসেছিলেন। এসো এসো ওপরে উঠে এসো। হাত মুখ ধুয়ে নাও, এ বেলাটা আমার এখানেই—

খাবার কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

রাত্তিরটাও তাহলে আপনার এখানেই—

সে রাত্তির আসুক তখন দেখা যাবে। তুমি বাপু তোমার ওই যাকে বলে ছড়ানোর হিসেবটা এখনো দাওনি। তুমি আমার এখানে একদিন থাকো আর ছদিনই থাকো—তোমার শেকড়টা মাটির কতখানি নীচ অবধি গিয়েছে তা না জানলে তোমার বিশ্বাস করি কি করে?

খেতে বসে বার বার নিজেকে আভিশাপ দিতে ইচ্ছে করছিল পঙ্কজের—এ অমৃদের স্বাদ থেকে কেন এত কাল নিজেকে বঞ্চিত রেখেছেন। মোটা চালের ভাত, পেঁয়াজ, রসুন দেওয়া মুসুবীর ডাল, আলু পোস্ত, চচ্চড়ি আর চালতের টক। একগলা ঘোমটা দিয়ে ভাতের কাঁসি হাতে মাষ্টারমশাই এর বৌ এলেন। তুমি কি মানুষটার কথায় রাগ করেছ বাবা?

রাগ না, রাগ করবো কেন?

রাগ না করলে ভাত খাচ্ছো না কেন? ও মানুষ কি বলে তার ঠিক নেই। রাত্তিরে তোমার জন্যে বেগুন পুড়িয়ে সরষের তেল আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে মেখে দেব, খেয়ে দেখো তোমার গর্ভধারিণীর কথা মনে পড়ে যাবে।

পাশাপাশি কাঠের পিঁড়িতে বসেছেন দুজনে। পঙ্কজ আর মাষ্টারমশাই। এখন আর মাষ্টারমশাই এর মুখে কোন কথা নেই। আপন মনে খেয়ে যাচ্ছেন তিনি। পঙ্কজের পাত আধ কাঁসি ভাত ঢেলে দিয়ে মাষ্টারমশাই এর স্ত্রী বললেন, খাবার পর উঠোনে চাটাই বিছিয়ে দেব একটু গড়িয়ে নিও। ওই মানুষের ঘরে ঢুকোনো তাহলে বকে বকে কানের পোকা বার করে দেবে।

পঙ্কজ এতক্ষণ কোন কথাই মুখ থেকে বার করেন নি। এবার বললেন, আমি খাবার পরেই চলে যাবো।

কোথায় যাবে? কোথায় যাবে বাছা? তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝেছি তোমার সাতকুলে কেউ নেই, ওই মানুষটার চোখে তুমি ধুলো দিতে পারো আমার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। আমার যে মার চোখ, বাছা। কথাটা বলেই মাষ্টারমশাই-এর স্ত্রী যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। মাথায় এখন আর ঘোমটার আবরণ নেই। দুটি বিষণ্ণ চোখের মণিতে এক পশলা বৃষ্টির আড়ালে ব্যর্থ মাতৃত্বের হাহাকার জমাট বেঁধে আছে।

পঙ্কজ নিজের কানে নিজের হৃদপিণ্ডকে চৌচির করে ফাটতে শুনলেন।

আফশোস নয়, তাঁর মনের এক বঞ্চনার দুঃসহ বেদনা তাঁকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় করে রাখলো।

(১৩)

সন্দীপ—, সন্দীপ আছ—?

চোখ ডলে ভালো করে তাকিয়ে সন্দীপ দেখল চকচক করছে রোদ্দুর। ঘরের মেঝেয় রোদ্দুর। দেয়াল রোদ্দুর খাটের বাজুতে রোদ্দুর।

ইস্ এত বেলা হয়েছে। তার মনে পড়লো কাল সমস্ত রাতটা সমরের পাশে ঠায় বসে কেটেছে। ডাক্তার দত্ত বলেই দিয়েছেন—মৃত্যু বেশী দূরে নেই। এমন অবস্থায় কি করে মানুষ জন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজন?

সময়ের আত্মীয় পরিজন কেউ নেই। বন্ধুরাই তার আত্মীয় তার পরিজন।

রাত্তিরে একবার বাইরে উঠে এসেছিল সন্দীপ। বারান্দার রেলিং-এ হাত রেখে নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিল। মেঘনা। যেমন গিয়েছিল তেমনই নিঃশব্দে ফিরে এসেছিল সে। মেঘনাকে কাঁদতে দেখে অবাক হয়নি সন্দীপ।

ঘরের দরজায় ধাক্কা শুনে উঠে এসে দরজা খুলে সন্দীপ অবাক—একি তুমি?

ঘুমোচ্ছিলে, পঙ্কজ ঘরের ভেতরে গেলেন না, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

কেন। কোথাও যেতে হবে?

হ্যাঁ।

কোথায়?

গাড়িতে যেতে যেতে বলবো।

গাড়ি ড্রাইভারের বদলে নিজেই চালাচ্ছে পঙ্কজ। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর পঙ্কজ জিজ্ঞেস করলো, তোমার বিলাসপুর যাবার কি ঠিক করলে?

এখনো দিন পনেরো সময় আছে, কথার পর একটু চুপ করে থেকে সন্দীপ বলল, ভাবছি চলেই যাবো।

সমরের আসন্ন মৃত্যু তাকে কত গভীর স্পর্শ করেছে তা তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল। একটা মৃত্যু মানে শুধুমাত্র একটা জীবনেরই থেমে যাওয়া নয়, তার চারপাশের ঘনিষ্ঠ জীবনগুলোকেও নাড়িয়ে দিয়ে যাওয়া।

সমর ইউনেস্কোর স্কলারশিপ পেয়েছিল। দু বছর প্যারিসে গিয়ে হাতে কলমে ছবি আঁকার আধুনিক পদ্ধতি শিখে আসার কথা তার।

তার স্কলারশিপের খবরটা যেদিন পৌঁছেছিল সেদিন সবাই মিলে মেঘনার বাড়িতে অনেক রাত অবধি পাগলের মতো হৈ হৈ করেছিল তারা।

সমর একটু লাজুক প্রকৃতির। একপাশে চুপ করে বসেছিল সে। মেঘনা বসেছিল এই যে, এখন থেকেই তোমার ডাঁট বেড়ে গেল মনে হচ্ছে?

ডাঁটের কি দেখলে?

ভালো করে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাই বলছো না। নাহ, সমর মুখ তুলে বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, আমার মনে হচ্ছে শেষ অবধি আমার যাওয়া হবে না। যাঃ একথা বলছো কেন?

শুধু তোমাকেই বললাম মেঘনা।

সন্দীপদা শুনলে দুঃখ পাবে।

বললাম তো কথাটা শুধু তোমাকেই বললাম।

সন্দীপ উঠে পড়েছিল, কটা বাজলো?

বারোটা।

যাই, বাড়ি যাই।

এত রাত্তিরে কোথায় যাবে, এখানেই থেকে যাও। তোমাদের বাড়ির লোকজন আমাদের অত্যাচারে ঠিক একদিন বাড়ি ছেড়ে পালাবে, দেখো সমর কি তখনি বুঝতে পেরেছিল কেউ যাবে না। সে নিজেই সবাইকে ছেড়ে পালাবে।

ডাঃ দত্ত সমরের ঘর থেকে বেরিয়ে হাতের ইশারায় সন্দীপকে ডেকেছিলেন, এখন আর কোথায় যাবেন না। কাছাকাছি থাকুন।

আপনি, আপনি কি—কথাটা শেষ করতে পারেনি সন্দীপ তার গলা ভেঙে গিয়েছিল।

আমি যা বলতে চেয়েছি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ডাঃ দত্ত বলা থামেননি। আপনি তো বলেছিলেন পেশেন্টের মা বাবা কেউ নেই। আপনারই সব।

ও বেঁচে থাকলে খুব বড় আর্টিস্ট হতো ডাক্তারবাবু। আমাদের মধ্যে ওকেই ভগবান সবচেয়ে বেশী—

আমাদের ডাক্তারী বিচারে আপনার বন্ধু এখনো বেঁচে আছে, yes এখনো বেঁচে আছে...ডাঃ দত্ত হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আর আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টার মধ্যেই—নীচে নেমে রাস্তার পে ফোন বুথ থেকে পর পর অনেকগুলো ফোন করেছিল সন্দীপ। তোদের আসতে হবে। হ্যাঁ এখুনি। আসার সময় মেঘনাকেও বাড়ি থেকে তুলে আনিস।

রাত বারোটার পর ডাঃ দত্ত নিজেই এসে হাজির হয়েছিলেন, একি এখানে এতো ভিড় কেন?

আপনিই সবাইকে খবর দিতে বলেছিলেন ডাঃ দত্ত। সন্দীপ উত্তর দিয়েছিল।

হ্যাঁ বলেছিলাম। বাট...কথাটা শেষ না করে সমরের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ডাঃ দত্ত। ঝুঁকে পড়ে পুরো এক মিনিট ধরে তাকে দেখেছিলেন। তারপর সটান নিচে নেমে গিয়েছিলেন।

পেছন পেছন দৌড়ে গিয়েছিল সন্দীপ। কি দেখলেন ডাঃ দত্ত?

এখন ও বেঁচে নেই। আবার মারাও যায়নি। ডাঃ দত্ত বলেছিলেন, Please tale your friends, হাসপাতালের বারান্দাটা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড নয়, এখানে ভিড় জমানোর দরকার নেই।

একটানা পনেরো মিনিট গাড়ি চালানোর পর পঙ্কজ একটা দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে সন্দীপের দিকে না তাকিয়ে বলেছিলেন, নামো।

এখানে, এখানে কি?

সাইনবোর্ডে কি লেখা আছে দেখতে পাচ্ছো না?

পাচ্ছি, 'Marriage Register's Office'

সন্দীপ ভীষণ অবাক হয়েছিল, এখানে আমরা কেন এলাম?

বিয়ের সাক্ষী দিতে।

বিয়ে, কার বিয়ে?

আমার, পঙ্কজ বাঁ হাত তুলে নিজের বুকে রেখে নিজেকে দেখিয়েছিলেন।

ঠাট্টা করছো আমার সঙ্গে, ঘুম ঘুম চোখে সন্দীপ পঙ্কজের মুখে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করেছিল। সারারাত হাসপাতালে ছিলাম, তুমি যখন গেলে তার একটু আগেই ফিরেছি...।

জানি।

সমর এখন কোথায়। যেকোন মুহূর্তে ও আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যাবে। জানো পঙ্কজ, ডাঃ দত্ত ওর ডান হাতখানা কনুই থেকে কেটে বাদ দিয়েছেন তা সমর জানতে পারেনি। জানতে পারলে আগেই মরে যেত।

সমরের কথা এখন থাক, বিরক্ত হয়েছিলেন পঙ্কজ। তুই দোতলায় উঠে গিয়ে রেজিষ্ট্রারেব ঘরে একটু বস্। আমি এক্ষুনি আসছি। কোথায় যাচ্ছো?

বারে। পাত্রীকে এখানে না আনলে কার সঙ্গে বিয়ে হবে?

সত্যি বলছো তোমার বিয়ে, Seriously?

হান্ড্রেড পারসেন্ট সত্যি। আমি বিয়ে করছি। আজই করছি। তুই তার সাক্ষী হবি।

খুব বড় সারপ্রাইজ দিলে কিন্তু। পাত্রীটা কে?

এলেই দেখতে পাবি। গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে পঙ্কজ বলেছিলেন, খবরদার, পালাসনে যেন, I will come back very soon.

নিঃশব্দে বাতাস কেটে পঙ্কজের গাড়িখানা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সন্দীপ। তার মনে হচ্ছিল পঙ্কজকে হয়তো সবটুকু চেনেনা সে। বাইরের পঙ্কজের সহজ, অহংকারী আর বাশভারী পঙ্কজের আড়ালে যে জটিল পঙ্কজ লুকিয়ে আছে তাকে এখনো সামান্যও চেনে না সে।

(১৪)

কই হে ঘুম ভেঙ্গেছে নাকি তোমার?

বাইরে মাষ্টারমশাই এর গলার ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিলেন পঙ্কজ।

মাষ্টারমশাই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তোমার ঘুমটা তো দেখছি বাবুদেরমতো। চা খাওয়ার অভ্যাস আছে নাকি? যাও, ওদিকে যাও। তোমার জন্যে চা নিয়ে বসে আছেন।

চা খাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা অদ্ভুত স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে থাকলেন পঙ্কজ। ছোট ছোট জানালাগুলো একটা টালি ছাওয়া ছোট ঘরে কোথা দিয়ে যে গোটা রাতটা কেটে গেছে তা তিনি টেরই পাননি। নিজের বাড়ির দোতলায় মার্বেল মোড়া দুটো এ.সি. লাগানো ঘরখানার কথা মনে পড়লো তাঁর। কত রাত তাঁর বিনিদ্র কেটে যায় সে ঘরে। পাশের ঘরে মেঘনা শুয়ে থাকে। তার থেকে তিনহাত দূরে নিজের ঘরে অনিরদ্ধ আর সুমিতা। তারা কেউ জানতেও পারে না পঙ্কজ কী একাগ্র সাধনায় মাত্র একঘণ্টার ঘুম প্রার্থনা করেন।

চা খাওয়া হয়েছে?

হয়েছে।

নাও, ধরো। 'মাস্টার মশাইএকগোছা চাবি থোকাসুদ্ধ তার হাতে দিলেন। যাও, স্কুলের ঘরটরগুলো খোলো।

আমি—মানে আমি—

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। বসে বসে খাওয়ানোর ক্ষমতা আমার নেই বাপু। তাছাড়া স্বাস্থ্য টাস্থ্য তো বেশ মজবুতই আছে দেখছি।

আমি তো আজই চলে যাবো।

তাঁর কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন মাষ্টারমশাই। হাসি থামলে বলেছিলেন, তুমি নাকি বলেছ গাংশালিকের আদ্যপান্ত না জেনে এখান থেকে নড়বে না?

সেতো ওই রোশন আলি—

ব্যাস, ব্যাস,—রোশন আলিকে বলেছিলে তাইতো?

যা ওকে বলা তাই এঁকে বলা। দুজনা যে মা ছেলের সম্পর্ক পাতিয়েছেন। বাগানে নতুন গাছের প্রথম ফুলটি এ বাড়িতে না পৌঁছে রোশন কোন কাজে হাত দেয় না। যাও বাপু, কথায় কথায কত বেলা হয়ে গেল। ছাত্তররা সব আসতে শুরু করবে।

এই রকম কিছুই তো তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন। একটা আশ্রয় আর দুবেলার আহার।

চাবির গোছা হাতে মাথা নীচু করে হাঁটছিলেন পঙ্কজ। পেছন থেকে ডাক শুনে ফিরে এলেন।

মাষ্টারমশাই বললেন, তুমি কি রকম মানুষ যে, এই ইস্কুলের চাকরিটা কেন পেলে তাতো একবারও জিজ্ঞাসা করলে না? তারপর মাইনে কতো করে পাবে তাও জানতে চাইলে না? তোমায় দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে বাপু। তোমার

মাথা সুস্থ্য আছে তো?

পঙ্কজ কি উত্তর দেবেন বুঝতে পারলেন না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মাষ্টার মশাই আরও রেগে গেলেন, কোথা থেকে যে সব এসে জোটে আমার কপালে। কালতো দেখলাম বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো। এখন বোবা হয়ে গেলে কি করে? শুনে রাখ। দুবেলা খাওয়া আমার বাড়িতে, এছাড়া মাসে নগদ পঞ্চাশ টাকা। রাতে শোওয়াও ইস্কুলের ঘরে। রাজি আছো?

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালেন পঙ্কজ।

মাষ্টার মশাই বললেন, চায়ের অভ্যেসটা এখন আছে থাক্‌। আস্তে আস্তে কমিয়ে আনাই ভালো। যাও তাড়াতাড়ি যাও—

একমাস—কি আশ্চর্য একমাস সময় কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেল? কলকাতা শহর, বাড়ি, অফিস, স্ত্রী মেঘনা, ছেলে অনিরুদ্ধ, ছেলের বৌ সুমিতা— কেমন করে তাদের এতগুলো দিন বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি? সত্যিই কি আমি হৃদয়হীন অসামাজিক? সত্যিই কি আমার হৃদয় পাথরের তৈরি?

বাবা—

খুব চেনা একটা গলার ডাক শুনে চোখ খুলেছিলেন পঙ্কজ। রবিবার স্কুলের বারান্দায় একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন তিনি। সারা সকালটা রোশন আলির সঙ্গে নদীর চরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। হলুদ সর্ষে ক্ষেতের পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকা আকাশটাকে বার বার দেখেও তৃপ্তি হয়নি।

বাবা—আবার সেই একই গলার ডাক। এবার অনেক কাছে। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। তিনি। সামনে দাঁড়িয়ে সুমিতা। তার পেছনে মেঘনা আর অনিরুদ্ধ। একটু দূরে বিশ্বনাথ আর ড্রাইভার।

একি তোমরা এখানে?

সুমিতা কোন জবাব না দিয়ে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল।

অনিরুদ্ধ এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল,

বাবা, আপনি বাড়ি চলুন।

এখানে আমি ভালোই আছি অনিরুদ্ধ।

না, আপনি ভালো নেই।

খারাপটা কি দেখলে। দুবেলা হেড মাষ্টারমশাই-এর বাড়িতে খাই। স্কুলে মাষ্টারমশাইদের জলটল এনে দিই। ছুটির ঘণ্টা বাজাই, তাছাড়া—নগদ পঞ্চাশ টাকা...তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরুষ কণ্ঠ কেঁদে উঠলো। পঙ্কজ তাকিয়ে দেখলেন। ড্রাইভার রতিকান্ত বাচ্চাদের মতন করে কাঁদছে।

একি মুস্কিল। রতিকান্ত কাঁদছে কেন বলতো?

আপনাকে ছেড়ে আমরা কেউ ভালো নেই বাবা—অনিরুদ্ধ বলল। পঙ্কজ স্ত্রী

মেঘনার মুখের ওপর নিজের দৃষ্টি স্থির করলেন। আমাকে তোমরা আমার মতো করে বাঁচতে দেবে না?

মেঘনা বললেন, নাও শীগগির গাড়িতে ওঠো। আমরা সবাই একসঙ্গে সবায়ের মতো করে বাঁচবো।

পঙ্কজ উঠে পড়লেন। মাথার কাছে জড় করে রাখা সার্টটা পরতে পরতে বললেন, তোমাদের সঙ্গে যেতেই হবে?

হ্যাঁ। যেতেই হবে।

দাঁড়াও তাহলে, মাষ্টারমশাইকে বলে আসি।

হন্ হন্ করে হেঁটে সামনের দিকে একটা ঢোল কলমীর ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেলেন পঙ্কজ। একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, চলো।

চলন্ত গাড়ির পেছনের সিটে মাথা রেখে চোখ বুঁজে বসেছিলেন পঙ্কজ। পাশে বসা মেঘনার একখানা হাত তাঁরহাতের ওপর। পঙ্কজের মনে পড়ে গেল এই হাতখানাই জোর করে তাঁর হাতের মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মেঘনা। সে কতদিন। কত বছর আগের কথা?

নাকি তাঁর আর এক জন্মর ঘটনা?

(১৫)

অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে পঙ্কজ সোজা তেতলায় উঠে গেলেন। বাড়িটাতে পা দিলেই বোঝা যায় পাঁচ শরিকের সম্পত্তি। একতলাতেই একজন বৃদ্ধ তাঁকে বললেন, মেঘনাকে খুঁজছেন, আমার ভাইঝি হয়। সোজা তেতলায় উঠে যান।

তিন চারবার ডাকার পর দরজা সামান্য ফাঁক হলো। পেছন থেকে একটি স্ত্রীকণ্ঠ প্রশ্ন করলো কাকে চাই?

মেঘনাকে।

বাড়ি নেই।

কোথায় গেছে?

জানিনে। কেন খুঁজছেন, ছবি কিনতে চান?

হ্যাঁ।

আসুন ভেতরে আসুন।

দরজা খুলে গেল। পঙ্কজ ভেতরে ঢুকে যাবার পর আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি ওর মা।

নমস্কার।

ওর বাবা, ছোট বেলায় মারা গিয়েছেন। পাড়ার ইস্কুলে মাষ্টারী করে আমিই ওকে এত বড় করেছি। আজকালকার ছেলেমেয়ে, বুঝতেই পারেন একফোটা কৃতজ্ঞতা নেই। কদিন আগে দশ হাজার না পনেরো হাজার টাকার ছবি বিক্রি হলো। সেই সব টাকা কেনা কে এক বন্ধুর চিকিৎসার পেছনে ঢেলে এলো। কতো করে বললাম ঐ টাকা দিয়ে কখানা গয়না গড়িয়ে রাখ। দুদিন পর বিয়ের সময় কাজে লাগবে। কি উত্তর দিল জানেন? বলল, তোমার এই কুৎসিত মেয়েকে একটন সোনা দিলেও কেউ বিয়ে করবে না।

পঙ্কজ এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিলেন। এবার বললেন, আমি ঐ জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

কি জন্যে?

আপনার মেয়ে মেঘনাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

মেঘনার মা পঙ্কজের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুমি কি মেঘনার বন্ধু?

না।

তাহলে?

ওকে আমি চিনি।

শুধু চেনো বলেই বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলে?

আমাদের দেশে অচেনা মেয়েকেই আগে সবাই বিয়ে করতো।

মেঘনার মা বললেন, বসো। দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি কি করো?

পঙ্কজ একটা পুরনো আমলের চেয়ারে বসার পর বললেন, আমার একটা ছোট ব্যবসা আছে। আর মাথার গোঁজার মত ছোট একটা বাড়ি। যা আয় হয়, তাতে আমাদের দুজনের চলে যাবে।

এতক্ষণ পর মেঘনার মা ভালো করে পঙ্কজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, একটা কথা বলবো শুনবে?

বলুন না।

মেঘনাকে তুমি বিয়ে কোর না। সুখী হবে না। ও মেয়ে বড অহংকারী।

পঙ্কজ তাঁর কথা শুনে হাসলেন, আমিও খুব অহংকারী। আসলে আপনার মেয়ে অন্যরকম বলেই আমার তাকে পছন্দ হয়েছে।

বিয়ের কথা তো বাবা মা বলেন, এভাবে—মেঘনার, মা কথাটা শেষ না করে চুপ করে গেলেন। পঙ্কজ বললেন, আমার মা বাবা নেই। এক পিসি আর এক কাকা আছেন। তারা আলাদা থাকেন। আমার মুখ দর্শনও করেন না। আপনি নিশ্চয় জানতে চান কেন মুখ দর্শন করেন না?

তুমিই বলো।

পঙ্কজ বললেন, তাঁরা ভেবেছিলেন বাবার তৈরি কারবারটা ওদের হাতে তুলে দিয়ে আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাবো।

মেঘনার মা বললেন, তুমি তাহলে ঠিকই করে ফেলেছ ওকেই বিয়ে করবে?

হ্যাঁ। ওকে ছাড়া আর কোন মেয়েকে বিয়ে করার কথা আমি ভাবিনি।

তোমার এই ইচ্ছার কথা কি মেঘনা জানে?

না।

আবার মেঘনার মার মুখ চোখে বিহ্বলতার ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, তুমি কি ওর জন্যে অপেক্ষা করবে?

না। পঙ্কজ উঠে দাঁড়ালেন, আমি যাচ্ছি।

কোথায় যাবে?

মেঘনার খোঁজে।

কোন এক হাসপাতালে যেন ওর এক বন্ধু ভর্তি হয়েছে। সেই হাসপাতালে খুঁজে দেখতে পারো।

সেখানেই যাবো এখন, পঙ্কজ বাইরে বেরিয়ে এসে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনি মেঘনার মা। আমাদের বিয়েতে আশীর্বাদ করবেন না?

তোমাদের তো বিয়েই হয়নি এখনো, মেঘনার মা জবাবে বললেন, তাছাড়া বিয়ে হবে কিনা তারই ঠিক নেই।

কথাটা শোনার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন পঙ্কজ। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করবেন।

এখন রাস্তায় ভিড় বেশ কম।

তবুও একটা চৌমাথার কাছাকাছি এসে জ্যামের মধ্যে পড়ে গেলেন পঙ্কজ। সমর কোন্ হাসপাতালে ভর্তি আছে জানেন তিনি। সেখানে গেলেই যে মেঘনার দেখা পাওয়া যাবে তারও কোন স্থিরতা নেই। তবু স্টিয়ারিং এর ওপর পঙ্কজের হাত দুখানা শক্ত হয়ে আছে—এই পৃথিবীর যেখানেই যে কোণাতেই মেঘনা থাকুক তাকে তিনি খুঁজে বার করবেনই।

হাসপাতালের ভেতরে যেতে হলো না পঙ্কজকে।

গেটের বাইরে রাস্তার ওপর দুজন যুবকের সঙ্গে মেঘনা দাঁড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দে তার পাশে গিয়ে গাড়ি থামালেন পঙ্কজ। জানলা দিয়ে মুখ বার করে বললেন, কোথায় যাবেন মেঘনা দেবী? মেঘনা তাঁকে সেখানে দেখে একটুও অবাক হয়নি। বলল, কোথাও যাবো না, চা খেতে এসেছি

আসুক, উঠে আসুন।

কোথায় যাবো?

আসুন না, ঝুঁকে পড়ে পাশের দরজাটা পঙ্কজ খুলে দিলেন, কই উঠুন।

কোথায় যাবো বললেন না তো?

আসুন, গাড়িতে যেতে যেতে বলবো।

মেঘনার দুচোখের মণিতে একটা বিষণ্নতার ছায়া ভেসে এলো। নাহ্ এখন কোথাও যাওয়া যাবে না। কেন, যাওয়া যাবে না কেন?

ডাঃ দত্ত এই মাত্র বললেন সময়...আহ্, আপনি না দেখলে বিশ্বাস করবেন না সমরের মুখের কোথাও আর...

পঙ্কজ বললেন, মানুষ এই অবস্থায় সাত দিন কি তারও বেশী সময় থেকে যায়...

আমরা পালা করে সাতদিন কেন দশদিন হলেও সমরের পাশে থাকবো। Please আপনি আমায় এখান থেকে যাবার জন্য বলবেন না।

মেঘনার সঙ্গী ছেলে দুটির মধ্যে থেকে একজন বললেন, উনি ঠিকই বলছেন মেঘনা। তুমি যাও। আমারা তো এখানে আছিই।

পঙ্কজ বললেন, আসুন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে আবার এখানে পৌঁছে দেব। উঠে আসুন Please আমি যাচ্ছি। গাড়িতে উঠতে উঠতে মেঘনা ছেলে দুটিকে বলল, একটু পরেই চলে আসবো। কথার পর পাশে মুখ ফিরিয়ে পঙ্কজকে বলল, কোথায় যাবেন চলুন। রাস্তাব ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে একমনে গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন পঙ্কজ। তাঁকে দেখে বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না অটল একটা প্রতিজ্ঞার মত কিছু তার সমগ্র চেতনাকে এই মুহূর্তে নির্মম আপোষহীন করে তুলেছে। জিত যে আবধারিত তাঁরই সেটা জেনেই যেন তিনি এই খেলায় নেমেছেন।

আরো আগে বাবা তখনও বেঁচেছিলেন। পিসি বোজই কোন না কোন মেয়ের ছবি এনে বাবার হাতে দিয়ে বলতো, এই মেয়েটার সঙ্গে আমাদের পঙ্কজকে খুব মানাবে দাদা। তুমি রাজি হওতো আমি কথা বলি। বাবা বলতেন, বিয়ে যে করবে তার সঙ্গে কথা বলেছিস? ওতো আমাকে ঘরেই ঢুকতে দিল না। বলল, বিযে করলে বৌকে খাওয়াবো কি। আমি তো বেকার।

কথাটা কি মিথ্যে বলেছে?

ও, তুমি তাহলে ছেলের দিকে। পিসি রেগে যেতেন আর কোনদিন তোমার ছেলের বিয়ের কথা বলতে আসবো না।

পিসি তখনকার মতো চলে গেলেও আবার কদিন পর থেকেই পিসির মেয়ের ছবি নিয়ে আনাগোনা শুরু হয়ে যেত।

একদিন পিসির হাতে একটি মেয়ের ছবি দেখে পঙ্কজ চমকে উঠেছিলেন। মেয়েটির নাম লাবণী। তাদের কলেজের এক প্রফেসরের মেয়ে। পিসি ছবিটা দেখি একবার।

দেখবি। এই নে দ্যাখ। খুব ভালো মেয়ে রে। যেমন রূপ তেমন গুণ।

ছবিখানা আমার কাছে থাক পিসি।

পিসি তার ঘর থেকে একদৌড়ে বাবার ঘরে গিয়েছিলেন।

দাদা—

কি হলোরে, হাঁফাচ্ছিস কেন? বস্, বস্ একটু।

তোমার ছেলের বিয়ের মত হয়েছে দাদা।

কে বলল?

কে আবার বলবে, সেই বলল। আমার কাছ থেকে মেয়ের ফটোখানা চেয়ে নিয়েছে। বলেছে পরে ফেরৎ দেবে।

ওর অন্য কোন মতলব নেইতো?

কি মতলবের কথা বলছো তুমি?

পিসির গলায় আশঙ্কা।

না, আমিও ঠিক জানিনা। মনে হলো তাই বললাম। পরদিন কলেজে যাবার সময় একটা একতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে নামলো পঙ্কজ। সোজা হেঁটে গিয়ে বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো স্যার—স্যার—

যে দরজা খুলে দিল তার কাছেই এসেছে পঙ্কজ।

তুমি, লাবণী অবাক, বাবাকে চাই? বাবাতো কলেজে চলে গেলেন।

না, আমি তোমার কাছেই এসেছি।

আমার কাছে? কি দরকার?

জানতে এলাম কবে বাড়ি এসেছ?

মুহূর্তের মধ্যে লাবণীর মুখের সমস্ত রং মুছে গিয়ে মুখখানা কালো হয়ে গেল। দমবন্ধ করা গলায় বলল, কোথা থেকে আসবো, বাড়িতেই ছিলাম আমি।

পঙ্কজ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল মনের মধ্যে থেকে তীব্র যন্ত্রণা হয়ে উঠে আসা রাগটাকে চেপে রাখার জন্যে। সেইভাবেই বলল, অপারেশনের জন্যে তুমি যে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলে সেখানকার একজন ডাক্তারকে আমি কাকু বলে ডাকি।

কথাটা শোনার পর লাবণী হেসে উঠলো। অন্য এক রকম গলায় তীব্র স্বরে বলে উঠলো—হ্যাঁ, আমার পেটে যে তিনমাসের বাচ্চাটা ছিল সেটাকে নষ্ট করে দিয়েছি। ওকি, এই কথাটা শুনেই তোমার মুখ যে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। তোমরা ছেলেরা বড় অদ্ভুত পঙ্কজ সত্যি কথাটা শুনতেও চাও, আবার শুনে লজ্জাও পাও।

তুমি বোধহয় ভয় পাচ্ছ, তোমার সঙ্গে বিয়ের পর আমি মা হতে পারবো না। যে ডাক্তারকে তুমি কাকু বলে ডাকো, তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

পঙ্কজের ডান হাতখানা তার পকেটে রাখা লাবণীর ছবিখানাকে ছুঁয়ে ছিল।

সেখানা ফেরৎ দিয়ে যাবেন বলেই এসেছিলেন। কিন্তু তা না করে লাবণীর কথার একটুও প্রতিবাদ না করে ধীরে ধীরে ফিরে এসে গাড়িতে উঠেছিলেন পঙ্কজ। তারপর দুপুর থেকে সন্ধে অবধি একবারও না থেমে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো সারা শহরটা গাড়ি নিয়ে চক্কর দিয়েছিলেন।

সকলে দরজা খুলে পিসি অবাক, কিরে তুই এত সকালে? কি হয়েছে তোর। সারা রাত ঘুমোসনি বুঝি? সার্টের পকেট থেকে লাবণীর ফটোখানা বার করে পিসির হাতে দিয়েছিলেন পঙ্কজ। পিসি আমি রাজি। এই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ের ঠিক করো তুমি। বাবারও মত আছে।

হাত দিয়ে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিলেন পিসি। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন, কাল সারাদিনের মধ্যে কথাটা আমার বলতে পারলিনে।

কেন কি হয়েছে পিসি?

মেয়েটা আর নেইরে। ঘরের ফ্যানের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিল।

গাড়ি থামিয়ে পঙ্কজ বললেন, নামুন।

এখানে?

হ্যাঁ।

এখানে কে আছে?

সন্দীপ।

পাশাপাশি হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে দুজনে দোতলায় উঠে এলেন ম্যারেজ রেজিস্টারের ঘরে সন্দীপ ছাড়া আরও দুজন মানুষ। প্যান্ট-সার্ট পরা বেশ বাবু ধরনের চেহারা তাদের। সন্দীপ তাদের সঙ্গে কথা বলছিল।

পঙ্কজকে ঢুকতে দেখে দরজার কাছে সরে এলো। এত দেরী হলো তোমার,কই পাত্রী কই?

পঙ্কজ কথার উত্তর না দিয়ে পাশে সরে দাঁড়ানোর পর মেঘনাকে দেখতে পেল সন্দীপ। হঠাৎ এখানে মেঘনা কেন এসেছে তা বুঝতে সময় লাগছিল তার। তার আগেই পঙ্কজ মেঘনাকে বললেন এই চেয়ারটাকে বসুন। আপনাকে আমি আধ ঘণ্টার আগেই ছেড়ে দেব।

মেঘনা নীরবে সামনের চেয়ারটাতে বসেই অবার উঠে দাঁড়াল। একটা দুর্বোধ্য রহস্য সমাধান করার মতো সাহসী গলায় প্রশ্ন করে উঠলো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমাকে আপনি এখানে নিয়ে এলেন কেন?

পঙ্কজ তার মুখোমুখি চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে সহজ ঝকঝকে গলায় বললেন, বারে, আপনি না এলে বিয়ে হবে কেমন করে?

বিয়ে, কার বিয়ে?

আপনার সঙ্গে আমার।

পঙ্কজের দুটো চোখ প্রদীপ হয়ে মেঘনার মুখের ওপর অপলক হয়ে থাকলো। পরক্ষণে হেসে ফেললেন পঙ্কজ—আপনার মা বলেছেন আপনাকে বিয়ে করলে আমি সুখী হবো না। আপনি নাকি খুব অহংকারী। আমি জানি আমি সুখী হবো।

মেঘনা তাঁর কথার উত্তরে একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না। চোখ ঘুরিয়ে পাশে দেখল। তারপর সন্দীপকে, তারপর দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, আপনি কি পাগল?

আমাকে পাগল বললেন আপনি?

তার চেয়ে আর কোন উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেলাম না। সন্দীপদা চলে আসুন।

মেঘনার দরজার কাছ অবধি গিয়ে আবার দাঁড়াল। তার কপালে দু ভ্রুরুর মাঝখানে ছোট্ট কালো টিপটা হঠাৎ আশ্চর্যভাবে দগদগে সূর্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কিন্তু যা আশংকা করছিলেন পঙ্কজ তা ঘটলো না। ভয়ংকর ভাবে রেগে ওঠার বদলে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল মেঘনা।

পঙ্কজ তার একখানা হাত ধরলেন, Please কাঁদবেন না। কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল, শুধু বাঁচার জন্যে বেঁচে থাকা যায় না। যতবার এই কথাটা ভেবেছি ততবারই আপনার কথা মনে হয়েছে। আশ্চর্য একটা অমূল্য হীরের মতো এই ইচ্ছাটাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি আর বার বার মনে হয়েছে কেউ জানতে পারলে আমার ইচ্ছেটা চুরি হয়ে যাবে...। এমনকি সন্দীপকেও বিশ্বাস করিনি আমি।

পঙ্কজ যখন কথাগুলো বলেছিলেন মেঘনা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখের পাতায়, ঠোঁটে, থুতনীতে একটা ঝড় ক্লান্ত হয়ে থমকে থাকার মতো করে ছায়া ফেলেছিল। এখন আর কাঁদছিল না সে। তবু ঠোঁট দুটো শির শির করে কাঁপছিল।

পঙ্কজের কথা শেষ হওয়ার পর তার হাতের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল মেঘনা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকলো।

ছিঃ, এ তুমি কি করলে? সন্দীপ এতক্ষণ পর কথা বলল। উত্তেজনায় তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে দুপাশে। চোখের মণিতে কিন্তু ধিক্কার নেই। তার বদলে ঘন হয়ে আছে সীমাহীন বিস্ময়।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেছিলেন পঙ্কজ। তার পেছনে সন্দীপ। এতক্ষণ সময় ধরে দুজনের মধ্যে একটা কথারও বিনিময় হয়নি। এইটুকু সময়ের মধ্যে সন্দীপ এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করে ফেলেছিল। জীবনের সবচেয়ে বড় বাজিতে হেরে গেলে মানুষকে যেমন অসহায় আর তৃষ্ণার্ত দেখায় পঙ্কজকে ঠিক তার উল্টো দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল জীবনকে বাজি খেলে যে

খেলাটা এতক্ষণে তিনি খেলেছিলেন সেটাতে তিনি অন্যের ভূমিকা পালন করেছেন মাত্র।

সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছে পঙ্কজ থমকে দাঁড়ালেন—

নীচ থেকে ওপর দিকে উঠে আসছে মেঘনা।

কাছাকাছি এসে মেঘনা বলল, সন্দীপদা, আমাকে কোথায় সই করতে হবে বলুন।

সন্দীপ এবারও কোন কথা বলতে পারলো না। তার বদলে পঙ্কজ বললেন, আমার সঙ্গে আসুন।

ওপরে উঠে আসার পর সেই মানুষ দুটি এগিয়ে এসে বলল, বেনারসী ফুল আর যা যা দরকার সব আমাদের কাছে ভাড়ায় পাবেন।

ওসব থাক্, খুব আস্তে বলল মেঘনা, তার কপালের দু ভ্রুরুর মাঝে ছোট্ট কালো টিপটা এখন কাচ পোকার টিপ হয়ে জ্বল জ্বল করছে। দুচোখে তার স্নিগ্ধ আলো পড়েছে। ঠিক নতুন কনের মত লজ্জা আর স্বপ্নের চিহ্ন কোথাও নেই। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই মেঘনা অচেনা এক মেঘনার রূপান্তরিত হয়েছে।

পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে বসলেন পঙ্কজ এবং মেঘনা। ঠিক উল্টোদিকের চেয়ারে রেজিস্টার ভদ্রলোক। তার চোখে কৌতূহল—

আপনাদের বুঝি ভালোবাসার বিয়ে?

হ্যাঁ। পঙ্কজ হেসে ফেললেন।

আংটি, হারটার কিছু এনেছেন সঙ্গে? অসহায় ভাবে পঙ্কজ মাথা ঝাঁকালেন, এসব এখন লাগে বুঝি?

রেজিস্টার ভদ্রলোক বললেন, আমাদের আমলে তো এসব বিয়ের চল্ ছিল না। তখন লাগতো। বিয়ে মানেই তো নতুন গহনা, নতুন শাড়ি, সম্পূর্ণ নতুন একটা জীবন। নিন্ দুজনেই সই করুন। সাক্ষী এনেছেন?

সন্দীপ বলল, আমি।

আরো দুজন চাই।

আমরা আছি—সেই মানুষ দুটি পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, আপনাকে এর জন্যে আমাদের কিছু দিতে হবে না।

নিন্। আপনি আগে। পকেট থেকে পেন নিয়ে পঙ্কজ মেঘনাকে দিলেন। তারপর ছাপানো ফর্মখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন।

বিয়ে শব্দটার মধ্যে অদ্ভুত একটা মাদকতা আছে। একসঙ্গে এক ঝাঁক স্বপ্ন আর নিজেকে অন্যরকম ভাবে আবিষ্কার সীমাহীন উত্তেজনা। নিজে একটুও উত্তেজিত হননি পঙ্কজ। তবু বুকের গভীরে কোথাও প্রবল বর্ষণের পর কলাগাছের পাতা বেয়ে টুপটাপ জলের ফোটা পড়ার মত একটা সুর স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলেন। সই করার সময় মেঘনার আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপতে দেখে পঙ্কজের

ভালো লাগলো তার জীবনে এতবড় একটা পালা বদল ঘটে যাচ্ছে তার প্রতিধ্বনি কোথাও কোনো সাড়া না জাগালে কি ভালো লাগে?

এরপর মেঘনার চোখের কোল বেয়ে টপ করে যদি একটি অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়ে তাঁতেও অবাক হবেন না তিনি।

সই-টই হয়ে যাবার পর পঙ্কজ দাঁড়িয়ে উঠে চারপাশে তাকালেন। সত্যিই এখন এই মুহূর্ত আর ফুলের কথাই মনে পড়ছিল।

রেজিস্টার ভদ্রলোক বললেন, ও মশাই শুনছেন?

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে এক কাজ করবেন। একটা ভালো দিন আর সময় দেখে ছাদনা তলায় বিয়েটা করে নেবেন। পঙ্কজ বললেন, কেন, এই মাত্র তো বিয়ে করলাম আমরা।

ভদ্রলোক মেঘনার দিকে তাকালেন। বুঝলেন ম্যাডাম, বিয়ের সময় আমার মার বয়স ছিল এগারো আর বাবার যোল। মার বাবা, মানে আমার দাদু মার রং কালো ছিল বলে চাপা রং-এর বেনারসী দিয়েছিলেন তাতে কুড়ি ভরির সোনার জরি ছিল।

পঙ্কজের মনে পড়ে গেল মেঘনাকে আধঘণ্টার মধ্যেই হাসপাতালে নামিয়ে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু তখন তো সম্পূর্ণ অন্য ছিল মেঘনা। এখন তাঁর স্ত্রী। মাত্র পনেরো মিনিট আগে যার বিয়ে হয়েছে তাকে কি এখন হাসপাতালে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে দেওয়া উচিত?

পঙ্কজ কিছু বলার আগেই মেঘনা বলল, আমি এখন যাবো সন্দীপদা।

যাবে, আচ্ছা—

মেঘনা কারুর দিকে না তাকিয়ে আবার বলল, সমরকে দেখে হাসপাতাল থেকে আমি বাড়ি যাবো। সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। মেঘনার শেষ কথাটা পঙ্কজকে বলা। খুব সাধারণ কটা শব্দ—তাও পঙ্কজ চমকে ওঠার মত করে মেঘনার দিকে তাকালেন। একটা ছাপানো কাগজের ওপর দুটো সই—কি আশ্চর্য ভাবে দুজনকে অমোঘ সত্যের মতো এক করে দিয়েছে। যার ফলে তাঁর বাড়িটাকেই ফিরে আসার ঠিকানা বলে ভাবতে শুরু করেছে মেঘনা। একটু পরে সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নীচে নামছিলেন তাঁরা তিনজনে।

শেষ ধাপে পা রেখে সন্দীপ হঠাৎ বলে উঠলো, তুমি পঙ্কজের সঙ্গে কোথাও চলে যাও মেঘনা। অনেক দূরে কোথাও—আমরা চেষ্টা করেও যেন তোমায় খুঁজে না পাই।

সন্দীপের কথা শেষ হবার আগেই মেঘনার দুচোখের পাতার আড়ালে কান্নার আভাষ এসে গেল। সে বলে উঠলো, আপনি আমায় এত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করলেন, সন্দীপদা?

এত তাড়াতাড়ি—,

হ্যাঁ তাই। সন্দীপ বলল, সময় আর কতক্ষণ আছে জানিনা। হয়তো আজকের রাত্তিরটুকু। তারপর আমিও থাকছি না। সময়ের কাজটাজ শেষ করে বিলাসপুরে চলে যাবো ঠিক করেছি। তুমি একলা এতদূর পথ কার সঙ্গে হাঁটবে? আমাদের গ্রুপটা আর থাকবে না, মেঘনা।

(১৬)

বাবা—

সুমিতা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এত রাতে সচরাচর সুমিতা কেন, কেউই তার ঘরে আসেনা।

বড় সোফার কোণায় পা গুটিয়ে বসে আছেন পঙ্কজ। তাঁর পাশে মুখ খোলা ছোট্ট একটা কিড ব্যাগ। পরিপাটি করে গোছানো বিছানার ওপর ধবধবে সাদা চাদর পাতা। দুটো মাথার বালিশও সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা।

চারপাশে এত সাদা দেখলে সুমিতার কেন যেন খুব ভয় করে। সম্ভবত অনিরুদ্ধ এখনো ফেরেনি। সে বাড়ি থাকলে বোঝা যায়। আজকাল প্রায়ই বেশ রাত করে বাড়ি ফেলে সে। বড় ব্যবসা চালাতে গেলে শুধু অফিসে বসে থাকলেই চলে না। আসল ব্যবসা হয় অফিসের পর।

চেম্বারের মিটিং, বড় হোটেলে ডিনার অথবা মন্ত্রীর সঙ্গে খানাপিনা কিছু না কিছু থাকেই রোজ।

ছোট থেকেই অনিরুদ্ধ একটু অন্য ধরনের। বেশী বন্ধুবান্ধব নেই তার। কলেজ বাড়ি আর বই এই নিয়েই তার জগত। পঙ্কজ ছেলেকে ভাল করে চেনেন।

অনিরুদ্ধ অনেকটা তার মার স্বভাব পেয়েছে। কম কথা বলে আর একটু অহংকারী। জামা কাপড়ে ফিটফাট নিখুঁত। ডিসেন্ট বাট ডিসিপ্লিনড্।

কথাটা অনেকদিন পরে মনে পড়লো তাঁর। বাবা বলতেন পঙ্কজকে কথাটা। যেদিন প্রথম বাবার বদলে বাবার চেয়ারে বসেছিলেন পঙ্কজ, সেদিনও এই একই কথা বলেছিলেন বাবা।

বলেছিলেন, মানুষের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী কাজ নিতে হবে তোমাকে তাই ডিসেন্ট হতে হবে। হার্ড এন্ড হার্স মানুষকে কেউ পছন্দ করে না, বিশ্বাসও করে না। ঠিক একই ভাবে পঙ্কজও তাঁর চেয়ারে অনিরুদ্ধকে বসিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে এসেছিলেন। কিন্তু বাবার কথাগুলো তাকে বলেন নি।

আর একটা কাজও তিনি কখনো করেননি। অফিস ছেড়ে আসার দ্বিতীয় দিনে আর কখনো অফিসে পদার্পণ করেন নি।

প্রথম প্রথম অনিরুদ্ধ প্রায়ই বলতো, আপনি একবার চলুন, একটা ব্যাপারে আপনার পরামর্শ দরকার। না, আমাকে আর যাবার কথা বলো না অনিরুদ্ধ, তাছাড়া

নিজের ব্যবসার ব্যাপারে বাইরের কারুর কাছ থেকে তুমি পরামর্শ নেবে কেন?

আপনি বাইরের লোক, অনিরুদ্ধ অবাক হয়ে প্রতিবাদ করেছিল, কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলেছি।

এত বড় ব্যবসা এত দায়িত্ব আপনি সব আমার একলার ওপর ছেড়ে দিলেন, একবারও ভাবলেন না আমি এই দায়িত্ব সামলাতে পারবো কিনা।

আমিও তোমার মত করে সব একলাই সামলেছি, পঙ্কজ বেশ উত্তেজিত হয়েছিলেন কথাটা বলার সময়। মানুষকে সব কিছু একাই করতে হয়। যে পারে না সে অযোগ্য। অনিরুদ্ধ বেশ শান্ত অথচ স্পষ্ট গলায় নিজের কথাটা জানিয়েছিল, ট্রেড ডেলিগেশনের মেম্বার হয়ে যে পনেরো দিন এখানে ছিলাম না, তারপর ফিরে এসে দেখি সব দিকে গণ্ডগোল।

এটা তোমার অযোগ্যতা অনিরুদ্ধ। কথাটা বলতে বলতে ঘরে উপস্থিত দ্বিতীয় জন অর্থাৎ মেঘনার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন পঙ্কজ। তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে জানানোর দরকার অনিরুদ্ধ, আমাকে যদি আবার অফিসে যেতে হয় তোমাকে কিন্তু বাড়ি ফিরে আসতে হবে। হ্যাঁ মেঘনা, তোমার পুত্রকে বলে দাও, তারপর আবার ওকে অফিসে ঢুকতে হলে আমাদের কাগজে দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখে, চাকরির দরখাস্ত করে ইন্টারভিউ দেবার পর সিলেক্ট হলে তারপর। আর হ্যাঁ, পোষ্টটা তখন ইউ ডির বেশী কিছুতেই হবে না।

মেঘনা বলেছিলেন, তুমি এভাবে ওর সঙ্গে কথা বলছো কেন? ও যখন বলছে তখন যাওনা একবার অফিসে। পুরনো জায়গায় গেলে তোমারও ভাল লাগবে।

পঙ্কজ এবার হেসে ফেলেছিলেন। তুমিও আমায় যেতে বলছো? কিন্তু তুমি কি জানো ওখানে আমার জন্যে কোন চেয়ারই নেই।

না বাবা, আপনার চেম্বার, আপনার চেয়ার ঠিক যেমন ছেড়ে এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই আছে।

হ্যাঁ আছে তা আমিও জানি। তোমার মতো আমার কাছে চেয়ার মানে একটা কাঠ আর লোহার স্ট্রাকচার নয়, তার চেয়েও বেশী কিছু। অনেক বেশী কিছু। এছাড়াও আব একটা কথা আছে অনিরুদ্ধ, ছেড়ে আসা চেয়ারে আর কখনো বসতে নেই। আমি শুনেছি আমি চলে আসার পর তুমি অফিসের অনেক অদল বদল করেছে।

না, তেমন কিছু নয়। অনিরুদ্ধ বলেছিল, শুধু ভিজিটার রুমটা নতুন করে রিনোভেট করেছি।

গুড্। very good. খুব ভালো করেছ। ওখানে একখানা বড় ছবি টাঙানো ছিল, ছবিখানা আমি একটা একজিবিশন থেকে---

ছবিখানা পুরনো হয়ে গিয়েছিল বাবা—

পুরনো হওয়াটা তোমার কাছে তাহলে একটা খুব বড় অপরাধ। ঐ ছবিখানা, পঙ্কজের কথা শেষ না হতেই অনিরুদ্ধ বলেছিল, আমি জানি মার আঁকা।—

বাঃ, তা জানার পরেও ওটা খুলে ফেললে?

ছবিখানা বাড়িতে এনে রেখেছি। একটা ভালো জায়গা দেখে টাঙ্গিয়ে রাখবো।

পঙ্কজ রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তার আগে দুজনকে অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলে ছবিখানা বিক্রি করে দেবে বলে।

আর একটিও কথা না বলে তাঁর সামনে থেকে উঠে গিয়েছিল অনিরুদ্ধ।

না, এরপরেও আগের মতই থাকে তাঁর আর অনিরুদ্ধর সম্পর্ক। দুজনে দুজনকে বুঝতে পারলে ভুল বোঝার বিভ্রান্তি থাকে না।

(১৭)

অনিরুদ্ধ এখনো ফেরেনি সুমিতা?

না। মাকে বলে গিয়েছে দেরী হবে।

বিয়ের পর থেকেই সুমিতাকে নাম ধরে ডাকেন পঙ্কজ। প্রথম দিকে মেঘনা কয়েকবার তাঁকে বলেছিলেন, ওকে বৌমা বলে ডাকলেই পারো।

তুমি তো তাই বলো। দুজনার মুখে দুরকম ডাক শুনলে এক ঘেয়ে লাগবে না।

তাঁর যুক্তি শুনে মেঘনা আর কিছু বলেন নি। বিয়ের পর থেকে একটানা একবছর অদ্ভুত একটা দূরত্ব ছিল তাঁর আর মেঘনার মধ্যে। দুজনে দুজনকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন। বাড়ির ঝি চাকর কারুর কাছে ব্যাপারটা গোপন ছিল না।

বিয়ের মাসখানেক পরে, একদিন মেঘনার মা তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। পঙ্কজ তখন বাড়িতেই ছিলেন। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, আসুন, আসুন।

মেঘনা কোথায়?

নিজের ঘরে, আসুন আমার সঙ্গে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দাঁড়িয়েছিলেন মেঘনার মা। তুমি কিন্তু আমায় সত্যি কথা বলোনি।

কোন্ কথাটা।

বলেছিলে মাথা গোঁজার মতো ছোট একটা বাড়ি আছে তোমার আর- ?

বোধহয় ঠিকই করেছিলে। নইলে তোমাকেও আমার অহংকারী বলে মনে হতো।

কিছুক্ষণ থেকেই আবার ফিরে গিয়েছিলেন মেঘনার মা।

রাতে খাবার টেবিলে বসে মুখে খাবার তোলার আগেই মেঘনা প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি কি আমাদের বাড়িটা কিনে নিয়েছেন?

হ্যাঁ।

কত টাকা লেগেছে?

বোধহয় সাত লাখ টাকা। একটু বেশীও হতে পারে। তাছাড়া বাড়িটা ঠিক আমি কিনিনি, আমার কোম্পানী কিনেছে।

দুটোর মধ্যে তফাৎ কি?

কোন ইনকাম ট্যাক্সের ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলেই তফাৎটা বুঝিয়ে দেবে।

ঐ একটা ভাঙ্গা চোরা বাড়ির জন্যে সাত লাখ টাকা দিলো আপনার কোম্পানী?

কথাটা এভাবেও বলতে পারা যায়, পঙ্কজ মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বললেন, আমার কোম্পানী এখন সাত লাখ টাকা ইনভেস্ট করলো পাঁচ বছর বাদে সত্তর লাখ টাকার মুনাফা মানে Profit করবে বলে।

পঙ্কজ যেভাবে এক কথায় লাভের হিসেবটা বুঝিয়ে দিলেন তা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না মেঘনা। তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল, এর পেছনে নিশ্চয় আরো কিছু আছে যা তাঁকে বলা যায় না। বা বলবেন না পঙ্কজ।

কথাটা মেঘনার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মেঘনার মন সব কিছু রহস্যের সমাধান করে ফেলল এবং তার মনে হলো একটা দুরন্ত ভয় তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত উঠে আসতে শুরু করেছে।

সমর। হ্যাঁ সেই হচ্ছে পঙ্কজের বাড়িটা কেনার কারণ। কলকাতায় এসে প্রথম দিকে তিনমাস সময় ঐ বাড়িটার একতলায় থাকতো। মেজকাকা তাকে মাসে দেড়শো টাকায় একখানা ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন। আর্ট কলেজের করিডোরে তাকে দেখে সময় এগিয়ে এসেছিল, আপনি এখানে?

আপনি যে কারণে আমিও সেই একই কারণে এখানে,

মেঘনা বলেছিলেন, আমার ফাইন আর্টস, আপনার?

আমারও।

তাহলে আপনি হলেন আমার বাড়িউলি।

বাড়িউলি শব্দটা বড্ড বাজে। ওটা আর কখনো উচ্চারণ করবেন না।

সরি।

তিনমাস পরে সমর গম্ভীর মুখে একদিন কলেজ ক্যান্টিনে মেঘনাকে বলেছিল, কাল থেকে আপনি আর আমার বাড়িউলি থাকছেন না।

কেন?

অন্য একটা মেসে উঠে যাচ্ছি কাল। আপনার কাকা বলে দিয়েছেন আজই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

কাকা—কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে সোজা কাকার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন মেঘনা।

আপনি নাকি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে কাকা বলেছিলেন, তুমি যা বলতে এসেছ তা আমি জানি।

সমরতো আপনার ভাড়া বাকি রাখেনি?

দেড়শো টাকার জন্যে আমি ফ্যামিলিটাকে নষ্ট করতে পারবো না। ও যা নোংরা সব ছবি আঁকে তুমি দেখনি—

ওই সব ছবি সবাইকেই আঁকতে হয়। ক্লাসে মডেলকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকা শেখানো হয়।

কি করতে হয় আর কি করতে হয় না তা আমার জানার দরকার নেই। আমি আর ঘর ভাড়া দেব না! মেঘনার কাকা বলেছিলেন। এই জন্যেই আমার মত ছিল না তুমি ছবি আঁকার লাইনে যাও। তা তোমার মা তো আমি ভাল পরামর্শ দিলেও মনে করেন আমি শত্রুতা করছি।

মনের ভয়টাকে মেঘনা অনুভভ করতে করতে বললেন, বাড়িটা তা হলে ভেঙ্গে ফেলা হবে?

পঙ্কজ তাঁর কথাটা বুঝতে না পেরে তাকালেন, কেন ভেঙ্গে ফেরা হবে কেন?

তাইতো করে সবাই। পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করে।

না না, এ সব কিছু এখনো ভাবিই নি। তাছাড়া আপনার কাকা বাড়ি ছাড়ার জন্যে তিনমাস সময় চেয়েছেন।

না।

এই একটা না শব্দ মনের মধ্যে একটা স্বস্তির বাতাস খেলে গেল মেঘনার। অন্তত একটা জায়গায় পয়সার অহংকার আর দম্ভ জিততে পারে নি।

মুখ বুজে খাচ্ছিলেন পঙ্কজ। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয় না বলেই চলে। শুধু পঙ্কজ প্রশ্ন করেন আর তার উত্তর দেন মেঘনা।

তাঁদের বিয়েটা যেমন অদ্ভুতভাবে ঘটেছিল ফুলশয্যাও ঠিক তাই।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে সোজা হাসপাতালে চলে গিয়েছিলেন মেঘনা।

ওকে তুমি যেতে দিলে কেন? সন্দীপ বলেছে, এখন থেকে তুমিই ও সব কিছু। পঙ্কজ তার কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বলেছিলেন, চলো, আমরা দুজন কোথাও গিয়ে একটু বসি। বারে যাবে?

না। মদ এখন ভাল লাগবে না। আন্য কোথাও—। তারপর সন্দীপকে খুব অবাক করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, কোথাও ছবির একজিবিশন হচ্ছে নাকি, তাহলে চলো সেখানে কিছুক্ষণ কাটাই। ছবির একজিবিশন দেখতে যাবে তুমি, এখন? এইমাত্র তোমার বিয়ে হলো, ছবি ছাড়া আর কিছু মনে এলো না তোমার

আশ্চর্য।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিয়ে মানে পরস্পরের বোঝা পড়া। সেটা যার যতো বেশী সে তত সুখী। আমি যাকে একটু আগে বিয়ে করলাম এবং যে বিয়েতে সাক্ষী হিসেবে তুমি রেজিস্ট্রারের সামনে সই দিলে—তার জীবনের সবটুকু জুড়ে এত দিন কিছু ছিল না। ছবি যদি আমি না বুঝি তাহলে তাকে বুঝবো কেমন করে?

সারাদিন অসহ্য গুমোটের পর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলে যেরকম মনে হয় সন্দীপের ঠিক সেইরকম মনে হলো পঙ্কজের কথা শোনার পর। এতক্ষণ ধরে যে বুকচাপা আশংকাটা সে মুখ বুজে বহন করছিল একপলকে তা উধাও। ছবির একজিবিশন দেখার কথা বললেও পঙ্কজ শেষ অবধি সন্দীপকে নিয়ে একটা বারেই ঢুকেছিলেন। ওই কোনার টেবিলটাতে বসি চলো।

সামান্য পরে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেবার আগে পঙ্কজ হঠাৎ সন্দীপের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেঘনা কি সমরকে ভালবাসে সন্দীপ?

ডোন্ট বি সিলি পঙ্কজ—হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সন্দীপ, তোমাদের দুজনের মধ্যে আমাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করো না। আই হেট দিস।

পঙ্কজ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেছিলেন, সমর আর মেঘনা এক বাড়িতে থাকতো, একই বিষয় নিয়ে দুজনে একই জায়গায় পড়াশোনা করেছে—। তারপরেও কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠাটা কি অসম্ভব?

ছিঃ পঙ্কজ ছিঃ, সমর আর এক ঘণ্টাও বাঁচবে না জেনেও তুমি এই কথাটা ভাবতে পারলে?

আমি কিছু ভাবিনি, কিছুই না। নাও গ্লাসটা শেষ করে ওঠো, মেঘনাকে আমি আনতে যাবো। কথাটা শেষ করে সত্যিই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন পঙ্কজ। পার্স থেকে একখানা একশো টাকার নোট বার করে টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে দরজা লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

খানিকক্ষণ পর নিউ মার্কেটের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে পাশে বসা সন্দীপকে বলেছিলেন, নামো।

এখানে নামবো কেন?

হ্যাঁ নামবে। নামো ঝটপট, ভালো দেখে ফুল কিনে আনো, বন্ধুর বিয়েতে উপহার দিতে হয়, জানোনা?

ঝড়ের মুখে হাল্কা পাখির মত প্রায় উড়তে উড়তে নিউ মার্কেটের বাড়িটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সন্দীপ। পাঁচমিনিট বাদে যখন ফিরে এসেছিল তখন তার দুহাতের মধ্যে একবোঝা ফুল।

নাও, গোলাপ এনেছি তোমার আর মেঘনার জন্যে।

ফুলের তোড়াটা নিজের পাশে রেখে পঙ্কজ সন্দীপকে বলেছিলেন ওকি, তুমি

আবার গাড়িতে উঠছো কেন?

নো ব্রাদার নো, আমি আমার বৌকে আনতে যাচ্ছি, তুমি এবার কেটে পড়ো।

আধঘণ্টারও বেশী সময় ধরে রাস্তা ভোলা মানুষের মতো এলোমেলো সমস্ত নিউ মার্কেটটা চষে বেড়াল সন্দীপ।

কর্পোরেশনের বাড়িটার সামনে ত্রিকোণ ফাঁকা জায়গাটাতে কারা যেন একবার ছবি টাঙ্গিয়ে পথ চলতি মানুষদের মন ও চোখ টানার চেষ্টা করেছিল। সন্দীপ তখনো জানেই না সে নিজেও একদিন ছবি আঁকাটাকেই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করবে। এখন আর এখানে কেউ ছবি টাঙ্গায় না তার বদলে হরেক রকম পণ্যের দোকান বসিয়েছে, ফোমের ব্যাগ থেকে চটি জুতো, রুমাল থেকে কাচের চুড়ি।

একি সন্দীপদা, আপনি এখানে কি করছেন?

তোমরা এখানে।

জগদীশ আর প্রদীপ্ত মাথা নীচু করে থাকলো এক মুহূর্ত। তারপর ভাঙ্গা গলায় বলল, সমরের জন্যে ফুল কিনতে এসেছি।

চোখ তুলে তাদের দিকে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকলো সন্দীপ। তারপরই নিজেকে শুনিয়ে মনে মনে বলল, তোর মারাটা বড় কষ্টের রে সমর, আর একটু ভালভাবে মরতে পারলি নে তুই।

মুখে বলল, মেঘনা কোথায়?

হাসপাতালে।

ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও এক্ষুনি।

মেঘনা রাজি হবে না সন্দীপদা।

রাজি না হলে জোর করে পাঠিয়ে দাও। ওর ওখানে থাকতে নেই।

কেন, থাকতে নেই কেন বলছেন?

সন্দীপ বলল, আজ একটু আগে মেঘনার বিয়ে হয়েছে।

(১৭)

গাড়ি থেকে মাটিতে পা দিয়ে খুব অবাক হয়েছিল মেঘনা। চারপাশে বাগানঘেরা মস্তবড় সাজানো গোছানো বাড়ি। এ ধরনের কোন বাড়িতে আগে কোনদিন মেঘনা ঢোকেনি। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বিস্ময় মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখেছে।

তাদের নিজের বাড়িটাও তেতলা। কিন্তু তার সারা দেহে দারিদ্র্যের চিহ্ন। পলেস্তরা খসা, চারপাশে ইঁট বার করা। কেনো একদিন তার দেহে একটা চোখটানা রং হয়তো ছিল এখন তার চিহ্নও নেই। ইদানীং বাড়িটাকে নিজের বাড়ি বলতে লজ্জা করতো তার।

সন্দীপ শুনলে বলতো, একথা বলোনা মেঘনা, মরা হাতি লাখ টাকা। শুনলাম,

পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় তাঁর নতুন ছবি মনসুর মিঞার ঘোড়ার জন্যে এই ধরনের একটা বাড়ি খুঁজছেন, ফোন করে দেখব নাকি একবার? যদি পছন্দ হয়ে যায় তাহলে মোটা টাকা পেয়ে যাবে।

তার কথা শুনে মেঘনা প্রতিবাদ না করে হেসে ফেলেছিল। সত্যি সন্দীপদা, টাকাটা পেলে আমাদের গ্রুপটা কিন্তু দাঁড়িয়ে যাবে। ওই টাকা দিয়ে দিল্লিতে একজিবিশন করবো আমরা।

তিন চারজন মহিলা ও পুরুষ গাড়ির শব্দ পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। পঙ্কজ খুব নীচু গলায় বললেন, দোতলায় যেতে হবে।

দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালেন পঙ্কজ। একটি বিধবাকে লক্ষ্য করে বললেন, কখন এলে পিসি?

এখুনি। হ্যাঁরে, তুই নাকি বিয়ে করেছিস?

এই তো বৌ।

বিধবা মহিলা মেঘনাকে দুহাতে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তোর সব কিছুতেই বিচিত্র সব কারবার, বিয়ে করবি কাক পক্ষীতেও টের পেল না। বাড়ির কাজেল লোকদেরও নাকি বলিস নি বৌ য়িয়ে সোজা বাড়িতে আসছিস।

বারে, না বললে তুমি কোথা থেকে খবর পেলে।

পিসি একছড়া ভারী সোনার হার বের করে মেঘনার গলায় পরিয়ে দিলেন। বললেন, এটাই শেষ নয় বৌমা, আরো একটা হীরের নেকলেশ করিয়ে রেখেছি, তাড়াতাড়ি লকার থেকে আনতে পারিনি।

একই সঙ্গে ভয়, আনন্দ এবং রোমাঞ্চ মেঘনার বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল না কি করবে। হঠাৎ কিছু না ভেবেই হেঁট হয়ে পিসিমাকে প্রণাম করলো এবং তার পর রক্তিম মুখে পাশে চোখ ফিরিয়ে দেখল পঙ্কজের দুটো চোখ অপলক হয়ে আছে।

এটা আপনার ঘর, দোতলায় উঠে এসে লম্বা করিডোরের শেষে দাঁড়ালেন পঙ্কজ। পাশের ঘরটা আমার। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই মেঘনা দেখতে পেল ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বড় খাট। খাটখানা আগাগোড়া ফুল দিয়ে সাজানো।

ঠিক কৃতজ্ঞতা নয় অথচ তেমনিই একটা কিছু তার বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠলো।

নিজের বাড়ি ঘর, নিজের জীবন সব কিছুর সঙ্গে তুলনাটা আপনা থেকেই এসে যাচ্ছিল। যে মানুষটা তার হাত ধরে একরকম দস্যুর মতন এই ঐশ্বর্যময় জীবনে টেনে নিয়ে এলো তাকে কতটুকু চেনে সে? প্রথম দিনের পরিচয় থেকে আজ অবধি কটা কথা হয়েছে তাও হাতে গুনে বলে দেওয়া যায়। এই সুখ, এই ঐশ্বর্যের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েও খুব আশ্চর্যজনক ভাবে মেঘনার মনটা তাব

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। হাসপাতালের একটা ঘরের এককোণে লোহার খাটে শুয়ে থাকা একটা মানুষ—ডাঃ দত্ত যাকে বলেছেন এখনো বেঁচে থাকাটাই যার অসম্ভব সেই মানুষটির ঘোলাটে দুটে চোখ তার মৃত্যুর ছায়াপড়া মুখখানা ভেসে উঠলো তার মনের মধ্যে। কয়েক মিনিট আগে পিসিমার দেওয়া ভারি সোনার হার, ঘরের ভেতরে ফুল দিয়ে সাজানো খাট এবং পঙ্কজ নামের একটা দামী নামী পুরুষ কেউই মেঘনাকে সুখী করতে পারলো না। বরং তার মনে হলো—সে নিজে একটা স্বার্থপর, একটা বিশ্বাসঘাতক মেয়ে—সমরের মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

সমর কি মারা গেছে?

জানিনা।

নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। ড্রাইভারকে বললেই পৌঁছে দেবে।

কথার পর পঙ্কজ করিডোব দিয়ে হেঁটে এসে একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। এবং সেই মুহূর্তে পেছনে হাল্কা পদশব্দ শুনে মুখ তুলে দেখলেন পিসিমা।

একি তুমি এখানে?

তুই এ কাকে বিয়ে করে আনলি পঙ্কজ?

কেন পিসিমা একটা মেয়েকে। মেঘনা তো বেশ সুন্দরী তোমার পছন্দ হয়নি?

না।

সেকি, একথা কেন বলছো?

লাবণীকে তুই মরতে দিলি, নইলে সেই তোকে সব চেয়ে সুখী করতো।

না না তুমি জানোনা পিসিমা. লাবণী নিজেই আমাকে বিয়ে করতো না।

ও আমায় বলেছিল ও তোকে পছন্দ করে। ওর ফটোখানা আমার দেবার সময় বলেছিল, তোমার ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি খুব ভালো হয়ে যাবো। একথা কেন বলেছিল রে? ও তো ভালোই ছিল?

তুমি তো চাইতে লাবণীর সঙ্গেই আমার বিয়ে হোক। বাবার কাছে আনেকবার প্রস্তাব দিয়েছ। জোর করে তুমি আর বাবা মিলে আমাব বিয়ে দিলে লাবণীর সঙ্গে হয়তো আমার বিয়ে হয়েই যেত। তোমার যে হীরের হারটার কথা তুমি একটু আগে মেঘনাকে বললে, সেটাতো তুমি লাবণীব জন্যেই অর্ডার দিয়ে করিয়ে রেখেছিলে—

পিসি দুর্বল গলায় বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু এসব কথা তুই এখন তুলছিস কেন?

পঙ্কজ বললেন, তুলছি এই কারণে আমি তোমাকে কোনদিনই বুঝতে পারলাম না। তুমি আর জ্যোঠা আমার সব ব্যবসা আর সম্পত্তি অন্যায় ভাবে দখল করাব চেষ্টা করেছিলে, আবার জ্যাঠা যখন আমার সঙ্গে মামলা করেছিল তুমি জ্যোঠার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলে?

পিসি তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, যাই, নতুন বৌটা ও ঘরে একলা

আছে। তোরা কি দুজনে একসঙ্গে খাবি?

তাঁর কথার জবাব না দিয়ে পঙ্কজ জানলার বাইরে চোখ রেখে দেখতে পেলেন, মেঘনা পোর্টিকোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে একটা অপরিচিত যুবক।

যুবকটিকে বুঝতে পারলেন না পঙ্কজ। তাঁর কোনো কৌতূহলও হলো না।

মেঘনার পরিচিতদের মধ্যে কেউ হবে হয়তো।

কে-রে ঘরের বাইরে দিয়ে চলে যাওয়া একটা পদশব্দ পঙ্কজের ডাক শুনে দাঁড়াল। বলল, আমি।

বকুল। রান্নাঘরে কাজ করে। বছর তিরিশ বয়স। শ্যামলী, মিষ্টি চেহারা। ও বাড়িতে চাকর ঝি কোথা থেকে এসে জোটে তা জানেন না পঙ্কজ। জানতেও চান না।

কিছু বলবেন আমাকে?

নীচে কে কথা বলছে?

বকুল মুখ নীচু করে বলল, দুজন একটা সুটকেশ আর ফুল নিয়ে এসেছেন।

ফুল, সুটকেশ—বকুলের কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারলেন না পঙ্কজ। বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও।

সে চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে এসে ঘরে ঢুকলো তাকে সেখানে দেখবেন কল্পনাও করেন নি পঙ্কজ—একি। তুই এখানে?

সন্দীপ বলল, এখন আমি পাত্রীপক্ষের লোক। আমার সঙ্গে মেঘনার খুড়তুতো ভাই অনিলও এসেছে।

সন্দীপকে ধুতি পাঞ্জাবী পরার জন্যে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। তার রোজকার সেই প্যান্ট আর বুশ শার্টের পোষাকে বোঝাই যায় না আদতে সন্দীপ বেশ হ্যান্ডসাম।

পঙ্কজ মনে মনে ভাবলেন, সন্দীপ হ্যান্ডসাম না হলেও ধুতি পাঞ্জাবীতে সবাইকেই অন্য রকম দেখায়। উত্তমকুমারের কথা মনে পড়লো তাঁর। ঐ ভদ্রলোক ধুতি পাঞ্জাবী পরেই গোটা বাঙালীদের মন জয় করেছিলেন।

এইসব কথা ভাবার সময় পঙ্কজ কল্পনাও করেননি তাঁর জন্যেও একটি বড বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে।

সন্দীপ বলল, মেঘনার মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যাবার পর বললেন, মেয়েটা একখানা তাতের শাড়ি পরে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল। হাতে যে বালাটা আছে সেটাও পুরনো। তুমি বাবা আমার হয়ে এই জিনিষগুলো ওর শ্বশুরবাড়িতে পৌছে দাও।

কি এনেছিস তুই?

জানিনা, একটা সুটকেশ আর ফুল। সুটকেশের চাবি মেঘনার হাতে দিয়েছি।

সন্দীপ ভেবেছিল এই সব জিনিষ বয়ে আনার জন্যে পঙ্কজ তার ওপর রাগ

করবে। তার বদলে পঙ্কজ সম্পূর্ণ অন্য একটা প্রসঙ্গকে টেনে আনলেন, সমর কেমন আছে?

মারা গেছে। আমরা যখন রেজিস্ট্রারের অফিসে ছিলাম সেই সময়।

Sorry...পঙ্কজ বললেন, তুই এখানে এলি কি করে?

আমাদের শ্মশানে যেতে হয়নি, সন্দীপ অন্যমনস্ক গলায় বলল, হাসপাতালে শেষ মুহূর্তে বর্ধমানের কোন এক গ্রাম থেকে যেন এক মাষ্টার মশাই আর তাঁর স্ত্রী এসে উপস্থিত। তাঁরাই নাকি সমরকে মানুষ করেছেন। বললেন, ওঁদের স্কুলের সব ছাত্রের সামনে সমরকে দাহ করবেন। আমরা আপত্তি করিনি, কেন করবো বলো, আমরা তো সত্যিই সমরের কেউ নই...

সন্দীপের শেষ কথাগুলো উদগত কান্নায় ভিজে গেল। এক মিনিট চুপ করে থাকলেন পঙ্কজ। তারপর বললেন, মেঘনাকে বলেছিস?

হ্যাঁ।

একটু আগে হাসপাতালে যেতে চাইছিল। আমি আপত্তি করিনি।

খাবার টেবিলে একটি যুবক পঙ্কজকে বলল জামাইবাবু, আমার নাম অনিল। আমি মেঘনাদির ভাই। টেবিলে চারজন বসেছেন। পঙ্কজ নিজে, মেঘনা অনিল আর সন্দীপ। বিয়ের যে রকম ভোজ হয় সে ধরনের কিছু নয়। তবে সব খাবারই পাঁচ তারা হোটেল থেকে আনা হয়েছে।

সারাদিন একটা উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তার পর এই সন্ধ্যেটা বেশ শান্ত মনোরম লাগছিল। পঙ্কজের জীবনের নতুন অধ্যায়টা এইভাবে শুরু হবে তা তিনি নিজেও জানতেন না। বাবা বেঁচে থাকলে কি বলতেন? মেঘনাকে নিশ্চয়ই মেনেই নিতেন, কারণ সব কিছু এক লহমায় ঘটিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোন অন্যায় কিছু করেন নি পঙ্কজ। মেঘনার অর্থকৌলিন্য নেই সেটা তার অপরাধ নয়। মেঘনা ভালো ছবি আঁকে সেটাও তার অপরাধ নয়। পঙ্কজ জানেন, তাঁর এইভাবে বিয়ে করার পেছনে কোন বিশেষ রহস্য আছে কিনা তা খোঁজার চেষ্টা করবেন ইন্ডাস্ট্রি মহলের তাঁরই পরিচিত বন্ধু বান্ধব এবং দু-একজন উৎসাহী সাংবাদিক।

কিছুদিন পর অবশ্য সেই উৎসাহ আপনা থেকেই কমে আসবে। তখন মিসেস পঙ্কজ চৌধুরী হিসেবে মেঘনা পার্টিতে যাবে, খানদানী ব্যবসায়ীদের স্ত্রীদের সঙ্গে মিশে একসঙ্গে সমাজবেসা করবে, খবরের কাগজের রিপোর্টার ডেকে এনে তাদের ক্যামেরার সামনে বস্তীর অনাথ ছেলেদের হাতে দামী র‍্যাপিং পেপারে মোরা বই তুলে দেবে এবং অনুষ্ঠানের শেষে সাবান ঘষে ঘষে হাত ধোবে যাতে হাতে কোনও জার্ম লেগে না থাকে।

হাতের চামচেটা শব্দ করে প্লেটের ওপর রাখার জন্যে সবাই একসঙ্গে মুখ তুলে পঙ্কজের দিকে তাকাল।

অনিল বলল, আপনারা হনিমুন কোথায় যাচ্ছেন জামাইবাবু?

হনিমুন, একটু চুপ করে পঙ্কজ বললেন, সেটা তোমার দিদি জানেন।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দিদি বলল আপনি জানেন। পঙ্কজ উত্তর দেবার আগেই সন্দীপ বলে উঠলো, অনিল তাড়াতাড়ি খাও, আমার জরুরী কাজ আছে।

কথার পর সন্দীপ মেঘনার চোখে চোখ রেখে দেখলো যে অন্য একরকম চোখ করে অনিলের দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় চোখ দিয়ে অনিলকে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করছে যাতে সে আর কোন বাচাল উক্তি না করে বসে।

তুমি অনিলবাবু কি করো?

পড়ি। কলেজের পড়া শেষ করেছি। আই.এ.এম.এ বসবো ঠিক করেছি।

good, পঙ্কজ সত্যিই খুশি হয়েছেন তা তাঁর একটিমাত্র কথা থেকেই বোঝা গেল। good একেবারেই বেরিয়ে যেতে হলে খুব খাটতে হবে কিন্তু।

অনিল খাওয়া থামিয়ে বলল, জেঠিমা আপনার জন্যে ধুতি আর পাঞ্জাবী পাঠিয়েছেন আর দিদির জন্যে বেনারসী। বলে দিয়েছেন, আজকের দিনে মেয়েদের বেনারসী আর ছেলেদের ধুতি পাঞ্জাবী পরতে হয়। পঙ্কজ তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হেসে বললেন, তাই বলেছেন বুঝি?

হ্যাঁ। আর বলেছেন—

তার কথা শেষ হবার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় মেঘনা বলে উঠলো, চুপ করো অনিল। পঙ্কজ মনে করেন আহার গ্রহণের সময়টুকুই মানুষের সবচেয়ে সুখের সময়। পৃথিবীর সমস্ত জাতি এটাকে স্বীকার করে নিয়েছে একমাত্র বাঙালী ছাড়া।

আহার তো শুধু আহার নয়। তাকে ঘিরে একটা গোটা জাতির রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও রুচির প্রকাশ।

প্যারী শহরের একটা হোটেলে একবার একটি তরুণীর আহারসঙ্গী হতে হয়েছিল. পঙ্কজকে। মেয়েটির কথা আজও তাঁর মনে আছে। মেয়েটি যতক্ষণ খাচ্ছিল ততক্ষণ সময় তিনি মুগ্ধ চোখে তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এতক্ষণ সময় ধরে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতন একটি শিল্প কলা দেখালেন যার তুলনা বিরল।

মেঘনার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি রেখে চকিতে পঙ্কজের মনে সেই মেয়েটির ছবি ভেসে এলো—মেঘনাও চমৎকার করে খেতে জানে।

(১৮)

খাওয়া শেষ হলে মেঘনা নিজের ঘরে এলো। তার সঙ্গে অনিল।

তোর খুব ভাগ্য ভাল রে দিদি। তুই খুব বড়লোক হয়ে গেলি। অনিল বলল, তোমাদের ঐ ভাঙ্গা বাড়িটাতে তোকে আর একদম মানাবে না। যে গাড়িটাতে চড়ে তুই প্রথম শ্বশুর বাড়িতে এলি ওটার দাম কতো জানিস, দশ লাখ টাকা।

মেঘনা চুপ করে তার কথা শুনছিল। মাত্র কয়েকঘণ্টা সে এই বাড়িতে এসেছে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে ইঁট কাঠ পাথরের এই সৌধটার প্রতি তার মমতা জন্মানো অসম্ভব। বরং তাদের পুরনো আদ্যিকালের ভাঙ্গাচোরা বাড়িটাই তাকে বেশী টানছে।

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরনোর পর নিজেদের বাড়িখানাকে নিয়ে আট নখানা ছবি এঁকেছিল মেঘনা। তার মধ্যে দুখানা ছবি বিক্রি হয়ে গেছে।

একটা কাজ কিন্তু তুই ভালো করিস নি দিদি, অনিল বলল, আমার মাকে একটা চান্স দেওয়া উচিত ছিল, যাতে মা তোর চরিত্র ঠিক নয় বলে বিয়েটা ভাংচি দিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে।

তার কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল মেঘনা। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতে থাকলো আনিল।

হাসি থামলে মেঘনা বলল, আমি তো নিজেই জানতাম না আজ আমার বিয়ে হচ্ছে, বিশ্বাস কর।

অনিল তার ঠোঁটের হাসি জিইয়ে রেখেই বলল, আমার বিশ্বাস করা না করায় কিছু আসে যায় না।

আমার ফাদার এন্ড মাদার এই গল্পটা একদম বিশ্বাস করেনি। এখানে আসার আগে শুনলাম, ফাদার মাদারকে বলছে তোকে নাকি অনেকবার জামাইবাবুর সঙ্গে এই গাড়িটাতে করে স্বচক্ষে ঘুরতে দেখেছে। তাছাড়া শুনলাম, তোর ছবি বিক্রির ব্যাপারটা পুরো ভাঁওতা। পঙ্কজদা তোকে হাত খরচের জন্যে মুঠো মুঠো টাকা দিত সেগুলো তুই ছবি বিক্রির নাম করে হোয়াইট করতিস।

এখন আর হাসছে না অনিল। তার চোখ মাটির দিকে নামানো। মেঘনা বলল, তুই কিন্তু মিথ্যে কথাটা না বললেই পারতিস।

কোন মিথ্যে কথা বলছি আমি?

ওই তো বললি আই.এ.এস পরীক্ষা দিবি।

তোর মতো সত্যি আমার কিছু নেই দিদি। তোর মনে নেই স্কুল লিভিং পরীক্ষায় আমি অঙ্কে পঁচানব্বই আর ইতিহাসে চুরাশি পেয়েছিলাম। আমার বাবা যদি মাতাল আর লম্পট না হতো, আমার মা যদি হিংসুটে আর দুবোন যদি মিথ্যেবাদী না হতো—তাহলে আমি ঠিক তোদের দেখিয়ে দিতাম আমি কোথায় উঠতে পারি।

এই ভাইটিকে এভাবে কোনদিন দেখেনি মেঘনা। শরিকী বিবাদে শতচ্ছিন্ন যে সম্পর্ককে জন্মে থেকে চেনে মেঘনা তার কোথাও ভালবাসার সম্পর্কের নামগন্ধ নেই। ঐ বাড়িতে অনেকটাই একা একা কেটেছে মেঘনার। তার পছন্দ অপছন্দ, তার জিদ করে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া এবং সেখানে থেকে পাশ করে বেরনোর পর প্রতিষ্টার লড়াই-এ নিজেকে জড়িয়ে ফেলা—এতদূর পথে তার কেউ সমর্থক ছিল না। এমন কি তার মাও চাননি মেঘনা ছবি আঁকা শিখতে নিজের গহনাগুলো বিক্রি করে দিক।

তোর গহনাগুলো বাবা করিয়েছিলেন বিয়ের সময় লাগবে বলে, সেগুলো যে বেচে দিয়ে এলি বিয়ের সময় কি শুধু হাতে শ্বশুরবাড়ি যাবি?

সে তখন দেখা যাবে, মাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছিল মেঘনা, কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই।

তার মানে কি বলতে চাস তুই?

বলতে চাই, এ জন্মে বোধহয় তোমার জামাই দেখার শখ পূরণ হবে না। কথা বলতে বলতে হাসছিল মেঘনা। মা তার হাসি দেখে আরো রেগে গিয়েছিল। হাসি বন্ধ করে মেঘনা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, কেমন করে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে বলো মা?

পাত্র অথবা তার বাবাকে তো একতলা হয়েই তেতলায় আসতে হবে। তেতলা অবধি আসার আগেই তোমার দুই দেওর কি তাদের নিশ্চিন্তে তোমার কাছ অবধি পৌঁছতে দেবেন?

ওরা তো অমানুষ।

মা, আমাদের সম্পর্কেও ওরা একই কথা বলেন। আর কথা না বাড়িয়ে মেঘনার মা দুমদাম পা ফেলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

দিদি—অনিল এখন আবার হাসিখুশি ভাবটায় ফিরে এসেছে, মাঝে মাঝে তের কাছে এলে রাগ করবি?

না এলে রাগ করবো, অনিলের হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে অন্য রকম এক গলায় মেঘনা বলেছিল।

আমি যাচ্ছি, পা বাড়িয়ে অনিল বলেছিল, একটু সাবধানে থাকিস দিদি।

মেঘনা আজ অবধি জানতে পারেন নি যাবার সময় তাঁকে অনিল ঐ কথাটা বলেছিল কেন? এ বাড়ির ঐশ্বর্য আর অভিজ্ঞতা দেখে সে কি ভয় পেয়েছিল?

কে জানে?

রাত্তিরে নিজের ঘরে ঢুকে চমকে দাঁড়ালেন পঙ্কজ। বিছানার ওপর একটা দামী তাঁতের ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবী রাখা আছে। সারাদিনের যতো কিছু ঘটনা এক লহমায় তাঁর মনে ভেসে এলো সেই সঙ্গে তার মনে হলো এ জীবনের মত তাঁর একা চলার দিন শেষ হয়েছে। পাশের ঘরে এই মুহূর্তে সেই মেয়েটি কি করছে, যাকে তিনি এক মুহূর্তও ভাবার সময় না দিয়ে বিয়ের কাগজে সই করতে বলেছিলেন?

এই ধুতি এবং পাঞ্জাবী কোথা থেকে এসেছে তা তিনি শুনেছেন। এখন বুঝতেও পারছেন এগুলো এখানে কে রেখে গেছে।

ধুতি ও পাঞ্জাবীর ওপর হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত পঙ্কজ চুপ করে দাড়িয়ে থাকলেন। পঙ্কজের বাবা অনুষ্ঠানে ধুতি পাঞ্জাবী পরেই যেতেন। পঙ্কজের ধুতি পাঞ্জাবী পরা বাবাকে দেখে একদম অন্যরকম মনে হতো। একদিন বলেছিলেন,

অফিসেও আপনি ধুতি পাঞ্জাবী পরে যান না কেন? ওটা যে কাজের জায়গা। অফিসের জন্যে সার্ট প্যান্টেই বেশী উপযোগী। কেন, আমি ধুতি পরলে তোমার ভাল লাগে?

লাগে—ঘাড় কাত করে পঙ্কজ সম্মতি জানিয়েছিলেন।

কে—কে ধরমড় করে বিছানায় উঠে বসেছিলেন মেঘনা। সারাদিন ধরে একটানা ধকলের পর নিজের অজান্তেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খেয়াল নেই। সারা বাড়িতে এখন আর কারুর জেগে থাকার কথা নয়। রাত এরোটা অনেকক্ষণ আগে বেজে গেছে।

ঘুমোচ্ছিলে—

চোখ নীচু করে মেঘনা ঘাড় নাড়লেন। তাঁর পরনে বেনারসী। মুখে হাল্কা প্রসাধন। ধুতির কোঁচাটা হাতে তুলে নিয়ে বিছানায় একপাশে বসলেন পঙ্কজ। একদৃষ্টে মেঘনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এখনো আমার ওপর রাগ আছে?

না। মেঘনা মাথা ঝাঁকালেন।

কাজটা হয়তো আমি ঠিক করিনি, পঙ্কজ বললেন, আমার আগে তোমার মত নেওয়া উচিত ছিল।

মেঘনা কোন কথা বললেন না।

পঙ্কজ আগের কথার রেশ টেনে বললেন, আসলে আমার ভয় ছিল—

কিসের ভয়?

তোমাকে জোর করে এভাবে না আনলে কোনদিন পাবোনা। এখন আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। Sorry-পঙ্কজ মেঘনার হাতের ওপর নিজের হাত রেখে বুঝতে পারলেন তার হাতখানা ঘামে ভিজে গেছে।

আমি আগে কোনদিন এসব পারিনি। খুব বাজে দেখাচ্ছে?

ভালোই দেখাচ্ছে।

থ্যাঙ্ক। তোমার হয়তো খুব খারাপ লাগছে। তোমাকে নিজেই সাজতে হলো। মেয়েরা এসব বিষয়ে খুব Particular হয়।

জানিনা। আমি এসব কিছুই জানিনা—মেঘনার নাকের পাটায় আর থুতনীতে ঘাম চিকচিক করছে। দুচোখের মণি থেকে মেঘ কেটে যাবার পর ভোরের আলোর মতন পবিত্র দেখাচ্ছে।

এ বাড়িতেতো আর কেউ নেই, পঙ্কজ বললেন, তোমাকে নিজেকেই সব করে নিতে হবে।

কেন পিসিমা?

পিসিমা তাঁর নিজের বাড়িতে থাকেন। আমি সকালে উঠে ব্রেকফাস্টের পর চলে যাবো কখন ফিরবো ঠিক নেই। দুপুরের লাঞ্চে—থামলেন পঙ্কজ, ঠিক আছে।

কাল বাড়িতেই লাঞ্চ করবো।

চাদরের ওপর হাত বুলোচ্ছিল মেঘনা। বুকের মধ্যে সারাদিন যে ঝড়টা বইছিল সেটা থেমে আসছে এখন।

পঙ্কজ উঠে দাঁড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন, আজ সকালেও আমি জানতাম না তোমাকে বিয়ে করবো।

মেঘনা আস্তে আস্তে বলল, আমি জানতাম।

আয়নার পাশ থেকে ছিটকে মেঘনার পাশে এসে দাঁড়ালেন পঙ্কজ, সত্যি, সত্যি জানতে?

মেঘনা আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন. আমার মনে হয়েছিল, কেন মনে হয়েছিল জানিনা।

(১৯)

গতকাল রাত্তিরটা একদম ঘুমোতে পারেন নি পঙ্কজ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম উৎপাতও বাড়ে। শরীর একটু এদিকে ওদিক হলেই গণ্ডগোল বাধানোর চেষ্টা করে। বাড়ির বাঁধা ডাক্তার আছেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার করে এসে প্রেসার মেপে যান। তাছাড়া অন্য দু একটা টুকি টাকি কথাবার্তাও বলেন যা তার ডাক্তারির সঙ্গে সম্পর্কিত রহিত।

তাঁকে বারান্দায় ইজিচেয়ারে না পেয়ে ঘরে এলেন মেঘনা। চা খাবে না?

হ্যাঁ। দাও—। অনিরুদ্ধ কোথায়?

তার ঘরে।

আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও ওকে।

কেন? মেঘনা দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে প্রশ্ন আর কৌতূহল।

দরকার আছে ওর সঙ্গে।

মেঘনা বুঝতে পারলেন বাবা ছেলের দরকারটা তাঁকে পঙ্কজ জানাতে চান না। মেঘনা আর একটিও কথা না বলে চলে গেলেন। খাট থেকে নেমে আলনার পাশে গেলেন তিনি। রাস্তার ওপাশের কদমগাছটা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

ছোট থেকেই গাছটা খুব ঘুম কাতুরে। এক একদিন পঙ্কজ রোদ্দুরের সঙ্গে খেলা শেষ করার পরেও গাছটার ঘুম ভাঙ্গে না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরে হাত নাড়ার পর গাছটা ডালপাতা নাড়িয়ে সাড়া দেয়।

পঙ্কজ এখন অনুভব করতে পারেন, গাছপালা-পাখী, নদী, আকাশ মাটি সব কিছুই মানুষের সঙ্গে সখ্যতা পাতাতে চায়। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চায়। কথা বলে।

দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে পঙ্কজ অফিসে যে চেয়ারটাতে বসে কাজ করেছেন

তার সঙ্গেও তাঁর একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। একবার চেয়ারটাকে সারাতে দেওয়া হয়েছিল। মাসখানেক নতুন চেয়ারে বসে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারতেন চেয়ারটা তাঁকে পছন্দ করে না। একদিন ধরা পড়লো এই একমাস ধরে তিনি যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার বেশির ভাগই ভুল। এমনকি তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের জন্যেই একটা বড় কন্ট্রাক্ট হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এসব কথা ঘূণাক্ষরেও কাউকে কোনদিন বলেন নি তিনি। শুনলে কেউ বিশ্বাসও করতো না।

বাবা—

অনিরুদ্ধ ঘরে পা দেবার আগে ডেকে সাড়া নিল।

অনিরুদ্ধ বললেন, চলো বারান্দায় বসি।

একখানা চেয়ার পঙ্কজের কাছাকাছি টেনে এনে তাতে বসলো অনিরুদ্ধ। বলল, আসছে মাসে ভুবনেশ্বরে আমাদের একটা ব্রাঞ্চ অফিসের উদ্বোধন হবে। উড়িষ্যার ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার আসবেন।

good, পঙ্কজ সপ্রসংস দৃষ্টি ফেলে অনিরুদ্ধকে দেখে নিলেন, ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাও একটু ভাবা উচিত। Success কথাটা ultimately ক্ষতিই করে, আমি নিজের জীবনে তাই দেখেছি।

তিনি কি বলতে চান অনিরুদ্ধ তা আন্দাজ করতে পারছিল না। চুপ করে বসে থাকলো সে।

পঙ্কজ বললেন, কাল ডাঃ সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথাটা বলার পর এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন তিনি। শুনলাম তুমি আর সুমিতা তাঁর কাছে গিয়েছিল?

মা জানতেন আমরা ডাঃ সমাদ্দারের কাছে যাবো।

ও—।

বারান্দার রেলিং এ একটা শালিক চুপচাপ বসে আছে। আর মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিয়ে তাঁদের দেখছে। কে আগে কথা বলবে ভাবতে ভাবতে পঙ্কজই বলে উঠলেন, যে ভাবেই হোক তোমাদের দুজনের ইচ্ছের কথাটা আমি জেনেছি। সুমিতা এবং তুমি দুজনেই সুমিতার গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করে ফেলতে চাও।

কথাটা বলার পর পঙ্কজের মনে হলো নষ্ট কথাটা অশ্লীল। ঐ শব্দটা তাঁর উচ্চারণ করা উচিত হয়নি। শালিকটা উড়ে গেল। যাবার আগে পিবিক্ করে একটা বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করে গেল। অন্য সময় হলে শালিকটাকে নিয়ে ভাবতেন পঙ্কজ।

আমরা দুজনাই গ্রোন আপ বাবা, কথাটা বলতে বলতে চুপ করলো অনিরুদ্ধ।

আসলে এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাওনা, তাই না?

না ঠিক তা নয়,...আসলে আমি আর সুমিতা এই নিয়ে অনেক ভেবেছি...তারপর হ্যাঁ তারপর ডাঃ সমাদ্দারের কাছে গিয়েছিলাম। He assured us..., ভবিষ্যতে আমরা যখনই চাইবো...

এক লাফে সময়টা এবং সমাজের চেতনা নামক বস্তুটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। পঙ্কজ চিন্তাও করতে পারতেন না তাঁর সন্তান হওয়া, না হওয়া নিয়ে বাবা তাঁর সঙ্গে এতো খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতেন কিনা।

সুমিতাকে পছন্দ করেছিলেন মেঘনা নিজে। অনিরুদ্ধ সে পছন্দে মত দিয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি আর এত সাবলীলভাবে ঘটে গিয়েছিল যে কেউ বিশেষ করে ভাবার মতো সময়ও পায় নি। পঙ্কজ অবশ্য প্রথম থেকেই বলে দিয়েছিল বিয়ে যে করবে তার মতটাই আসল।

তার মানে তুমি ছেলের বিয়ের দায়িত্বও এড়িয়ে যেতে চাইছো?

সবটাই তুমি আমার দোষ খোঁজ কেন বলতো মেঘনা? আমি যা বলছি অন্য কেউ এই একই কথা বললে তুমি প্রশংসা করতে।

মেঘনা মনে মনে চেয়েছিল অনিরুদ্ধর বিয়েটাকে উপলক্ষ্য করে বাপ আর ছেলের মানসিক দূরত্বটা কমে আসুক। দুজনের মধ্যে এই দূরত্বটার কথা তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। তবু মেঘনা জানেন, এ বাড়ির তিনটি মানুষের জন্যে পৃথক তিনটি পৃথিবী আছে। যার যার নিজস্ব সীমার মধ্যে তার তার পদচারণা। এক সময় মেঘনা এটার জন্যে সম্পূর্ণরূপে পঙ্কজকেই মনে মনে দায়ী করতেন। এখনও এমন ভাবেন, এর জন্যে হয়তো তিনি নিজেও দায়ী। সাধারণভাবে সব পুরুষ মানুষেরই নিজস্ব একটি অহংকারের জগত থাকে। সেখানে প্রবেশের অধিকার অন্যকে অর্জন করতে হয়।

বিয়ের এত বছর কেটে যাবার পর এক এক সময় নিজেকে নিয়ে বিচার করতে বসে মেঘনা বুঝতে পারেন, অন্য নারীর মত তিনি পঙ্কজকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি। অথবা গ্রহণ করার জন্যে যে নিবেদনের আয়োজন তা তাঁর মধ্যে নেই।

এখন এতদিন পর তাঁর সেই না টাই বৃদ্ধি পেতে প্রকাণ্ড একটা দেয়ালের মত আকার পেয়ে দুর্ভেদ্য ভাবে তিনজনকে তিনটি দ্বীপের মত আলাদা করে রেখেছে।

আজ আমরা সুমিতাকে দেখতে যাবো—তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

কাগজ থেকে মুখ তুলে রেখে মেঘনার কথা শুনছিলেন পঙ্কজ। বললেন সুমিতাকে আমি দেখেছি।

সেতো অন্যরকম দেখা। আজ আমরা যাচ্ছি ওকে দেখে আমাদের সম্মতি জানিয়ে আসতে।

তোমরা যাও। আমার কাজ আছে। আবাব কাগজে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলেন

পঙ্কজ। সঙ্গে করে অনিরুদ্ধকে নিয়ে যেও।

তোমার কাজটা কি খুব জরুরী?

হ্যাঁ।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব নিয়ে স্বামীর দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন মেঘনা। অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনের মধ্যে ভেসে এলো তাঁর। সবে বছর খানেক হলো বিয়ে হয়েছে তাঁদের। সন্দীপ স্কুলে ড্রইং টিচারের চাকরি নিয়ে বিলাসপুর চলে গিয়েছে। তাঁদের গ্রুপটা আগের মতো নেই আর। তবে একেবারে ভেঙ্গেও যায়নি। সন্দীপ ছুটিতে এলে সবাই এক জায়গায় জড় হয়ে নতুন করে কিছু করার পরিকল্পনা করা হয়। মেঘনাও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। বিয়ের পরও ছবি আঁকা বন্ধ করেন নি তিনি।

পঙ্কজ বাড়ির একতলার একখানা বড় ঘরে তাঁকে স্টুডিও করে দিয়েছেন। সেই সময় একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি সারাদিন বাড়ি থাকিনা। একা একা তুমি দুদিনেই হাঁফিয়ে উঠবে। সেই জন্যে বলছি ছবি আঁকাটা ছেড়ো না। তাছাড়া আমি চাই তুমি সত্যিকারের কিছু একটা করো যাতে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে তোমার নামও একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। তার জন্যে দরকার হলে দিল্লীতে, বোম্বাইতে যেখানে ইচ্ছে নিজের ছবি নিয়ে যাও, একজিবিশন করো, তাঁর নিজের মনের গোপন স্বপ্নটার কথাই যেন বলেছিলেন পঙ্কজ। এতদিন যে মানুষটাকে আদ্যন্ত নিস্পৃহ একটা টাকা রোজগারের যন্ত্র ছাড়া কিছু মনে হয়নি তাকেই যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন মেঘনা।

এরই কিছুদিন পর সন্দীপ এসেছিল কলকাতায়। তখনই ঠিক হয়েছিল সমরের স্মৃতি রক্ষার জন্যে তাঁদের গ্রুপের পক্ষ থেকে কিছু একটা করা যাবে।

এর মাসখানেক পরে একদিন মেঘনা বলেছিলেন, পরশু একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরতে হবে।

পরশু। কেন বলতো?

একাডেমিতে একটা এক্সিবিশনে যেতে হবে।

কিসেব একজিবিশন, ছবির?

বারে, আমাদের ছবি ছাড়া আর কিসের একজিবিশন হবে? মেঘনা হেসে ফেলেছিলেন, এই একজিবিশন থেকে যে কটা ছবি বিক্রি হবে সেই টাকা দিয়ে সমরের নামে একটা ফাণ্ড করা হবে।

সমর মানে তোমাদের সেই বন্ধু যে ক্যানসারে মারা গেল।

হ্যাঁ।

গুড। কিছু একটা করাই উচিত কিন্তু পরশু তো আমি থাকতে পারবো না। আমাকে দিল্লী যেতে হবে। ওখানে একটা জরুরী মিটিং আছে। আমি কাজ সেরে ফিরতে ফিরতে তোমাদের একজিবিশন শেষ হয়ে যাবে।

তিন চারদিন পর দিল্লী থেকে ফিরে পঙ্কজ জিজ্ঞেস করেছিলেন কেমন হলো তোমাদের একজিবিশন?

ভালো।

ছবি বিক্রি হয়েছে?

হয়েছে।

সন্দীপ কি বিলাসপুর ফিরে গিয়েছে?

হ্যাঁ।

তোমার কাজ হয়েছে?

কি কাজ?

দিল্লীতে যে কাজের জন্যে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ হয়েছে...অফিসে সরকারী অমলাতন্ত্রের ব্যাপার কোনো কিছুই একবারে হতে চায় না। আবার যেতে হবে আমাকে।

একজিবিশন চলার মধ্যেই মেঘনা জানতে পেরেছিলেন পঙ্কজ দিল্লী যাননি। দিল্লী যাবার নাম করে কলকাতার একটা হোটেলে উঠেছেন।

(২০)

আজও আবার জরুরী কাজ আছে শুনে মেঘনার ইচ্ছে হচ্ছিল পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা করেন সেদিনের দিল্লী যাবার মতোই এ কাজটাও খুব জরুরী নাকি। কিন্তু তা না করে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করেছিলেন।

যেখানে যাচ্ছি, তুমি থাকলে সবাই খুশি হতেন। চোখে হাসি নিয়ে স্ত্রীকে লক্ষ্য করতে করতে পঙ্কজ বলেছিলেন অনেকে অখুশিও হতেন। যেমন ধরো—

আমি কিছু ধরতে চাইনা, চাপা রাগটা অনেকখানি মেঘনার মন থেকে বাইরে চলে এসেছিল, সারাজীবন ধরে তুমি যে ভাবে আমার সঙ্গে চলেছ সেই একই ভাবে ছেলের সঙ্গেও চলতে চাইছ, এর জন্যে কিন্তু তোমাকে একদিন—

আমাকে একদিন কি...বলো কি থামলে কেন, পস্তাতে হবে? আফশোস করতে হবে?

নাহ, কিছুই বলতে চাই না আমি—

তুমি চাওনা কিন্তু আমি বলতে চাই। হ্যাঁ বলার দরকার তোমাকে, তোমাদের। পঙ্কজের মুখনানা কথা বলতে বলতে ক্রোধে রক্তবর্ণ। আগে কোনদিন মেঘনা তাকে এত উত্তেজিত হতে দেখেন নি। পরক্ষণেই আগের মত শান্ত হয়ে গেলেন তিনি। খুব নরম দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তোমার মত আমারও কিছু বলার আছে। কিন্তু এখনো বলার সময় আসেনি। যাও এখন, আমাকে কাজ করতে দাও।

নিরুত্তরে সামনে থেকে সরে এসেছিলেন মেঘনা।

তুমি চা খেয়েছ?

অনিরুদ্ধ ঘাড় কাত করলো—হ্যাঁ।

আবার কিছুক্ষণ দুজনা চুপচাপ।

পঙ্কজ মৌনতা ভাঙ্গলেন, তাহলে তোমাদের decision বদলাবে না?

অনিরুদ্ধ কোন জবাব দিল না এ কথার।

পঙ্কজ বললেন, সংসার মানে কটা মানুষ নয়। কখনো ঘর বারন্দা অথবা কিছু রোজগার এবং তার বদলে পাওয়া কিছু স্বাচ্ছন্দ্য নয়। সংসার মানে কিছু মানুষের এক সঙ্গে চলা, একটা লক্ষ্যকেই সবাই মিলে আঁকড়ে থাকা। অনিরুদ্ধ, তোমার ঠাকুরদাদা মানে আমার বাবা প্রায়ই একটা কথা বলতেন be decent and disciplined.

কথাটা আগেও বহুবার বলেছেন, বাবা।

হ্যাঁ বলেছি আজও আবার বলছি। তার কারণ আমার মনে হচ্ছে তোমরা দুজন deciplined কথাটাকে হয় মানতে চাইছ না, নয়তো শব্দটার আসল মানো ধরতে পারছো না।

কথাটা শেষ করে বেশ কয়েকটা মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকলেন পঙ্কজ। তারপর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, সবায়ের মতো আমিও একটা রক্ত মাংসের তৈরি মানুষ। আমারও সুখী হতে ইচ্ছে করে। এ সংসারে তোমার জন্মের পর কত বছর হয়ে গেল নতুন কেউ আসেনি। নতুন একটা প্রাণ—। আমার কথা তুমি যদি বাদও দাও, তোমার মারও তো একটা স্বপ্ন থাকতে পারে। তোমাদের সন্তানকে নিয়ে তিনিও সুখী হবার কথা ভাবতে পারেন।

অনিরুদ্ধ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বলল, বাবা, আপনারা শুধু আপনাদের সুখের কথাই ভাবছেন। আমাদের কথাটাও আপনার ভাবা উচিত। সুমিতার গর্ভে যদি একটা পাগল জন্মায় তাকে নিয়ে আমরা কি করবো, বলুন কি করবো?

অনিরুদ্ধর কথাটা শুনে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন পঙ্কজ। তারপর অনেক চেষ্টার পর বলতে পারলেন, কি বলছো তুমি? ভেবে দেখেছ কি বলছো? পাগল ছেলে হতে যাবে কেন তোমাদের? এ ভয় তোমাদের মনের মধ্যে কে ঢুকিয়েছে? ডাঃ সমাদ্দার।

কি বলেছেন ডাঃ সমাদ্দার? বলো, বলো শীগগির। কিছুই বলেন নি ডাঃ সমাদ্দার। বলেছেন the baby must incherit your blood yes your blood. আপনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে পালিয়ে যান, আমার ছেলে যদি সেরকম হয়...তাহলে...তাহলে—

কথাটা শেষ না করেই কখন ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল অনিরুদ্ধ। অনেকক্ষণ পর বিস্ময়, ঘৃণা এবং বিষণ্ণতার জাল ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পঙ্কজ চোখ তুলে দেখলেন, তিনি একা বসে আছেন। সেই শালিকটা আবার বারান্দার রেলিং এ ফিরে এসেছে।

পরদিন খুব সকালে দরজায় ধাক্কা শুনে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে এসে মেঘনা দরজা খুলে দিয়ে দেখলেন সুমিতা দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠিক পেছনে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে অনিরুদ্ধ।

কি হয়েছে বৌমা?

সুমিতা কান্নারুদ্ধ গলায় বলল, বাবাকে তাঁর ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবা আবার চলে গিয়েছেন। মাথাটা টলে যাচ্ছিল মেঘনার। তিনি একহাত দিয়ে দরজার পাল্লাটা শক্ত করে চেপে ধরলেন। একটিও কথা বললেন না।

(২১)

ট্রেনটা একদম ফাঁকা।

এত ভোরে যাত্রীর ভিড় নেই। একখানা বেঞ্চিতে টানটান হয়ে শুয়েছিলেন পঙ্কজ। মাথার নীচে কিট্ ব্যাগটা। চোখ বুজে থাকলেও পঙ্কজ ঘুমোননি। তাঁর কান পাতা রয়েছে লাইন থেকে উঠে আসা একটানা ছন্দময় শব্দটার দিকে। আশ্চর্য, কত কিছু বদলে গেছে, যেদিকে চোখ যায়, সর্বত্র আমূল পরিবর্তণের চিহ্ন। কিন্তু লাইনের সঙ্গে ধাবমান চাকার সংঘর্ষে উঠে আসা ইচ্ছা সংলাপ এখনো ঠিক তেমনিই আছে। খুব মজা পাচ্ছিলেন পঙ্কজ একই রকম শব্দ অথচ কত রকম কথা বলে। যে যা ভাবে তাই বলে শব্দটা।

কত্তা ঘুমিয়েছেন নাকি?

কথাটা তাকেই বলা। চোখ খুলে পঙ্কজ বক্তার দিকে তাকালেন। খুবই সাধারণ একটি মানুষ। পরনে ধুতি আর আধময়লা হাফ হাতা সার্ট।

পা দুখানা একটু যদি সরিয়ে নেন্ কত্তা।

পঙ্কজ পা গুটিয়ে নেবার পর লোকটি বসলো।

বলল, আপনি তো জানতে চাইলেন না সারা গাড়িটা খালি তাও আমি আপনাব কাছে এসে বসলাম কেন?

কেন বসলেন?

মানুষ। মানুষ ছাড়া আমি একদণ্ড থাকতে পারিনে। বুকের মধ্যে হাঁকর পাকর করে। ভয় লাগে।

পঙ্কজ উঠে বসলেন, কতদূর যাওয়া হবে?

ছটা ইস্টিশন পর নেমে যাবো।

কি নাম স্টেশনের?

চালতা কুসুমপুর।

নদী আছে তোমাদের ওখানে?

আছে কত্তা। নদীটাই তো আমাদের পরান।

নদীর পাড়ে গাংশালিকের বাসা আছে?

না কত্তা। অন্য অনেক পাখি আছে। এই ধরুন গিয়ে বৌ কথা কও, দুগগা টুনটুনি, ভোরেল কাঠঠোকড়া, মাছরাঙা, বুলবুলি। জানেন কত্তা, বৌ কথা কও বাড়ির চালে বসে ডাকলে বাড়িতে খোকা হয়। আমার পরিবারের সাত বছর কোন বাচ্চা হয় নি, তারপর কোথা থেকে একদিন একটা বৌ কথা কও এসে আমার ঘরের—

লোকটি কথা বলতে বলতে থেমে গেল। বলল, কত্তা কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

না না রাগ করবো কেন...বলো কি বলছিলে?

থাক্ ওসব কথা। এখন সেই পরিবারও নেই ছেলেও নেই—

পঙ্কজ সোজা হয়ে বসলেন, কেন কি হলো তাদের?

আজ্ঞে কথাটা বড় লজ্জার। আপনি সজ্জন মানুষ বলে আপনাকেই বলছি..., আমি কত্তা সে সময় গাঁয়ে গাঁয়ে আয়না ফেরি করতাম। আজ ধাত্রীগ্রাম গেলাম তো কাল রসুলপুর...তা একদিন সন্ধ্যে বেলা ঘরে ফিরে দেখি ঘর খালি। খাঁ খাঁ করছে, কিছু বুঝলেন কত্তা?

না, অসহায় ভাবে ঘাড় নাড়লেন পঙ্কজ।

কি করে বুঝবেন,...আমিই বুঝিনি...দশ বচ্ছর একসঙ্গে ঘর করেও বুঝতে পারিনি আমার বৌয়ের চরিত্তির বেনো জলের মতো। যেদিকে টান সেদিকে ভেসে যাবে।

একটা ছোট্ট ষ্টেশনে গাড়িটা এক মিনিটের মতো থেমে আবার চলতে শুরু করলো। জনা তিনেক নতুন যাত্রী উঠেছে। তারা ওপাশে বসেছে।

তা বুঝলেন কিনা কত্তা, সেই থেকেই আমার এই রোগটা হলো, মানুষ ছাড়া একদমও থাকতে পারিনে।

তোমার নামটা কি?

বলরাম হালুই। তা কত্তা কেউ আমাকে ঐ নামে চেনে না। আয়না হালুই বললে একডাকে সবাই চেনে। সেই কোন কালে আয়না বেচা বন্ধ করে দিয়েছি...তা নামটা এখনো গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে।

লোকটির জন্যে মনের মধ্যে এক রকমের কষ্ট হচ্ছিল পঙ্কজের। মানুষ যখন তার ভাগ্যের হাতে পরাজিত হতে থাকে তখন সে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

পঙ্কজ বললেন, তাহলে এখন কি করা হয় তোমার? বলরাম কথার উত্তর দেবার আগে পকেট থেকে দুটো বিড়ি বার করে বলল, বিড়ি চলে নাকি আপনার?

না।

তাহলে আর আমিও ধরাবো না। বলরাম বিড়িটা আবার পকেটে রেখে বলল, আমার বৌয়ের বৃত্তান্তটা আর একটু বলি কত্তা। একদিন আয়নার বোঝা কাঁধে নিয়ে জাকিমপুর গাঁয়ে গেছি, একটি বৌ দরজার আড়াল থেকে আয়নাওলা, ও আয়নাওলা বলে ডাকলো।

মাঠকোঠার দুখানা ঘর। সামনে মাটি নেকানো বড় উঠোন। সামনে গিয়ে বললাম, কে ডাকলে গো আমায়। কি নেবে বলো?

স্পষ্ট শুনলাম ভেতর থেকে একটি মেয়েলি গলা বলে উঠলো, তোমায় ছাড়া আর কি নেব?

আমিতো কত্তা হক্‌চকিয়ে গেছি। কি বলবো বুঝতে পারছিনে মেয়েটি ভেতর থেকে আবার বলে উঠলো। ও আয়নাওলা ভিমরি খেলে নাকি? তা কি আয়না দেখাবে দেখাও। আমি বললাম, কি আয়না নেবে বলো?

আ কপাল আমার। আয়না বেচে খাও অথচ জানোনা মেয়েরা কোন আয়না চায়। কত্তা দু তিন খানা আমার পছন্দ মতো আয়না বেছে দিলাম। আড়াল থেকে একখানা হাত বেরিয়ে এসে আয়নাগুলো নিল তারপর আবার ফেরৎ দিয়ে বলল, না গো আয়নাওলা, এর এক খানাও পছন্দ হলো না। তোমার কাছে আর কি আছে দাও।

না কত্তা, সেদিন আর বেচাকেনা হলো না। ফিরে এলাম। মনে কেমন একটা নেশা ধরে গেল। পরদিন আবার সেই গাঁয়ে গিয়ে হাজির হলাম। আবার জিনিষ দেখাদেখি। সেদিনও পছন্দ হলো না আমার আয়না। বলরাম হালুই কথা থামিয়ে চলমান গাড়ির জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর বললেন, দু ষ্টেশন পরে চালতা কুসুমপুর। আপনিও আমার সঙ্গে ঐখানেই নেমে পড়েন।

আমি তো ওখানে যাবার জন্যে বেরোইনি বলরাম, পঙ্কজ বললেন।

তার কথা শুনে বলরাম হেসে ফেলল, এটা কি বললেন কত্তা, কেউ কি কোথাও যাবার জন্যে বেরোয়? আসলে নিজের কাছে পৌছনোর জন্যে মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এখন চলেন, আমার সংসারে দুদিন জিরিয়ে নিয়ে আবার যেদিকে মন চায় চলে যাবেন।

তোমার আবার সংসার কোথায় বলরাম। তুমি তো একা মানুষ।

না কত্তা, একা হবো কেন, এতক্ষণ যে আপনাকে জাকিমপুর গাঁয়ে আয়না বিক্রির গল্পটা শোনালুম, সেটা তাহলে কি?

কি বলরাম?

আজ্ঞে, তিনিই এখন আমার সংসারের দাসী হয়ে বিরাজ করছেন। আপনার ভাল লাগলো কত্তা। অমন কুচো চিংড়ি দিয়ে পুঁইশাক আপনি আগে কখনো খাননি। কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল পঙ্কজকে। তাঁর সামনে বসে থাকা এই মানুষটির বিশ্বাস, জীবনকে তার নিজের মতো করে মেনে নেওয়া এবং সুখী হওয়া, কোনটাকেই এত কাছ থেকে এত অকপট ভাবে দেখেননি তিনি।

গাড়ির গতি কমে আসতেই বলরাম খপ্ করে তাঁর ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল আসুন, আসুন কত্তা। গাড়ি এখানে এক মিনিটও দাঁড়ায় না।

পঙ্কজ কিছু চিন্তা না করেই উঠে দাঁড়ালেন। মনে মনে একবার উচ্চারণ করলেন, চালতা কুসুমপুর। শব্দগুলো তার অনেক দিনের চেনা বলেই মনে হলো কিন্তু তিনি নিশ্চিত আগে কখনো এই নাম তিনি শোনেন নি।

(২২)

আজ সাতদিন হয়ে গেল পঙ্কজ বাড়ি ছেড়ে নিপাত্তা হয়েছেন। দেশের যেখানে যতো আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিত মানুষ আছে তাদের সকলের কাছেই ফোন করে খবর নেওয়া হয়েছে। কেউ পঙ্কজের খবর দিতে পারেনি।

মেঘনা আগেই অনিরুদ্ধকে বলেছিলেন, শুধু শুধু ফোন করছো তুমি। উনি কোন পরিচিত মানুষের কাছে যাবেন না।

না মা, ইদানীং বাবা খুব বিলাসপুরের কথা বলতেন। বিলাসপুরে সন্দীপ থাকে। স্কুল থেকে অবসর নেবার পর সন্দীপ আর কলকাতায় ফিরে আসেনি। ওখানে শহরের বাইরের দিকে খানিকটা জায়গা কিনে একতলা একটা বাড়ি করেছে। সেটাই সন্দীপের আশ্রয় সেটাই সন্দীপের স্টুডিও। মাঝে কলকাতা থেকে একদল শিল্পী সন্দীপের বিলাসপুরের বাড়িতে কদিন কাটিয়ে এসেছে। এ দলে প্রকাশ কর্মকার বিজন চৌধুরী ছাড়াও আরো কয়েকজন নামকরা শিল্পী ছিলেন। ওখান থেকে ফিরে আসার পর সেই দলেরই একজন মেঘনাকে ফোন করে বলেছিলেন, যাও একবার দেখে এসো সন্দীপ কত ভালো আছে। ভালো থাকার মানে এক একজনের কাছে এক এক রকম। মেঘনা জানেন সন্দীপদা ভালো নেই। সন্দীপদা নিজের অতীত থেকে পালিয়ে থাকার জন্যেই এই স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিয়েছেন। মেঘনাকে ডেকে পঙ্কজই একদিন কাগজে ছাপানো একটা খবর দেখিয়েছিলেন। খবরটাতে ছাপা হয়েছিল সন্দীপদা বিদেশে গিয়ে নিজের ছবির প্রদর্শনী করার একটা দুর্লভ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পঙ্কজ বলেছিলেন, ও চিরকালই এই রকম। আন্‌ডিসিপ্লিনড্। স্কুলে একবার নাইন বা টেনে ফার্স্ট হলো। তারপরের বছরই যাতে আবার ফার্স্ট না হয়ে যায় তার জন্যে দুটো পরীক্ষাই দিলো না।

না, পঙ্কজের কথা মেঘনা মানতে পারেন নি। আন্‌ডিসিপ্লিনড্ নয়, সন্দীপ ডিসিপ্লিনড্ এন্ড কমিটেড্। তার জীবনের সবচেয়ে বর কমিটমেন্ট তাদের গ্রুপটা। সেটা ভেঙ্গে যাওয়ায় সন্দীপ সহ্য করতে পারে নি। তাই বলে ছবি আঁকাও ছেড়ে দেয় নি। এখন অখণ্ড অবসর। তাই ছবি আঁকারও শেষ নেই। ঘরে ক্যানভাসের স্তূপ জমে উঠেছে। কোনো ক্যানভাসের গায়ে অর্দ্ধেক রং লেগেছে, কোনটা বা বোবা দেয়ালের মতো ফাঁকা।

গোটা কতক ছাত্রছাত্রী আছে যারা তার কাছে নিয়মিত ছবি আঁকা শিখতে আসে। তাদেরই একজন মণীষ শর্মা কি ভাবে যেন মেঘনার ঠিকানা জোগাড়

করে কলকাতায় এসে তাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল, স্যারের মুখে আপনার নাম খুব শুনেছি।

আমার নাম এখনো সন্দীপদার মনে আছে নাকি?

আছে, প্রায়ই আপনার কথা বলেন, আর একজনের কথা বলেন যাঁর তুলির টান নাকি রেমব্রাঁর চেয়েও গতিময়, তিনি যদি অসময়ে মারা না যেতেন...

থাক। এসব পুরনো কথা। তুমি আমার কাছে কেন এসেছো বলো?

আপনি একবার বিলাসপুরে চলুন। তা না হলে স্যারের আঁকা সব ছবি লোপাট হয়ে যাবে।

লোপাট হয়ে যাবে মানে?

উনি যে চায় তাকেই ছবি দিয়ে দেন। একবার একজন এসে একজিবিশন করবে বলে পঁচিশখানা ছবি নিয়ে গেল। সে একজিবিশনও করেনি ছবিগুলোও ফেরৎ দেয়নি।

তা আমি কি করবো, মেঘনা স্পষ্ট বলেছিলেন, আমার পক্ষে বিলাসপুর যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ছবি নিয়ে ভাবার সময়ও আমার নেই। ছবি আঁকা আমি অনেকদিন হলো ছেড়ে দিয়েছি।

এতবড় একটা অবিশ্বাস্য কথা মেঘনার মুখে শোনার পর মণীষ আঘাত পেয়েছিল। অনেকক্ষণ কথা বলেনি। তারপর যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, প্লিজ, আপনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন একথা স্যারকে জানতে দেবেন না...হি উইল বি টেরিবিলি শকড়—

আজ অনেকদিন পর নীচে নেমে এসে সিঁড়ির পাশে তালাবন্ধ ঘরখানার তালাটা খুললেন মেঘনা। কেন এ কাজ করলেন তা তার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। সুইচ টিপে আলো জ্বালার পর ঘর খানার চারপাশটা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। ঘরখানা তেমনিই আছে। শুধু দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার জন্যে ধুলোর আস্তরণ জমেছে। আর একটা দমকা ভ্যাপসা গন্ধের সঙ্গে এপাশে ওপাশে মাকড়সার ঝুলের অস্তিত্ব।

এই ঘরটাতে পঙ্কজ নিজে থেকে তাকে স্টুডিও করে দিয়েছিলেন। সেসময় রোজ ভাল করে ভোর হবার আগেই বিছানা থেকে উঠে এসে ছবি আঁকা শুরু করতেন মেঘনা। ভালো করে সকাল হলে এই ঘরে বসতেন পঙ্কজ। দুজনের সকালের প্রথম চা টা খেতে খেতে ছবির গল্প হতো। এক একদিন পঙ্কজের কথা শুনে খুব অবাক হয়ে যেতেন মেঘনা, তুমি এত খবর রাখো?

পঙ্কজ হাসতেন, হ্যাঁ, আজকাল কম্পিটিশন দিয়ে অফিসের ফাইলের সঙ্গে দেশ বিদেশের ছবির জার্নাল পড়ি। আফটার অল তোমার কাছে আমি হেরে যেতে পারবো না।

বারে। আমাদের দুজনের মধ্যে হার জিতের কথাটা আসে কোথা থেকে?

আসে। আসে—মেঘনা, তুমি পুরুষ মানুষ হলে বুঝতে কেন আমার মধ্যে

সব সময় হেরে যাবার ভয়টা কাজ করে।

নাও, চা খাও। নইলে চা খাওয়াতেও তুমি আমার কাছে হেরে যাবে বলে দিচ্ছি। সুকৌশলে মেঘনা প্রসঙ্গটা পাল্টে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর বুঝতে বাকি থাকে না পঙ্কজের এই হার জিতের খেলাটা কার সঙ্গে! আহ্—মানুষ কেন যে এমন হয়—মৃত্যু কি মানুষকে শত্রুতার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে না?

সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে ছবির একগাদা ক্যানভাস সরিয়ে ভেতর থেকে একটা ফ্রেম করা ক্যানভাস টেনে নিয়ে সেখানা চোখের সামনে ধরে থ্ হয়ে গেলেন মেঘনা।

সমরের আঁকা একখানা অর্ধসমাপ্ত ছবি।

কিন্তু এ ছবিখানা তাঁব ছবির মধ্যে কেমন করে এলো?

উত্তরহীন এক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ দিশেহারা হয়ে থাকলেন তিনি।

মা—

দরজার বাইরে থেকে তাঁকে ডাকলো অনিরুদ্ধ।

তাড়াতাড়ি হাতের ছবিখানা নামিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন মেঘনা, কি বলছিস?

কাল অফিসের একজনকে ভাণ্ডারটিকুরী হল্টের মাষ্টার মশাই-এর বাড়িতে পাঠিয়েচিলাম। সে ফিরে এসেছে। বাবা ওখানে যান নি। একটু থেমে অনিরুদ্ধ বলল, ভাবছি টিভিতে ছবি দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন দেব।

ছিঃ—

তাছাড়া এই এতবড় দেশে কি করে খুঁজে বার করবে কোথায় আছেন বাবা।

জানিনা।

লিফ্‌ট থেকে নেমে অফিসের করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পরশু স্পষ্ট শুনলাম দুতিন জন আমাকেই দায়ী করেছে।

তোমাকে দায়ী করছে, তোমাকে?

কথাটা মেঘনা এমনভাবে বললেন যেন অনিরুদ্ধকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। বাবা ছেলের যে স্বাভাবিক সখ্যতা তা যে দুজনের মধ্যে নেই তা জানেন মেঘনা। এটাই সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

যে শিশু একদিন তার বাপের হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এই বিপুল পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়ে একটু বড় হয়েই যে বলে বসে, তুমি আমার হাত ছাড়ো, আমার পৃথিবী আমিই খুঁজে নেব। দুটি একই রক্তের অস্তিত্বের মধ্যে সেইদিন থেকেই ভাগাভাগি হয়ে যায় সব কিছু বিশ্বাস, রুচি এবং বোধ।

শৈশবে একদিনের জন্যও পঙ্কজের হাত ধরে হাঁটেনি অনিরুদ্ধ। এমনকি পঙ্কজের সাহচর্যও সে পায়নি তেমন করে। অনিরুদ্ধ স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে যখনই তাদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছে পঙ্কজ মন্ত্রের মতন করে একই কথা অসংখ্যবার

উচ্চারণ করেছেন। বি ডিসেন্ট এন্ড ডিসিপ্লিনড্। একদিনের কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে মেঘনার। স্কুলে যাবার ঠিক আগে মাকে খুঁজতে খুঁজতে মেঘনার স্টুডিওর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল অনিরুদ্ধ। পঙ্কজ তখন সেখানেই ছিলেন। আচমকা মেঘনা কিছু বলার আগেই অনিরুদ্ধর হাত ধরে টানতে টানতে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন পঙ্কজ। শাসনের স্বরে বলেছিলেন, তোমাকে আমি বারণ করেছি ঐ ঘরে যেতে, বলো করেছি কিনা?

হ্যাঁ করেছেন।

তাহলে ওঘরে ঢুকেছিলে কেন? বলো, আমার কথার উত্তর দাও।

কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করেছিল অনিরুদ্ধ। মেঘনা বলেছিলেন, ওকে ছেড়ে দাও, আর কখনো ও ঘরে ঢুকবে না। আমি ওকে ধরে নেই।

মাথা নীচু করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অনিরুদ্ধ।

তোমাদের ক্লাসে ছবি আঁকা শেখানো হয়?

না, মাথা নেড়ে ছিল অনিরুদ্ধ।

ছবি তোমার ভাল লাগে? আঃ চুপ করে থেকো না। বলো ছবি তোমার ভাল লাগে?

লাগে—

ঠিক আছে। আমি আজই তোমার স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে ফোন করে দিচ্ছি তুমি কাল থেকে আর স্কুলে যাবে না। ছবি আঁকা শেখার স্কুলে ভর্তি হবে। and your mother will be your guide and philosopher...

রাগে পুড়তে পুড়তে সেখান থেকে সরে এসেছিলেন পঙ্কজ।

ঠিক পরদিন সকালে একজন চাকর এসে মেঘনাকে খবর দিয়েছিল একজন সাহেব আপনাকে ডাকছেন। আমি বসিয়েছি।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে মেঘনা অবাক, অনিরুদ্ধের স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ গোমেজ বসে আছেন।

তাঁকে দেখে মিঃ গোমেজ উঠে দাঁড়ালেন, গুড মর্ণিং মিসেস চৌধুরী।

গুড় মর্ণিং স্যার, আপনি এত সকালে?

কাল মিঃ চৌধুরী স্কুলে ফোন করেছিলেন, আমার স্কুল কি দোষ করলো যে অনিরুদ্ধকে সেখান থেকে তুলে নিচ্ছেন আপনারা। We never complained against your son.

ঠিক পুরো এক মিনিট লেগেছিল মেঘনার মিঃ গোমেজের কথাটা বিশ্বাস করতে। তারপরেও অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলতে পারেন নি। বুকের মধ্যে থেকে একটা ভয় তাঁর গলার কাছে উঠে এসেছিল।

পরের তিনদিন দুজনের মধ্যে একটা বারের জন্যেও বাক্যালাপ হয়নি। ঠিক চারদিনের দিন হঠাৎ একটা উৎকট পোড়া গন্ধ পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে

এসেছিলেন পঙ্কজ। এসে দেখেছিলেন স্টুডিওর দরজায় পিঠ দিয়ে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন মেঘনা। ঘরের ভেতরে ছবির স্তূপ জ্বলছে।

কি করবেন না করবেন ভাবতে এক মুহূর্ত সময় নেননি তিনি। একটানে মেঘনাকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে নিজে ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

দু তিনখানা বাদ দিয়ে সব ছবিই বেঁচে গিয়েছিল। সেই থেকে ও ঘরের চাবি আর খোলাই হয়নি।

অনেকদিন পরে হঠাৎ ডিনারের টেবিলে পঙ্কজ মেঘনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ছবি আঁকা তাহলে সত্যিই তুমি ছেড়ে দিলে?

হ্যাঁ।

কেন?

ছবি আঁকতে ভাল্লাগে না আর।

তাঁর কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন পঙ্কজ। হাসি থামার পর বলেছিলেন, এটা বোধহয় ঠিক করলে না মেঘনা। কার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছ তুমি? আমার ওপর না নিজের ওপর?

তার কথার কোন জবাব দেন নি মেঘনা। মনে মনে নিজেকে শুনিয়ে বলেছিলেন, আমি চিরকাল তোমাকেই জিতিয়ে যাবো। তোমাকেই। বিশ্বাস অবিশ্বাসের যে আগুনে আহর্নিশি তুমি পুড়ে মরছো কিছুতেই সেই আগুনের আঁচ আমার সংসারের গায়ে লাগতে দেব না।

মা—

বল্।

আমার ছোটবেলায় এই ঘরে ঢোকার কি শাস্তি হয়েছিল তোমার মনে আছে?

আছে।

ঘরটা বন্ধ ছিল ভালই ছিল আবার খুললে কেন, নতুন করে ছবি আঁকা শুরু করবে?

না। অন্যমনস্ক গলায় কথাটা বলে মেঘনা হাঁটতে শুরু করলেন। তার কেন যেন ভয় হচ্ছিল এই মাত্র সমরের আঁকা যে ছবিখানা তিনি ছবির মধ্যে থেকে আবিষ্কার করেছেন সেইরকম আরো কত কিছু অজানা হয়তো অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকলে আবিষ্কার করে ফেলবে। তারপর সেই সমস্যার সমাধানের জন্যে মেঘনার কাছে উপস্থিত হলে তিনি কি উত্তর দেবেন তাকে?

অনিরুদ্ধ মেঘনাকে অনুসরণ করে বলল, আমাদেব এক কর্মচারী বর্ধমানের ওদিকে একটা স্টেশনে বাবাকে দেখেছিল বলছে। তাকে সেখানে খোঁজ আনার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভালো করেছ, নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দিলেন মেঘনা। তারপর বললেন, আমাকে একটু একা থাকতে দাও। সুমিতাকে বলে দিও আজ আর আমি কিছু খাবোনা।

দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢোকার আগে বারান্দায় একটু দাঁড়ালেন মেঘনা।

একটা মানুষ নিয়ে সংসার হয়.না। অনেক মানুষ অনেক রকম স্বপ্ন আর বোঝাপড়া, অনেক রকম সংঘাতের শেষে একটা জায়গায় পৌঁছনোর চেষ্টা—কিন্তু কি আশ্চর্য...এ সংসারে সবাই আছে সব কিছু একই ভাবে চলছে...। নেই শুধু একটা মানুষ আর তাতেই মনে হচ্ছে এ সংসারটা এক মৃত কবন্ধের মত শুধু অভ্যাসের টানে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পিছিয়ে আসছে।

কাল রাতে হঠাৎ কেন যেন খুব কান্না পাচ্ছিল তাঁর। কতদিন কত বছর আগে এভাবে অবিরল অশ্রু ধারায় নিজেকে সিক্ত করেছিল তা তাঁর নিজেরই মনে নেই। শুধু মনে আছে আর একবার এইভাবে খুব কাঁদতে ইচ্ছে করেছিল। না, সময়ের মৃত্যুর খবর শুনে নয়। সমরের মৃত্যু কারুর কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। শুধু দিন আর সময়ের অপেক্ষা। তাদের গ্রুপের সবাই মনে মনে নিজেদের প্রস্তুত করে নিয়েছিল। সমরের না থাকার শূন্যতাটা ততটা দুর্বহ নয় যতটা একটা আত্মীয়ের ক্ষেত্রে হয়।

শুধু শোক নয় আনন্দেও কাঁদে মানুষ। অনিরুদ্ধ জন্মের সময়েও কেঁদেছিলেন মেঘনা। সে কান্না পরমার্থের কাছে নিজেকে নিবেদন। ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে পঙ্কজের সঙ্গে বিয়ের পর বাড়ি ফিরে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে অঝোর কান্নায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আজ এতদিন পরে সেদিনের কথা মনে পড়লে নিজের বোকামির জন্যে হাসি পায়।

বারান্দা থেকে সরাসরি পঙ্কজের ঘরটা দেখা যায়। নিভাজ শুভ্র বিছানা। নিখুঁত পরিপাটি সাজানো ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস।

বিশৃঙ্খলাকে ঘেন্না করেন পঙ্কজ।

ওয়াড্রবের ওপর একটা যুক্ত রূপোর ফ্রেমে দুজনের ছবি। না অনিরুদ্ধর কোন ছবি এ ঘরে নেই। ব্যবসার কাজে একবার জাপান গিয়েছিলেন পঙ্কজ। সেখান থেকে একটা আধুনিক ক্যামেরা কিনে এনেছিলেন। তাঁদের এই ছবি দুটো সেই নতুন ক্যামেরাতে তুলেছিলেন পঙ্কজ নিজেই।

ক্যামেরাটা বছরের পর বছর আলমারিতে পড়ে ছিল। একদিনের জন্যেও ব্যবহার হয়নি।

হঠাৎ এই কিছুদিন আগে পঙ্কজের কি খেয়াল হয়েছিল কে জানে ক্যামেরাটা আলমারি থেকে বার করে তাতে নতুন ফিল্ম লাগিয়ে বেড়ালের বাচ্চা তিনটের একগাদা ছবি তুলেছিলেন।

সত্যি তো সেই ছবিগুলো কোথায় গেল?

বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে এসে একটা দাঁড়ালেন মেঘনা।

তারপর ড্রয়ারের চাবির জন্যে চারপাশে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে থাকলেন। ড্রয়ারে চাবি লাগানো নেই—টানতেই খুলে গেল। নানা ধরনের অফিসের

কাগজ, ব্যাঙ্কের হিসাব পত্র, চেকবই, ডাঃ সমাদ্দারের একটা প্রেসক্রিপসন, এক কোণায় একটা চামড়া বাধানো ছোট ডাইরী।

না, ডাইরী লেখার অভ্যাস ছিল না পঙ্কজের।

ডাইরীখানার পাতা উল্টোতে উল্টোতে এক জায়গায় মেঘনার চোখ আটকে গেল। সেখানে লেখা আছে অনিলকে সমরের চারখানা ছবি বাবদ চার হাজার টাকা।

অনিল, তাঁর কাকার ছেলে অনিল।

একসময় খুব ঘন ঘন এ বাড়তে যাতায়াত ছিল অনিলের। মেঘনা জিজ্ঞাসা করলে অনিল হেসে বলতো, এখানে না এসে আমার কোন উপায় নেই। আমার ফাদার এন্ড মাদার তোমার ডে টু ডে খবর জোগাড় করার জন্যে আমার এপয়েন্ট করেছে। বুঝলে দিদি, তোমার আর জামাইবাবুর মধ্যে গণ্ডগোলের খবর দিতে পারলে আমার প্রমোশন হবে।

তুই বড্ড ফাজিল।

না দিদি তোমাব এ কথাটাও আমার জন্যে কম্প্লিমেন্ট হয়ে গেল। তোমার বলা উচিত ছিল আমি একটা বাসটার্ড বংশের বাসটার্ড চাইল্ড।

নিজের বাবাকে গালাগাল করছিস্?

তবে কি ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলবো। ছাড়ো এসব কথা। তোমার সঙ্গে বোধহয় আমার আর দেখা হবে না।

কেন রে?

একটা পার্টি থেকে অনেকদিন ফেউ-এর মত আমার পেছনে লেগেছিল। বলেছিল, রাজনীতিতে না এলে চিরকাল মার খেতে হবে। আমি রাজি হয়েছি। পুরুলিয়ার ওদিকে কোথায় যেন একটা সাঁওতাল গাঁয়ে গিয়ে থাকতে হবে। খাওয়া পরা প্লাস হাত খরচের জন্যে মাসে মাসে নগদ কিছু দেবে।

তুই চাকরি করবি?

কে আমায় চাকরি দেবে?

তোর জামাইবাবুকে আমি বলবো।

ছিঃ।

ডাইরীখানা হাতে নিয়ে অনিলের কথাই ভাবছিলেন মেঘনা। আনিল এখন কোথায় আছে, কেমন আছে কে জানে।

মা—মা—

নীচ থেকে অনিরুদ্ধর উত্তেজিত গলায় স্বর ভেসে এলো। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে আসছে সে। ঘরের দরজায় এসে অনিরুদ্ধ হাঁফ ধরা গলায় বলল, বাবার খবর পাওয়া গেছে।

কে বলল, কোথায় আছেন?

বলরাম হালুই বলে একটা লোক খবর নিয়ে এসেছে বাবা এখন তাদের বাড়িতেই আছেন।

(২৩)

ট্রেনখানা চলে যাবার পর বলরাম বললো, আমরা এক স্টেশন আগে নেমেছি কত্তা। আসেন, তাড়াতাড়ি এই পথটা দিয়ে বাইরে চলে আসেন।

নিজে বাইরে গিয়ে কাঁটা তারের বেড়াটা দিয়ে একটা মানুষ গলে যাবার মত পরিমাণে ফাঁক করে ধরলো বলরাম।

পঙ্কজ বললেন, কেন এখান দিয়ে যাবো কেন, গেট দিয়ে বাইরে যাচ্ছি আমি।

আহ্, কেন শুধু শুধু টাইম নষ্ট করছেন কত্তা। আগে বাইরে আসেন তারপর সব বৃত্তান্ত আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।

বেশ কসরত করে পার হবার চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হলো না। কাঁটা তারের আঁচড়ে তার পিঠের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গেল।

ইস্, এটা কি করলেন কত্তা। রক্তপাত। দাঁড়ান দাঁড়ান অব্যর্থ ওষুধ আছে। এখুনি লাগিয়ে দিচ্ছি।

হেঁট হয়ে পায়ের কাছে ঝোঁপ থেকে মুঠো করে কতোগুলো পাতা ছিঁড়ে হাতে ডলে তাই পঙ্কজের কাঁদে লাগিয়ে দিল বলরাম। তারপর বলল, চলুন কত্তা, একটু হাঁটতে হবে।

পঙ্কজের ব্যাগটা বলরামের হাতে। পায়ে চলা সরু মেঠো পথে সে হাঁটতে শুরু করলো।

পঙ্কজের প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল তিনি একটা অন্য পৃথিবীতে এসে পড়েছেন। যেখানকার গাছপালা মাটিই শুধু অন্যরকম নয় প্রকৃতির গায়ের গন্ধও অন্যরকম। তাঁর ইচ্ছে করছিলপায়ের জুতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে। বলরাম হা হা করে উঠলো, খবরদার ওটি করবেন না কত্তা। অনেক পোকামাকড় আছে আপনি দেখার আগেই পা ফুটো করে হৃদয়ে সেধিঁয়ে যাবে।

কি বলছো বলরাম তাই আবার হয় নাকি?

হয় কত্তা, সব কিছু হয়। আমার একটা বেড়াল ছানা ছিল সে ব্যাটা দুধ খেত না। সামনে মাছ পড়ে থাকলে ছুঁতো না। আমার আগের পরিবার সখ করে তার নাম দিয়েছিল কন্যাকুমারী।

চলতে চলতে থম্‌কে দাঁড়ালেন পঙ্কজ। মুহূর্ত মধ্যে তাঁর সমগ্র চেতনার ওপর দিয়ে প্রবল একটা আতঙ্কের হিমস্রোত বয়ে গেল। তাঁর বাড়ির তিনটি ছোট বেড়াল ছানার একটির নামও কন্যাকুমারী। কি হলো কত্তা, দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন অমনভাবে। ভাবছেন আমি মিথ্যে বলছি?

নাহ্—চলো। চলো।

দশ পা এগিয়ে দাঁড়াল বলরাম। আচ্ছা কই আপনি তো জানতে চাইলেন না এক স্টেশন আগে নেমে পড়লাম আমরা।

কেন?

চালতা কুসুমপুর স্টেশনের মাস্টার বাবুটার শকুনের চোখ। বিনা টিকিটের একটি যাত্রীরও আর চোখকে ফাঁকি দিতে গেলে যাবার উপায় নেই। তা ভাবলাম আমাদের গাঁয়ে এই আপনার প্রথম পদার্পণ। আপনাকে শুধু শুধু বেইজ্জত করি কেন।

পঙ্কজ কেমন অসহায়ের মত বললেন, আমার তো টিকিট আছে বলরাম।

বলরাম অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলে উঠলো, ছি ছি কত্তা, তাহলে তো বড় অন্যায় করে ফেললাম। আগে বলবেন তো আপনি টিকিট কাটা যাত্রী। আমি কত্তা টিকিট কাটিনে। কেন কাটিনে জানেন, সেই যখন আয়না ফিরি করতাম তখন একদিন টিকিট কেটেছিলাম সাতটাকা দিয়ে। কপাল এমন জানেন কত্তা, চারখানা গাঁয়ে সারাদিন ধরে চক্কর দিয়েও একখানা আয়নাও বিক্রি করতে পারলাম না শুধু হয়রানিই সার। ভাবলাম, ওসব টিকিট কাটার বড় মানুষী চালের জন্যেই আমার এই দশা। তারপর থেকে আর কোনদিন কত্তা— ইস্ সরে আসুন, সরে আসুন...যাকগে, চলে গেলেন ইনি, আপন পথে...চিতি, গায়ে চক্কর দেখলেন না—।

পঙ্কজ ডলে ডলে মুখের কপালের ঘাম মুছলেন। তারপর বললেন, আর কতটা রাস্তা বলরাম?

এই তো এসে গেছি বলা যায়। বলরাম সহসা রাস্তা ছেড়ে যেতে যেতে বলল, একটু এখানটায় দাঁড়ান, আমি আসছি।

প্রায় তক্ষুণি ফিরে এলো সে। হাসতে হাসতে হাতভর্তি সাদা ফুলের বোঝা দেখিয়ে বলল, মুচকুন্দো ফুল কত্তা। এ অঞ্চলে এই একটিই গাছ। বলতে পারেন সারা বছর ফুল হয়। আমার এ বৌটা আবার মুচকুন্দ বলতে অজ্ঞান। তার জন্যেই পেড়ে আনলাম, কত্তা।

সত্যিই আর বেশীক্ষণ হাঁটতে হলো না তাঁদের।

বলরাম রাস্তার ধারে একটা ঝুপসী চটকাগাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দেখাল, ঐ আমার ঘর কত্তা। সামলে আসবেন একটু। এ পথটা আবার ঢালু আছে। চারপাশে বাঁশের কঞ্চি বেড়া দিয়ে ঘেরা একখানি মাটির ঘর, ওপরে খড়। নতুন খড় ছাওয়া হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। বেড়ার গায়ে নীল অপরাজিতা ফুটে আছে। বেড়ার মধ্যে গায়ে গায়ে লাগা দুটো গাছ। একটা কলকে আর একটা চিনতে পারলেন না পঙ্কজ।

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলরাম চেঁচিয়ে ডাকলো কইরে বৌ, কোথায় গেলি, কে এসেছে দ্যাখ শীগগির আয় বাইরে আয়। অতো লজ্জা পাওয়ার কিছু

নেই। কথার পর পেছনে মুখ ঘুরিয়ে বলরাম বলল, ওকি কত্তা দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

দুজনের কথার মধ্যেই একটা মেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চট করে দেখে বোঝা শক্ত সেই বলরামের স্ত্রী। মাথায় ঘোমটা নেই। কপালের সিঁদুরের টিপটা ঘামে ভিজে নাকের ওপর অবধি লাল জলের ধারা নেমে এসেছে. চোখের দৃষ্টিতে কোন বিস্ময় নেই তার পরিবর্তে মমতা মাখানো আহ্বান। পঙ্কজ কিছু বুঝে ওঠার আগে তাঁর পায়েতে ঢিব্ করে একটা প্রণাম করলো বৌটি। বিনবিনে গলায় বলল, আসুন বাবা, ভেতরে আসুন। আমায় আপনি শিবি বলে ডাকবেন। বাইরে থেকে যেটাকে পঙ্কজের একটা মাত্র ঘর মনে হয়েছিল ভেতরে দেখলে পেছনে আর একখানা ঘর আছে। দাওয়ার একদিকের কোণে রান্নাঘর। তার আগে দাওয়ার ওপরেই পর পরদিনটে কাঠের উনুন। কাছেই কোথাও দোয়েল শিষ দিচ্ছে। এখন সময় ঠিক কতো বুঝতে পারলেন না পঙ্কজ। দশটা এগারোটার বেশী হওয়ার কথা নয়। বেলার তুলনায় সূর্যের তেজ কম। চারপাশে গাছপালার সবুজ থেকে একটা অদ্ভুত ঘ্রাণ আর শব্দের মতন কিছু উঠে আসছে। আঃ—পঙ্কজ বুঝতে পারলেন তাকে নিয়েই গাছপালার মধ্যে কথা চালাচালি শুরু হয়েছে। তার চেনা কদমগাছটাও এই একই ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইতো।

দাওয়ায় বসে বসে পঙ্কজ দেখতে পেলেন শিবানী তার দিকে পেছন ফিরে পাতকুয়ো থেকে জল তুলছে। পাতকুয়ো দেখা দূরের কথা পঙ্কজ কোনদিন এর আগে পাতকুয়ো শব্দটাই শোনেন নি।

শিবানী জলতোলা শেষ করে পেতলের বালতি ভর্তি জল এনে তার সামনে রেখে বলল, বাবাঃ হাতমুখ ধুয়ে নিন। তারপর খেতে দেব।

একটা কাঁসার থালায় বেশ বড় চারটে মুড়ির মোয়া আর চারটে নারকেল নাড়ু। থালার একপাশে কুচি করে কাটা শশা আর নুন।

খুব ছোটবেলায় একবার কোথায় যেন গিয়েছিলেন পঙ্কজ। সেখানে খেয়েছিলেন মুড়ির মোয়া। সেই প্রথম সেই শেষবার।

বলরাম বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে কিছু একটা করছে। সেখান থেকে ঠুক ঠুক করে শব্দ ভেসে আসছে। দোয়েলটা এখন আর ডাকছে না। কাঁসার থালায় খাবার। কাঁসার ঘটিতে জল এবং মুখোমুখি বসে থাকা একটি পবিত্রতম মুখের তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকা- সব মিলিয়ে একটা সদা পরিচিত জগতের অবারিত দ্বার তাঁর নিজের মধ্যে টেনে নিতে চাইছে। বারবার চেষ্টা করেও এই মুহূর্তে পঙ্কজ নিজের ফেলে আসা জীবনটাকে স্মরণে আনতে পারছেন না। কী আশ্চর্য—সত্যিই কি তাঁর স্মৃতি বিস্মরণ ঘটেছে? না তাঁর নতুন জন্ম হচ্ছে?

দুটি নারকেল নাড়ু আর শশা খেলেন পঙ্কজ। মুড়ির মোয়া দাঁতে ভাঙ্গার চেষ্টা করে বিফল হলেন।

শিবানী বলল, থাক্ থাক্ বাবা, ও তোমার খেতে হবে না। থালাখানা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সে। যাবার আগে বলে গেল, এবার তুমি একটু বিশ্রাম করো।

আশ্চর্য—পঙ্কজ নিজেই জানতেন না এত লোভী তিনি। তাঁর ইচ্ছে করছে অনন্তকাল ধরে মাটির ঘরের মাটির এই দাওয়ায় বসে ঠিক এইভাবেই বসে থাকতে।

আহ—ওটা কি পাখী...এই মাত্র যে লেজ নাচাতে নাচাতে পঙ্কজের সামনে দিয়ে উড়ে গেল?

বলরাম—বলরাম—বলরাম

বলরাম নয়, শিবানী দৌড়ে এলো, কি হলো?

না কিছু হয়নি, পঙ্কজ শান্ত ভাবে মাথা নাড়লেন, কিছু হয়নি।

গাড়িতে বলরামের সঙ্গে আলাপ হবার পর পঙ্কজের মনে হয়েছিল বলরাম বাউন্ডুলে ধরনের মানুষ। তাছাড়া তার আর্থিক অবস্থাও দিন আনা দিন খাই গোছের। তার বাড়িতে পা দিয়ে তাঁর ধারনা পুরোপুরি বদলে গেল। তিনি বুঝতে পেরেছেন বলরাম বেশ গোছানো ধরনের মানুষ। এক এক ধরনের মানুষ থাকে তার বাইরেটা ভেতরের ঠিক উল্টো। তাকে একবার দেখেই চেনা যায় না।

দাওয়ার ওপর শিবানী মাদুর পেতে দিয়েছিল। তার ওপর শুয়ে নিজের অজান্তেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল পঙ্কজ। কতক্ষণ এই ভাবে ঘুমিয়েছেন জানেন না হঠাৎ অদ্ভুত একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল তাঁর। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে শুয়েই থাকলেন। বুঝতে পারলেন শব্দটা তাঁর ভেতর থেকেই উঠে এসেছিল। স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। স্বপ্নটা অদ্ভুত, মেঘনা তিনি, সন্দীপ সবাই মিলে একটা নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে চলেছেন। কোথায় যাবেন কেউ জানে না নদীর জলে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে যাচ্ছিল একটি মানুষ। মানুষটির একখানা হাত কনুই থেকে কাটা। মানুষটা একহাতেই সাঁতার কেটে আথাল পাথাল ঢেউ-এর মাথায় উঠে আবার জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁদের তিনজনের মধ্যে থেকে সন্দীপ ও মেঘনা পর পর হাতকাটা মানুষটাকে লক্ষ্য করে জলে ঝাঁপ দিল। পঙ্কজ চীৎকার করে তাদের ডাকলেন। ডাকতে ডাকতে তাঁর গলা চিড়ে রক্ত পড়তে লাগলো, তবু কেউ সাড়া দিচ্ছিল না। আর ঠিক তখনি একটা মানুষ এসে তার একখানা হাত ধরে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করলো। মানুষটার মুখখানা অনেকটা বলরামের মত দেখতে—কি মানে এই স্বপ্নের?

নিজের বুকে একখানা হাত রাখলেন পঙ্কজ। তারপর পাশে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন দুটি চোখে অতলান্ত বিশ্বাস জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। শিবানী তার হাতে একটা কাঁসার গ্লাসে জল।

শিবানী বলল, নাও ধর, জলটা খেয়ে নাও।

স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?

আঃ—এক চুমুকে সবটুকু জল খেয়ে ফেললেন তিনি, বলরাম কোথায় গেল?

হাটে গিয়েছে। এখুনি ফিরবে।

হাট, হাট কি?

এই শব্দটা তার অচেনা নয় তবু এই মুহূর্তে চিনতে পারছেন না।

হাটে গিয়েছে কেন বলরাম?

গুড় চিঁড়ে আর মুড়ি কিনতে।

উঠে দাঁড়ালেন পঙ্কজ। হাট কি বুঝতে পেরেছেন। বললেন, আমিও একটু হাট থেকে ঘুরে আসি।

যাবে, ঠিক আছে যাও। সোজা দক্ষিণ দিক ধরে হাঁটলেই পেয়ে যাবে। মানুষটার সঙ্গে দেখা হলে বোলো হাট থেকে পুঁই মিচরি আনতে। আর সবরি কলা।

পঙ্কজ বাঁশের গেট ঠেলে বাইরে এসে ঢালু পথটার ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

আশ্চর্য কেন এমন হয় মানুষের। এক একদিন মনে হয় আজকের দিনটার জন্যেই তার বেঁচে থাকা। জীবনে এই প্রথম তিনি এই পথে হাঁটলেন তাও তাঁর মনে হচ্ছে কত চেনা। রাস্তার পাশে দুটো গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা খেজুর গাছ। তার নীচে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বেজি...এ সব কি তিনি এর আগে পৃথিবীর কোনো শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর আঁকা ক্যানভাসে দেখেছেন? নিশ্চয় দেখেছেন তা না হলে এত চেনা লাগছে কেন তার? মাথায় বড় বড় দুটো বস্তা চাপিয়ে উল্টো দিক থেকে একজন মানুষ আসছিল।

পঙ্কজের কাছাকাছি এসে মানুষটা দাঁড়াল, একি কত্তা, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

বলরাম। এখন তার পরনে হাঁটুর ওপর তোলা ধুতি আর গেঞ্জি।

তোমার মাথার বস্তায় কি বলরাম?

মুড়ি আর চিঁড়ে।

তোমার কষ্ট হচ্ছে, দাও, একটা বস্তা আমায় দাও।

সর্বনাশ, বলরাম জিব কাটলো, একথা বলবেন না। আপনি আমার অতিথি। বৌ শুনলে রসাতল করবে।

না বলরাম, কেউ কিছু বলবে না. দাও ওপরের বস্তাটা আমার মাথায় চাপিয়ে দাও—

না কত্তা, এ কম্মটি আমার দ্বারায় হবে না—

তাহলে আমি এখন থেকেই ষ্টেশনের রাস্তা ধরছি, পঙ্কজ তাঁর জিদ ছাড়লেন না। যা বলছি শীগগির করো।

ছোট বস্তাটা মাথায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পঙ্কজ বললেন, এত মুড়ি আর চিঁড়ে কি হবে?

আপনাকে বুঝি বলিনি কত্তা, সন্ধ্যে হলেই দেখতে পাবেন কি হবে। দুপুরটা একটু ঘুমিয়ে নেবেন কত্তা, তাহলে রাত্তিরে বেশী কষ্ট হবে না।

দুপা চলার পরেই পঙ্কজ বুঝতে পারলেন তাঁর কষ্ট হচ্ছে। মাথায় পনেরো কিলো চিঁড়ের বস্তাটা কয়েকটন ওজনের একটা পাথরের চেয়েও ভারি মনে হচ্ছে।

বুঝতে পারলেন কাজটা তিনি ভাল করেন নি। সব কাজ সকলের জন্যে নয় কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতেও পারলেন না।

বলরাম হনহনিয়ে হেঁটে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। এখনও বক্ বক্ করে চলেছে সে। তার খেয়ালই নেই যে পঙ্কজ তার সঙ্গে নেই।

পঙ্কজ একটু দাঁড়ালেন। নিশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ছায়া ছায়া শূন্যতা।

আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলরাম পেছনে তাকিয়ে দেখল পঙ্কজ নেই। মাথার বস্তাটা রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে পেছনে দৌড়ে এলো। পঙ্কজের এক হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে বলল, দেখলেন কত্তা তখনি আপনাকে বলেছিলাম একাজ আপনার নয়। কি অনর্থ ঘটালেন বলুন দিকিনি...বৌ যদি শোনে...তার কথার জবাব না দিয়ে নীরবে হাঁটতে থাকলেন পঙ্কজ। তার লজ্জা করছিল।

বাড়ি ফিরতেই এক লহমায় তাদের মুখ দেখে শিবানী আন্দাজ করে ফেলল নিশ্চয় একটা কিছু ঘটেছে। বলরাম তাঁকে আগেই বারণ করে দিয়েছিল শিবানীকে যেন খবরদার কিছু বলবেন না, তাহলে আমার আপনাব কারুরই আজ বাড়িতে ভাত জুটবে না।

কি গো বাবা, ও মনিষ্যি তোমাকে কিছু বলছে নাকি। সব কিছু পারে ও। কি বলছে শুনি।

কিছুই বলেনি—

বলেনি তাহলে এমন বোবা হয়ে আছ কেন? ভেবেছে শিবি একটা মুখ্যু মেয়ে ও কি বুঝবে। ওকি, ঘাড়ে হাত দিচ্ছ কেন? আমার দিব্যি বলো কি হয়েছে, না বললে আমার মরা মুখ দেখবে...শিবানীর গলা ধরে এলো। চোখের কোলে জল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলরাম চোখের ইশারায় মিনতি করছিল, খবরদার কিছু বলবেন না।...কিন্তু শিবানীর চোখের অশ্রুর আভাষ পঙ্কজকে গলিয়ে ফেলল।

তিনি বললেন কিচ্ছু হয়নি। ছোট বস্তাটা মাথায় নিয়ে দেখছিলাম আনতে পারি কিনা—

তোমার মাথায় বস্তা চাপিয়েছিল ওই মনিষ্যি—ছিঃ—

জলের বদলে শিবানীর চোখের মণিতে আগুন ঠিকরে উঠলো, হা ভগবান, এ পাপ আমি কোথায় রাখি....বলি চোখ কানেব মাথা খেয়েছ...ভিমরতি হয়েছে গো মানুষটার...ভিমরতি—

আগুনের গোলার মতো ছিটকে এদিকে চলে গেল শিবানী। তখুনি ফিরে

এলো আবার, হাতে একখানা গামছায় বাঁধা ইঁটুলি। থাকলো তোমার সংসার, আমার বাপের বাড়ি নেই, শ্বশুর বাড়ি নেই তাও জেনো আমার ভগবান আছেন—

এমন সঙ্কটে আগে কখনো পড়েননি পঙ্কজ। বুঝতে পারলেন না কি করবেন। দেখে মনে হচ্ছিল শিবানীর এই রুদ্র মূর্তি দেখে বলরামের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তার চেতনা নেই।

পঙ্কজ বললেন, তুমি চলে গেলে তাহলে আমিও যাই।

বলরাম দাও আমার ব্যাগটা দাও—, দেখি এই দুপুরে কোথায় একটু আশ্রয় জোটে।

বাঃ বাপ, বাঃ তুমি তো বেশ মনরাখা কথা বলতে জানো। শিবানী হেসে ফেলল, কে বলেছে তোমায় আমি যাচ্ছি? দাঁড়াও আমি আসছি। খবরদার এখান থেকে এক পাও নড়বে না।

দশ মিনিট বাদে ফিরে এলো শিবানী। তার হাতে একটা বাটিতে তেল। কাছে এসে বলল, বসে পড়ো বাবা, তেলে কর্পূর দিয়ে ফুটিয়ে এনেছি। মালিশ করে দিলে ঘাড়ে ব্যাথাটা হবে না।

কোথায় যেন পঙ্কজ পড়েছিল সব মানুষের এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একটা জোড়া থাকে। ঠাকুমাকে মনে পড়ে গেল পঙ্কজের।

দুপুরে খাবার পর বাগানে একটা কচি ডালিমগাছে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন পঙ্কজ। কমলা রং-এর ছোট ছোট ফুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে গাছটা। মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে ফুলগুলোর ওপর।

সকালের চেয়ে এখন রোদের তেজ বেড়েছে তবু কেন যেন পঙ্কজের গায়ে কোন তাপ লাগছে না।

দাওয়ায় শিবানীর নিত্য দিনের কাজ শুরু হয়েছে। এখন থেকে রাত অবধি চলবে।

বড় কড়া ভর্তি গুড় জাল হচ্ছে কাঠের উনুনে। মুড়ির মোয়া, চিঁড়ের মোয়া তৈরি হবে। নারকেলের নাড়ু তৈরি হবে। কাল সকালের ট্রেনে বলরাম শহরে গিয়ে বাঁধা দোকানে দোকানে সেগুলো দিয়ে নগদ টাকা নিয়ে বিকেলের গাড়িতে ফিরে আসবে।

বুঝলেন কত্তা, আমার এই দ্বিতীয় পক্ষ তো ঘরে এলেন সেই সঙ্গে আমার আয়না বিক্রীর কাজটাও লাটে উঠলো। একদিন কি বলল জানেন? বলল, না বাপু, ও সর্বনেশে কাজ আর আমি তোমায় করতে দেব না। আবার কে একদিন আয়নার পেছন পেছন এসে হাজির হয়ে যাবে—

তুমি কি আমায় এতো বোকা ভেবেছ? তা কত্তা, আয়না না বেচলে খাবো কি? ডাল চাল কিনবো কি দিয়ে? আর কোনো কাজেই জানিনে আমি। শেষকালে ঐ একদিন এই ব্যবসাটার বুদ্ধি দিল। তা বুঝলেন কত্তা, মালগুলো ঠিক ঠিক দোকানে পৌঁছতে পারলে বেশ দু পয়সা ঘরে আসে—

বাগানে বসে শিবানীর পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখছিলেন পঙ্কজ। এক কড়া চিঁড়ের পাক নামিয়ে এখন ডাই করা নারকোল কুড়তে বসেছে।

পঙ্কজের মনে আছে দেশ পত্রিকায় এক সংখ্যায় একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারের দুর্গাপুজোর বিবরণ পড়েছিলেন তিনি। সেখানে এইরকম নারকোল কোড়ার বর্ণনা পড়েছিলেন বাড়ির বধূদের উঠোনে সারি সারি কুড়ুনি বটি পেতে।

নিজের চোখে আগে সে দৃশ্য কখনো দেখেননি তিনি। তিল নাড়ু, নারকোল নাড়ু, খাজা, মোয়া, সবকিছুই আবার ফিরে এসেছে বাঙালীর রসনা তৃপ্তির জন্যে কিন্তু এখন তার পেছনে কাজ করছে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবসায়িক বুদ্ধি।

পঙ্কজ একবার সুইজারল্যান্ডে গিয়ে ঘরে ঘরে ঘড়ি ছাড়াও নানা যন্ত্রাংশ তৈরি করতে দেখেছিলেন মেয়ে বৌদের। সেই একইভাবে কুটির শিল্প দেশের গ্রামের অতি গভীরে শুধু ছড়িয়েই পড়েনি, মানুষ তাকে কত সহজভাবে নিয়েছে তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ডালিম ফুলের গন্ধ ছাপিয়ে এখন বাতাসে গরম গুড়ের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। শিবানীকে কেমন যেন আলুথালু দেখাচ্ছে। তার মাটির রং এর মুখের ওপর কাঠের আগুন লালচে আভা ছড়িয়ে দপদপিয়ে নাচছে। চোখ দুটি ঈষৎ কুঁচকে আছে। থুতনীতে ঘামের ফোটা।

শিবানী রূপসী নয় কিন্তু এই মুহূর্তে তার সর্বাঙ্গ ঘিরে এমন একটা অপার্থিব রূপ সোচ্চার হয়ে আছে যে পঙ্কজ চোখ ফেরাতে পারলেন না।

বাবা, ও বাবা, এখানে উঠে এসোতো একবার—শিবানী তাঁকেই ডাকছে।

পঙ্কজ উঠে দাঁড়ালেন। কাছে যাবার পর শিবানী বলল, বাবা, এই উনুনটায় একটু নজর রেখো তো, গুড় ফুটলেই আমাকে বলো, নারকোল দিয়ে নাড়তে হবে। নাও এই টুলটাতে বসো, দেখো গুড় তলায় ধরে যায় না যেন, তাহলে বহু টাকা লোকসান হয়ে যাবে। কড়া ভর্তি তরল সোনার মতন রং-এর গুড়। বির বির করে ফুট কাটছে।

বলরাম একটু আগেই এখানে ছিল। এখন কোথায় যেন গিয়েছে। পঙ্কজ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এখানে এসে জুটেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এই সংসারের সঙ্গে খাপে খাপে এঁটে গিয়েছেন। তাঁর বুকের মধ্যে স্বপ্নের নদীটা এখন শান্ত হয়ে কুল কুল করে বইছে।

বাবা—

বলো—

শিবানী বলল, সত্যিই তোমার সাত কুলে কেউ কোথাও নেই?

কেন একথা জানতে চাচ্ছ শিবানী?

আবার শিবানী বললে, তোমায় যে বলেছি আমায় শিবি বলে ডাকতে। আমার বাপ আমায় ঐ নামে ডাকতো।

আচ্ছা তাই বলবো, ভুল হয়ে গিয়েছে।

কই বাবা, আমার কথার জবাব দিলে নাতো?

বুঝলে শিবি, তোমার মত মেয়ে আমি আগে কখনো দেখিনি।

হাতের কুড়ুনি কাত করে শুইয়ে রেখে শিবানী ঘুরে বসলো, ওমা, আমি আবার অন্য কি রকম হলাম?

তুমি খুব ভাল শিবি।

ছাই ভালো। আমি কি অপকর্ম করেছি তা তুমি জানো না তাই আমায় ভাল বলছো।

কি করেছ?

সে খুব লজ্জার কথা। বাপের ঘর ছেড়ে এক বাউণ্ডুলে আয়নাওয়ালার পেছন পেছন চলে এসেছি। আমার গায়ে সবাই আমাকে নষ্ট মেয়ে বলে, শিবানীর গলার স্বর ভিজে শোনালো। শিবানীর সামনে কলাপাতার ওপর সদ্য কোড়া নারকোল ধবধবে সাদা ভাতের মত স্তূপ হয়ে আছে। অন্যমনস্ক হাতে শিবানী তার থেকে কাঠের কুচি, ছিবড়ে বেচে বেচে ফেলে দিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পঙ্কজ বললেন, তোমার বাবা বুঝি...

নেই। মরেছে...শিবানী তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, খুব বোকা ছিল আমার বাপটা...। খালি বলতো তুই না থাকলে আমি বাঁচবো না, ওমা কি বোকা দেখ, সত্যিই মরে গেল। অসুখ নেই বিসুখ নেই...হা হা করে কেঁদে উঠলো শিবানী।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদার পর নিজেই আঁচলে চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলো। কুড়ুনি খানা তুলে নিয়ে তাতে ঘস্ ঘস্ শব্দে নারকোল কুড়তে থাকলো।

বাবা—

বলো।

কথা বলছো না কেন। বোবা মানুষ আমার দুচক্ষের বিষ। পঙ্কজ হাসলেন। মনে হচ্ছ গুড় এবার হয়ে এসেছে।

হোকগে—শিবানী বলল, তাই বলে ভেবোনা তুমিও খুব ভালো মানুষ। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তুমিও ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে নিজে বিবাগী হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। ও তুমি যতই বলো তুমি জন্ম ইস্তক বাউণ্ডুলে, আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে। তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ঐ নদী খুঁজতে আসার গল্পটা মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে—

নিজের জায়গা ছেড়ে শিবানী উঠে এলো। এবার ওঠো তুমি, আমি দেখছি। ওমা গুড়ে যে আঠা বাধেনি এখনো আমি দেখেই বুঝেছি জল মেশানো গুড়।

কাঠের যে চ্যাটালো হাতাখানা দিয়ে শিবানী গুড় নাড়ছিল সেখানা নাকের কাছে তুলে শুঁকে দেখল। তারপর দু আঙ্গুলের ডগায় সামান্য গরম গুড় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল গুড়ের পাক তৈরী হয়েছে কিনা।

সন্ধ্যে বেলা একটু ঝড় মতো হলো। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি হবে। হাতে একটা হ্যারিকেন নিয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সমস্ত বাগান দৌড়ে দৌড়ে বেল আব

বাতাবি লেবু কুড়োলো শিবানী।

রাত একটু বেশী হবার আগেই আকাশ ভর্তি করে ঝাঁক ঝাঁক তারা উঠে পড়লো।

সামনের বড় ঘর খানার আর্ধেকটা জুড়ে মাদুর পেতে তার ওপর দুপুরে তৈরী নাড়ু আর মোয়া বিছিয়ে দিয়েছে শিবানী। এগুলো শুকোলে টিনে তুলে রাখবে। বৃষ্টি না হওয়ার জন্যে খুশিই হয়েছে সে। এতগুলো মাল ধাপ ধরে গেল দোকানদার নেবেই না।

ঐ ঘরেরই একপাশে চাটাই পেতে একটা লম্ফ সামনে নিয়ে চুপ করে বসে আছে বলরাম। বিকেলের দিকে অনেকক্ষণ বাড়িতে ছিল না সে। ফেরার পর তাকে দেখেই পঙ্কজ বুঝতে পেরেছিলেন নেশা করে এসেছে সে।

বলরাম দু হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে ঝিমোচ্ছে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে পাশে রাখা একটা বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে মেঝের ওপর আছড়ে মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করছে।

তার এই আচরণ দেখে পঙ্কজ যে অবাক হয়েছেন তা বুঝতে পেরেই বোধহয় শিবানী বলল, এখানে বড্ড শেয়াল, আর খটাসের উপদ্রব। একটুখানি অন্যমনস্ক হলেই মেঝেয় গর্ত করে ঘরে ঢুকে চক্ষের নিমেষে সব মোয়া নাড়ু শেষ করে দিয়ে যাবে।

রাতে খাবার পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন পঙ্কজ। এত ঘুম যে তাঁর চোখে কোথা থেকে এলো কে জানে।

দুপুরের মতো এখনও ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখলেন তিনি। বাড়িব একতলায় মেঘনার স্টুডিওর ঘরখানায় একজন মানুষ ঢুকেছে। অন্ধকারের মধ্যেই সে ছবির মধ্যে থেকে কিছু একটা খুঁজছে...। দুমদাম শব্দ শুনে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাতেই মানুষটা জানলা টপকে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পঙ্কজ স্পষ্ট দেখতে পেলেন তার ডান হাতখানা কনুই এর কাছ থেকে কাটা। চার হাজার টাকা নিয়ে সমরের চারখানা ছবি কিনেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলবেন। অনিলকে বলেছিলেন, তুমি খবর নাও, ওর আঁকা ছবি আর কোথায় আছে। সব ছবি কিনে নেব আমি।

কত্তা—ও কত্তা, ওঠেন একটু—

বলরাম গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো পঙ্কজকে। পঙ্কজ চোখ খুলে বললেন, কি বলো বলরাম।

একটু উঠে আসেন কত্তা—

পঙ্কজ উঠে তার পেছন পেছন ছোট ঘরখানায় গেলেন। বলরাম বলল, এই লাঠিখানা হাতে নিয়ে এখানে একটু বসুন কত্তা। মাঝে মাঝে একটু শব্দ টব্দ করবেন আর কিছু করতে হবে না। দু কলসী গুড় আছে, একটু সজাগ না থাকলে শেয়াল ঢুকে সব সাবড়ে দিয়ে যাবে।

চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো বলরাম, আপনাকে সারারাত জাগতে হবে না কত্তা, আমি বৌ আপনি তিনজনা পালা করে পাহারা দেব।

ভালো করে দিনের আলো স্পষ্ট হবার আগেই পঙ্কজের ঘুম ভেঙে গেল। কখন তিনি পাহারার ওখান থেকে উঠে এসে বিছানায় শুয়েছেন তা মনে করতে পারলেন না।

চোখ খোলার আগেই তাঁর মনে হলো একটা নতুন পৃথিবী তাঁকে তার দিনের প্রথম পদচারণার সঙ্গী করবে বলে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

আঃ—কি একটা পাখী শিস্ দিচ্ছে, ঝিনঝিন শব্দে ডালিম গাছের সদ্য ফোটা ফুলের পাপড়ির ওপর যৌথ নৃত্যের আসর শুরু হয়েছে মৌমাছির দলের, ঘাসের কচি কচি সবুজ ডগাগুলো শিহরিত হতে হতে মাটির গর্ভে প্রোথিত তাদের শেকড়ে নতুন করে অঙ্কুরিত হবার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে।

পঙ্কজ উঠে পড়লেন।

নিঃশব্দে কুয়ো তলায় গিয়ে মুখ হাত ধুলেন। তারপর ফিরে এসে দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে দুহাত কপালে তুলে প্রণাম করে মনে মনে বললেন, তোমার সুখী হয়ো।

তারপর বাঁশের গেট খুলে রাস্তায় পা রাখলেন। হেঁটে এগিয়ে যাবার আগে তার একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না।

(২৪)

অনিরুদ্ধর সঙ্গে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে মেঘনা দেখলেন একটি মাঝবয়সী মানুষ ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘনা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর পর সে দুহাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বলল, মাঠাকরুণ, আমার নাম বলরাম হালুই।

কোথায় থাকো তুমি?

আজ্ঞে চালতা কুসুমপুর গ্রামে।

বাবু, তোমার ওখানে আছেন?

না, আমার বাড়িতে এক রাত্তির ছিলেন। এখন যেখানে আছেন সে জায়গাটা আমি চিনি।

আমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে?

কেন পারবো না।

অনিরুদ্ধ বলল, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলে?

আজ্ঞে কত্তার ব্যাগে একখানা চিঠিতে ঠিকানা লেখা ছিল।

কই চিঠিখানা দেখি। মেঘনা হাত বাড়ালেন।

বলরাম তার পকেট থেকে একখানা মুখছেড়া খাম বার করে তাঁর হাতে দিল। বলল, কত্তা চলে আসার পর আমার পরিবার দিনরাত্তির কান্নাকাটি করছে। মা,

অনিরুদ্ধ বলল দেরী না করে আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়া উচিত। ড্রাইভারকে গাড়ি আনতে বলে দিচ্ছি।

মেঘনা বললেন, তার আগে বলরামকে কিছু খেতে দিতে বলো। অনেক দূর থেকে এসেছে। আর ওকে কিছু—কথাটা শেষ করতে হলো না। অনিরুদ্ধ তাঁর ইচ্ছাটা বুঝে ফেলে বলল, ঠিক আছে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর গাড়িতে উঠে সুমিতা। বলল, কতক্ষণ যেতে লাগবে আমাদের?

সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল বলরাম। বলল আজ্ঞে, এখান থেকে দু ঘণ্টার মতো লাগবে।

মেঘনা চুপ করে বসেছিলেন। তার চোখ বাইরের দিকে প্রসারিত। একটা বার্থতার অপরিসীম লজ্জা তাঁর সারা মনকে ছেয়ে আছে। নারী হিসেবে একজন পুরুষকে তিনি আকর্ষণ করে নিজের গৃহের সংসারের আঙ্গিনায় ধরে রাখতে পারেন নি। আর একটু জোরে চলাও—অনিরুদ্ধ ভেতরে ভেতরে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাকে দেখলে বোঝা যাচ্ছে না। সুমিতা একদম চুপ। এই মুহূর্তে তিনটি আবর্তন ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে মহাবেগে নিজের চারপাশেই ঘুরে চলেছে।

একটা লেভেল ক্রসিং-এ এসে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়লো। একখানা মালগাড়ি যাচ্ছে।

গাড়ির দরজা খুলে সুমিতা নেমে পড়লো। নীরবে ধীর লয়ের পা ফেলে ফেলে হাঁটতে থাকুলো। এই অচেনা অজানা স্থানটিতে জীবনে এই প্রথম এই শেষবারের মতো আসা হলো তার। লাইনের পাশে রাস্তার কোল ঘেষে বৃদ্ধ বকুল গাছটার সঙ্গে এ জীবনে আর কখনো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। মনে হতেই সুমিতার মন কেমন করে উঠলো।

আসুন দিদিমণি, উঠে আসুন—গাড়ি ছাড়বে—

মেঘনা নয়, অনিরুদ্ধও নয় বলরাম নামের অপরিচিত মানুষটা তাকে ডাকছে।

খুব অবাক হলো সুমিতা। অতীতের কোন এক জন্মে এই রুক্ষ ক্লান্ত এবং সাহসহীন মানুষটাই কি তার যাত্রা সঙ্গী ছিল—?

আজ সকাল থেকেই কেন এমন হচ্ছে সুমিতার। বার বার মনে হচ্ছে তার চারপাশের চেনা গ্রহগুলি থেকে কোনো একটা গ্রহ তার আবর্তন ক্ষেত্র থেকে ছিটকে সরে গিয়ে অনন্ত বিশ্বের বিপুল অপরিচয়ের মধ্যে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। কে সে? কে?

গাড়িতে উঠে এসে হঠাৎ সে অনিরুদ্ধর একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে আকড়ে ধরলো। অনিরুদ্ধ ফিস ফিস করে বলল, কেঁদনা সুমিতা।

আজও একঘণ্টা চলার পর একটা সাঁওতালি গ্রামের কাছাকাছি আসার পর বলরাম বলল, গাড়ি থামাও ড্রাইভার সাহেব। এখানে? অনিরুদ্ধ বলরামের কাঁধে

একখানা হাত রাখলো। বলরাম বলল, গাড়িটা এখানেই থাকুক। সামান্য একটু পথ আমাদের হাঁটতে হবে।

কাছাকাছি কোথাও একটা নদী আছে তা বোঝা যাচ্ছিল। ধুলো রাস্তার ওপর গাড়ির চাকার দাগ আঁকা রয়েছে।

আমার সঙ্গে আসুন মা, ঘাস জমি মাড়িয়ে একটা ঢালু রাস্তা ধরে নামতে থাকলো বলরাম। তাকে অনুসরণ করে বাকি সবাই। সামনেই একটা ছবির মতো অনেকগুলো কুটির। ঝকঝকে তকতকে একটা সাঁওতালি গ্রাম।

নিঃশব্দে হাঁটছিলেন সবাই।

গ্রামখানা পেরিয়ে আসার পরেই নদীটা চোখের সীমানায় চলে এলো। তার কিনারে বিশাল একটি বাঁধানো বটগাছ।

বলরাম হাত তুলে বলল, ওই যে ওখানে বসে আছেন। হ্যাঁ পঙ্কজই বসে আছেন। এই মুহূর্তে খালি গা। স্থির অকম্পিত একটা পাথরের স্ট্যাচুর মত দেখাচ্ছে তাঁকে। বট গাছটার সহস্র সহস্র পাতার ফাঁক দিয়ে চুইয়ে আসা রোদের ঝিলিমিলি কত রকমের আলপনা এঁকেছে পঙ্কজের অনাবৃত শরীরে। অপলক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন মেঘনা। তাঁর মনে হচ্ছিল পঙ্কজ কোন মানুষ নয়। এই গাছটার মতই মাটির গর্ত থেকে অংকুরিত হয়ে ওঠা কোনো কিছু। তাঁর চলমানতা নেই, তাঁর জন্ম মৃত্যু নেই; তাঁর চাওয়া পাওয়া নেই, হৃদয় নেই। এমনকি ক্ষুধাও নেই।

দাঁড়াও—হাত তুলে অনিরুদ্ধকে থামালেন মেঘনা। ওঁকে আব ডেকোনা। উনি ওনার নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছেন। চলো আমরা ফিরে যাই।

না--

হ্যাঁ অনিরুদ্ধ, আমরা ফিরে যাবো এখান থেকে। চোখের কোল থেকে গড়িয়ে আসা অশ্রুবিন্দুকে লুকানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না মেঘনা।

গাড়িটা ফেরার সময় বলরাম সঙ্গে নেই। অনিরুদ্ধের কোলের ওপর খোলা চিঠিখানা পরে আছে। এই চিঠির ঠিকানা দেখেই বলরাম তাদের বাড়িতে এসেছিল।

বিলাসপুর থেকে পঙ্কজকে লেখা সন্দীপের চিঠি। মেঘনা পড়েন নি চিঠিখানা। অনিরুদ্ধ পড়েছিল এই মাত্র। চিঠিতে লেখা আছে--

তোমাকে বোধহয় এই আমার শেষ চিঠি। একটা জীবন আমরা মোটামুটি পার করে জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়েছি। এখন থাকাটাই অসত্য। তোমাকে কেন হঠাৎ এই চিঠি লিখেছি? তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। যে কথাটা তোমাকে অনেক আগেই বলা উচিত ছিল এখন তাই বলছি। সারাজীবন একটা মৃত মানুষকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়ে তুমি জীবনেব মধ্যে থেকেও সন্ন্যাসীর মত নিজেকে সকলের কাছ থেকে সরিয়ে রাখলে। আগে বলতে পারিনি আজ বলছি—তুমি ব্যর্থ। তুমি ব্যর্থ। তুমি নিজেকে নিজে ঠকিয়েছ।

ইতি সন্দীপ।